বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

সুনামগঞ্জ

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

সুনামগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মো. আশ্রাফুল করিম

সংগ্রাহক
সুমনকুমার দাশ
মোছাম্মৎ নাহিদা আখতার
মো. সিরাজুল ইসলাম
রেবতী মোহন সরকার
দেবাশীষ কুমার সরকার

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
সুনামগঞ্জ
প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১/ এপ্রিল ২০১৪

বাএ ৫১১৯

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত বিশ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA SUNAMGANJ : (Present state of Folklore in Sunamganj District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2013. Price : Tk. 320.00 only. US$: 40

ISBN-984-07-5328-2

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ

www.pathagar.com

চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪ টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   - ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   - খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও **অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা**

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল

www.pathagar.com

বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ' চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের **(contact person)** জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি :

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম : বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয়

www.pathagar.com

সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সুনামগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

১. নামকরণ
২. ভৌগোলিক অবস্থান
৩. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৪. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ
৫. স্মরণকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ
৬. স্মৃতিতে-শ্রুতিতে সুনামগঞ্জ
৭. জনবসতির পরিচয়
৮. সুনামগঞ্জের গারো সম্প্রদায়
৯. সুনামগঞ্জের পির-আউলিয়া-দরবেশ
১০. নদ-নদী ও খাল-বিল
১১. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১২. ঐতিহাসিক স্থাপনা
১৩. প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্ভাবনা
১৪. সাংস্কৃতিক তথ্যাবলী
১৫. রাজনৈতিক ও গুণী ব্যক্তিত্ব
১৬. মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ
১৭. শিল্পী ও সাহিত্যিক

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

১. লোকগল্প/লোককাহিনি/ রূপকথা/উপকথা
২. কিংবদন্তি
৩. লোককবিতা
৪. লোকছড়া
৫. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

লোকশিল্প

১. নকশিকাঁথা, ২. মৃৎশিল্প, ৩. বাঁশ-বেতশিল্প, ৪. পাটশিল্প, ৫. হাতপাখা,
৬. নকশিশিকা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments)

লোকস্থাপত্য (folk architecture)

লোকসংগীত (folk song)

১. বাউল গান
২. মেয়েলি গীত
৩. বারোমাসি
৪. ধামাইল গান
৫. সূর্যব্রত সংগীত
৬. ভাটিয়ালি
৭. হোলি গান
৮. মাজারের গান
৯. আঞ্চলিক গান
১০. কীর্তন গান
১১. বিচ্ছেদ গান
১২. মালসি গান
১৩. গাজির গীত
১৪. দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments)

লোকউৎসব (folk festival)

১. বাংলা নববর্ষ
২. চৈত্রসংক্রান্তি
৩. নবান্ন উৎসব
৪. পৌষসংক্রান্তি
৫. ঈদ
৬. দুর্গোৎসব
৭. জাতীয় দিবস পালন
৮. মহররম আশুরা
৯. অষ্টমী স্নান

লোকমেলা (folk fair)

লোকাচার (ritual)

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food)

লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য

পালাগান/লম্বা কিস্‌সা

খ. লোকনৃত্য

লোকক্রীড়া (folk games)

১. মোরগ লড়াই
২. লাই খেলা
৩. নৌকাবাইচ
৪. ষোলোঘুঁটি খেলা
৫. বউছি খেলা
৬. ষাঁড়ের লড়াই
৭. পলো বাওয়া
৮. কুস্তিখেইড়
৯. পাখি শিকার খেলা
১০. গাছ-ছোঁয়া খেলা
১১. কুতকুত খেলা
১২. কানামাছি খেলা
১৩. ফুটবল

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. কামার
২. কুমার
৩. মেস্ত্রের
৪. মুচি
৫. চোর
৬. কলু
৭. জেলে

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

১. লোকচিকিৎসা
২. তন্ত্র-মন্ত্র
    ক. সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা
    খ. হিরালির মন্ত্র
    গ. হাড় ভাঙা ব্যথার মন্ত্র

www.pathagar.com

ধাঁধা (riddle)

প্রবাদ প্রবচন (folk sayings & proverb)

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. কোণ
২. খইয়ের চালুন
৩. হেয়্যুইত
৪. চাঁই
৫. ঠুলি
৬. মই
৭. ঢেঁকি
৮. হুঁক্কা
৯. লাঙল
১০. জাঁতি বা ছরতা
১১. ঘানিগাছ
১২. উছ্
১৩. বাইর
১৪. উইন্যা

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

১. নামকরণ

সুনামদ্দি নামক জনৈক মোগল সিপাহীর নামানুসারে সুনামগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। সুনামদি (সুনাম উদ্দিনের আঞ্চলিক রূপ) নামক উক্ত মোগল সৈন্যের কোনো এক যুদ্ধে বীরোচিত কৃতিত্বের জন্য সম্রাট কর্তৃক সুনামদিকে এখানে কিছু ভূমি পুরস্কার হিসেবে দান করা হয়। তাঁর দান স্বরূপ প্রাপ্ত ভূমিতে, তারই নামে সুনামগঞ্জ বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল। এ ভাবে সুনামগঞ্জ নামের ও স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সুনাম অর্জনের জন্য সুনামদিকে সুনামগঞ্জ দান করা হয়, না সুনামদি সিপাহীর ঐতিহ্য চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য যে 'গঞ্জ' বা বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল, তা আজ আর কোনো বিতর্কের বিষয় নয়। তবে, সুনামগঞ্জের সাথে 'সুনাম' শব্দটির যে ঐতিহ্যময় সম্পর্ক রয়েছে তা বলাই বাহুল্য (হোসাইন, ১৯৯৫:১০)।

২. ভৌগোলিক অবস্থান

এক অপরূপ নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের জনপদ সুনামগঞ্জ জেলা। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিস্নাত মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে সুবিন্যস্ত বৈচিত্রময় ভূ-প্রকৃতি ও মনোরম পরিবেশ সুনামগঞ্জ জেলাকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এর হাওর-বাওর নদী-নালার কলোচ্ছ্বাস, মরমি বাউলের সুর, বিচিত্র পাখপাখালির কলগুঞ্জনে কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুকেই মুখরিত করে রাখে। শারদীয় আমন্ত্রণে অতিথি পাখিদের আগমন। হেমন্তে শস্যের সুবাস, শীতের সবুজ সমারোহে সবজীর সজীবতা, বসন্তের বাহারে লীন হয়ে যায়। সে এক অপূর্ব স্বপ্নিল পরিবেশ। আবার গ্রীষ্মের খরদাহে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঢামাডোলে বেজে ওঠে, নদী-নালা হাওরের মাঝে মানুষের বাঁচার আকুতি তরঙ্গের অভিঘাতে বিচূর্ণ হয়ে মিলিয়ে যেতে চায়। প্রকৃতির অপার লীলার বিপরীতধর্মী এ দুটো ছবি প্রতি বছর জেলার আপামর জনসাধারণকে আশা নিরাশার দোদুল দোলায় দোল খাইয়ে বেড়ায়।জেলার সীমানা চিহ্নিত করে আছে উত্তরে প্রতিবেশী ভারতের মেঘালয় রাজ্যের জয়ন্তিয়া গিরিমালা, দক্ষিণে খোয়াই নদী বিধৌত হবিগঞ্জ জেলা। পূর্বে এবং পশ্চিমে মলুয়া মহুয়ার স্মৃতি বিজড়িত নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা। এ চতুর্দোলার চত্বরে ১৩৯৬ বর্গমাইলের আয়তন ও প্রায় পনেরো লক্ষ অধিবাসী নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলা যশোরাজের মতো দেদীপ্যমান। সুনামগঞ্জ জেলার ভূ-প্রকৃতি গঠনেও বিশ্বকর্মার বিচিত্র খেয়াল লক্ষ করা যায়। এর ১০৮৯টি হাওরের মাটি তুলে নিয়ে যেনো খাসিয়া জয়ন্তিয়া পর্বতমালা সাজানো হয়েছিল। সে পাহাড়ের ঝরনা ও নদী নালা বয়ে ক্রমে শিলা, নুড়িপাথর, কাঁকর, বালি ও পলি এসে পুনরায় এর ভূ-গঠনের কাজ সম্পন্ন করেছে।

www.pathagar.com

ভারত
উত্তর বাদাঘাট
উত্তরবংশীকুন্ড
দক্ষিনবংশীকুন্ড
উত্তর শ্রীপুর
দক্ষিণ শ্রীপুর
তাহিরপুর
বাদাঘাট
বালিজুরি
বিশ্বম্ভরপুর
মধ্যনগর
পাইকুরাটি
সেলবোরাশ
ধর্মপাশা
বেহালী
জামালগঞ্জ
জয়শ্রী
ভীমখালী
জামালগঞ্জ
উঃ সুখেরজ্ঞাপুর
দঃ সুখেরজ্ঞাপুর
কেন্দারডাক
শিমুলবাক
গৌররং
মোহনপুর
সুনামগঞ্জ
মোল্লাপাড়া
লক্ষণশ্রী
পশ্চিম পাগলা
জয়কোলান
পূর্ব পাগলা
পূর্ব বীরগাঁও
পাথারীয়া
পশ্চিম বীরগাঁও
দূর্গাপাশা
লক্ষীপুর
উত্তর দুয়ারাবাজার
মনোরগাঁও
দুয়ারাবাজার
আফতাবনগর
সোহালীয়া
পান্ডেরগাঁও
দেওকাপন
জয়ারবাজার
উঃ পুঃ দুয়ারাবাজার
ইসলামপুর
ছাতক
উত্তরখুরমা
দক্ষিণখুরমা
দুলারবাজার
শিংচোপাইর
তাতগাঁও
আফজালাবাদ
কলকালীয়া
জগন্নাথপুর
মিরপুর
পাটলী
সৈয়দপুর
হালদীপুর
রাণীগঞ্জ
কুলান
আশারকান্দি
তারাল
ভাটিপাড়া
রাজানগর
করিমপুর
রফিনগর
সাবাজল
দিরাই
আটগাঁও
হাবিবপুর
বাজরা
সুল্লা
সুল্লা
নেত্রকোনা
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ

তাই এখানকার মাটি ভিন্ন রকমের। পাথুরে কাঁকর মাটি, বেলে, দোঁয়াশ ও পলিমাটি। ভূ-ভাগ গঠনে দু'ধরনের মাটিই বেশি দেখা যায়। বেলে দোঁয়াশ মাটি নিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চল যেখানে আমন চাষ হয়ে থাকে এবং বেশির ভাগ নীচু এলাকার পলিমাটি নিয়ে বোরো এলাকা। উপরিউক্ত ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য জেলার জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের উপরও প্রভাব ফেলেছে। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুরই প্রাধান্য। শীতকালে শৈত্যের আধিক্য আবার গ্রীষ্মকালে গরমের প্রাবল্য অনুভূত হয়। তবে খরা ও প্রচুর বর্ষণের আবহাওয়াকে নাতিশীতোষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। জলবায়ু চরম একথা বলা যায় না। চেরাপুঞ্জির সান্নিধ্য এবং মৌসুমী বায়ুর প্রবল প্রভাবে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। গড়ে বৎসরে ২২৫ সেন্টিমিটার। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা পানি সুনামগঞ্জকে নদী নালা ও হাওরের দেশে পরিণত করেছে। অসংখ্য নদী নালার মধ্যে সুরমা, মরা সুরমা, কালনী, যাদুকাটা, রক্তি, বৌলাই, কংশ, মহাশিন, বোকাই, সোমেশ্বরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বহু নদী নালা ভরাট হয়ে গেছে। পাহাড়ি ছড়ার মধ্যে বনগাঁও, মকরিয়া ও লাকমা ছড়ার নাম করা যায়। ১০৮৯ টি হাওরের মধ্যে টাঙ্গুয়া, দেখার হাওর, শনির হাওর, খরচার হাওর, হালিয়ার হাওর, মাটিয়ান, কাংলার হাওর, পাঙনার হাওর, টাঙার, বরাম হাওর এবং নলুয়ার হাওর; বাওরের মধ্যে ধারাম বিল, আয়লা বিল ও কামাল বিল প্রভৃতি প্রধান।

সুনামগঞ্জ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ জেলা এ কথায় কোনো অত্যুক্তি নেই। এর ভূ-অভ্যন্তরে রয়েছে তেলের সম্ভাবনাসহ গ্যাসের বিস্তৃতি। টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড তার স্বাক্ষর। এর নুড়ি পাথর ও বালি বহন করে অসংখ্য নৌকা বার্জ অহরহ নদীপথে যাতায়াত করে। কোটি কোটি টাকার রাজস্ব দেয় হাওর-বাওরের মৎস সম্পদ। এর হিজল করচ বাগ ও বেতস বন বানের পানির প্রচণ্ডতাকে প্রশমিত করে। আশ্রয় দেয় মৎস ও পক্ষীকূলকে। টেকেরঘাট খানি প্রকল্পের চুনা পাথর চালু রেখেছে ছাতকের সিমেন্ট কারখানা। সুনামগঞ্জ জেলার বাঁশ ও করচ যোগান দিচ্ছে ছাতক সিলেট কাগজ ও মণ্ড কারখানার কাঁচামালের। এর নদী গর্ভে রয়ে গেছে অপরিমিত নুড়ি পাথর ও বালু। টেকেরঘাট চুনাপাথর খনিতে রয়েছে প্রচুর চুনা পাথর ও পীট কয়লা।

সুনামগঞ্জ জেলায় রয়েছে প্রচুর আবাদযোগ্য ভূমি। এর পরিমাণ সাত লক্ষ একরের উপরে। ভূস্তর উঁচুনীচু থাকায় চাষাবাদ ও জমিতে জল ধারণ বিঘ্নিত হয়। জমি সমতল করে সেচ সুবিধা দান করতে পারলে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডারে পরিণত হতে পারে। চার লাখ একরের বোরো ধান, এক লাখ একরের মতো রোপা আমন, সত্তর হাজার একরে আউশ ধানের চাষ হয়। প্রায় দেড় লাখ একর জমিতে অন্যান্য ফসলাদি এবং রবি শস্যের আবাদ হয়ে থাকে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। এছাড়া কিছু গম, সরিষা, বাদাম, ইক্ষু, পাট, পেঁয়াজ ও মরিচের চাষ হয়। কিছু কিছু কলার আবাদও আছে। রবি শস্য ও সবজি আবাদেরও এখানে প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ ছাড়াও প্রচুর পাখি পাওয়া যায়। এর অসংখ্য হাওরে এসব পাখি চষে বেড়ায়। আবার হাওরের পানিতে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক মৎস্য সম্পদ। এ থেকে প্রচুর পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব আয় হয়। এ আয় সুপরিকল্পনার মাধ্যমে আরও বাড়ানো যেতে পারে। জেলায় যে পরিমাণ খাস জমি রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে

www.pathagar.com

ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। পরিমাণ কম হলেও হিজল করচ বন ও অন্যান্য বনাঞ্চল নিয়ে এ জেলায় প্রায় বিশ হাজার একরের উপর জমিতে বনভূমি বিদ্যমান। প্রচুর ভাসমান কাঠের থলও প্রভুত রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুনামগঞ্জ জেলা প্রাচীন কাল থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিভাগোত্তর ও ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এর নদী পথে নৌকা স্টিমার যাতায়াত করতো। সুদূর আসাম রাজ্যের সঙ্গে সুরমা ও বরাক নদী পথে স্টিমার ও বার্জের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলিত ছিল এবং অসংখ্য নদী বন্দর গড়ে উঠেছিল। ছাতক, সুনামগঞ্জ, সাচনা বাজার, মধ্যনগর ইত্যাদি আজও ব্যস্ত নদী বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পদেও ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ও বেঙ্গল রিভার্স স্টিমার কোম্পানির জাহাজ ছাতক থেকে মার্কুলি হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াত করেছে। অধুনা জাউয়া, বাধাঘাট, মঙ্গলকাটা, ভীমখালী, জয়নগর, মহেষখাল, ধর্মপাশা, বিশ্বম্ভরপুর ও চিনাশান্দি বেশ ব্যস্ত ক্রয় বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় যাতায়াত ব্যবস্থা এক কথায় দুরূহ। পূর্বে নদী পথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও অধুনা নদী ভরাটের কারণে কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়েছে। সড়ক পথেও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত ভালো নয়। সড়ক পথে যাতায়াত সীমিত হলেও এখন তা প্রসারিত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ-ছাতক, সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে ঢাকা পর্যন্ত পাকা রাস্তায় যাতায়াত চলে। সুনামগঞ্জ-দিরাই সড়কে পথে কোচ ও বাস চলাচল করে। উপজেলাগুলো থেকে গ্রামগঞ্জের রাস্তা ঘাট তেমন সম্প্রসারিত হয়নি। এছাড়া রয়েছে সদরে এন ডব্লিউ সংযোগ সুবিধাসহ দশটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও আটটি টেলিগ্রাম অফিস এবং নয়টি ব্রাঞ্চ অফিস ও ৪৫টি সাব অফিসসহ ৫৪টি ডাকঘর। বারটি বিশ্রাম কেন্দ্র আছে মনোরম পরিবেশে (ইউনুছ, ১৯৯০: ৯-১১)। সুনামগঞ্জ জেলার আয়তন ৩, ৬৬৯.৫৮ বর্গকিলোমিটার। জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা ২৭৪.৫১ বর্গকিলোমিটার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা ২৮৬.২৫ বর্গকিলোমিটার, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা ১৯৪.২৫ বর্গকিলোমিটার, ছাতক উপজেলা ৪৩৪.৭৬ বর্গকিলোমিটার, দোয়ারবাজার উপজেলা ২৮১.৪০ বর্গকিলোমিটার, দিরাই উপজেলা ৪২০.৯৩ বর্গকিলোমিটার, শাল্লা উপজেলা ২৬০.৭৪ বর্গকিলোমিটার, জগন্নাথপুর উপজেলা ৩৬৮.২৭ বর্গকিলোমিটার, জামালগঞ্জ উপজেলা ৩৩৮.৭৪ বর্গকিলোমিটার, তাহিরপুর উপজেলা ৩১৩.৭০ বর্গকিলোমিটার এবং ধর্মপাশা উপজেলা ৪৯৬.০৩ বর্গকিলোমিটার।

৩. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুনামগঞ্জের ইতিহাস অতি প্রাচীন। অসংখ্য কিংবদন্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও তথ্যাবলিতে তা সমৃদ্ধ। প্রাচীন ইতিহাস থেকে অনুমান করা হয়, সুনমাগঞ্জ জেলার সমগ্র অঞ্চল এককালে আসামের কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুনামগঞ্জের লাউড় পরগনায় এখনো প্রবাদ হিসেবে কথিত হয় যে, লাউড় পাহাড়ের উপর কামরূপের রাজা 'ভগদত্তের' রাজধানী ছিল। এ ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলেও কিংবদন্তি রয়েছে। ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলেও নাকি উক্ত রাজার বাড়ির চিহ্ন রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এ ভগদত্ত ও মহাভারতের উল্লেখিত ভগদত্ত

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি নন বরং কথিত ভগদত্ত মহাভারতের অনেক পরের কালের মানুষ। এটাই সত্য। কারণ কিংবদন্তিও ইতিহাস যেখানে মিল হবে না সেখানে ইতিহাস ভিত্তি ধরাই বিধেয়।

বৃহত্তর সিলেট সুদূর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ রাজ্যগুলো হচ্ছে লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া। অনুমান করা হয় এ লাউড় রাজ্যেও সীমানা বর্তমান সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা ও ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল (এ রাজ্যের সীমানা হবিগঞ্জের আটপরগনা, সিলেট সদরের শিক সুনাইত্যা, কৌড়িয়া এবং ইছাকলসসহ সুনামগঞ্জের অপরাপর সামগ্রিক সীমানা ব্যাপীই বিস্তৃত ছিল)। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল 'লাউড়'। লাউড় নামে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে যে পরগনাটি বিদ্যমান আছে (১৮৬০ ইং সালে থাক জরিপে মাহরাম পরগনার ২৭৮৭ নং থাকে পুরান লাউড় নামে যে মৌজার উল্লেখ ছিল) এর সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে এর অবস্থান সম্পর্কে গবেষকগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। তাহিরপুর থানার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের 'হলহলিয়া' গ্রামে লাউড়ের রাজা বিজয় সিংহের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। স্থানীয়ভাবে এ অঞ্চলটি হাবেলী (হাওলী) নামে পরিচিত। এ লাউড় রাজ্যের নৌঘাঁটি (ন্যাভেল বেস) ছিল দিনারপুর (জিনারপুর) নামক স্থানে। স্থানটি বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। লাউড় রাজধানী থেকে নৌঘাঁটি পর্যন্ত সারাবছর চলাচল উপযোগী একটি ট্রাংক রোডের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সমর্থন রয়েছে। সুনামগঞ্জের তদানীন্তন ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর অব স্কুলস জনাব মুহাম্মদ ওয়াসিল সাহেব এ ট্রাংক রোডের ধবংসাবশেষ থেকে এ তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। মনে করা হয় লাউড়ের রাজা এ ট্রাংক রোডটি নৌঘাঁটি সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

অনুমান করা হয়, সুনামগঞ্জ জেলার বেশির ভাগ অঞ্চল একদা এককালে একটি সাগরের বুকে নিমজ্জিত ছিল। যা কালে কালে পলি ভরাট জনিত কারণে ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে ভূ-খণ্ডে পরিণত হয়েছে। সুনামঞ্জের চুনাপাথর খনি ও কয়লা আবিষ্কারের পরে এরূপ মনে করার পেছনে সমর্থন পাওয়া যায়। এ ছাড়া এখানকার শত শত হাওরও এগুলোর গঠন প্রকৃতি বিবেচনায়ও এ অনুমান সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের টেকেরঘাটে প্রাপ্ত চুনাপাথর এক ধরনের ক্যালসিয়াম। যা সামুদ্রিক প্রাচীন শামুক ও শৈবাল দ্বারা সৃষ্ট। এ কারণেও এ মতটি সমর্থিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক ভাবে। এখানকার প্রাচীন বন্ধনা রীতি প্রচলিত ছিল। এরূপ একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

পূবেতে বন্দনা করি পূবে উদয় ভানু
একদিকে উদয় গো ভানু, চৌদিকে পশর
পশ্চিমে বন্দনা করি, মক্কা ভালা স্থান
যে জাগায় জন্ম নিছে কিতাব, আর কোরাণ ॥
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
যে জায়গায় জন্ম নিছে মালামের পাথর
দক্ষিণে বন্দনা করি 'কালীদহ' সাগর
যে জায়গায় বাণিজ্য করে চান্দ সদাগর। (হোসাইন, ১৯৯৫:১০)

এ বন্দনা গানে দক্ষিণে যে বিশাল সাগরের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এতদাঞ্চলের প্রাক ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। প্রায় সব ঐতিহাসিকগণ এতদাঞ্চল যে এককালে সাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে সাগর যে কালিদহ সাগর তা

www.pathagar.com

চিহ্নিত করেছেন। একটি আঞ্চলিক গান যে তারা সমকালের কিভাবে সাক্ষী হয়ে পড়ে তাও এ থেকে অনুমেয়। এ কালিদহ সাগর সুনামগঞ্জ জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। হাসন রাজার পুত্র খান বাহাদুর দেওয়ান গনিউর রাজার আত্মজীবনীতে (রোজনামচা) এর উল্লেখ রয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক-জগন্নাথপুর এর পূর্ব কিয়দংশ ও উত্তর সীমান্তের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণকূল ঘেষে অবস্থিত অঞ্চলটুকু এ জেলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কিঞ্চিত উঁচু। অঞ্চল মূলত একই ব্যাল্টের আওতায় ছিল। এ ছাড়া এ ব্যাল্টের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল বিরাট জলরাশি।

এ সমস্ত চিন্তা ভাবনার পেছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে না পাওয়া গেলেও সিলেটের তদানীন্তন কালেক্টর লিন্ডসে সাহেবের অষ্টাদশ শাতাব্দীতে লিখিত বর্ণনা থেকে এর অনেকটা সমর্থন পাওয়া যায়। লিন্ডসে সাহেবের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

> In the pre-historic days the southern part of the sadar subdividion and the northern part of Molovibazar and Habiganj Subidivisions and nearly the entire Sunamganj Subdivision were a part of the Bay of Bengal or a large lake, along With the land of near by district comilla, Mymensing, Dhaka & Noakhali. There are many proofs at this. The Chinese traveller Heuen Sung in the seventh century A.D. has described the sylhet area as silichot country on the sea shore. The famous saint Hazrat Shajalal (R.H) arrived at sylhet or silhatta in 14^{th} century A.D. It is said that nearly all the land from sadarghat or Dinarpur of the present Habiganj subdivision upto Mona Rory's Tilla in Sylhet Was under deep Water. (পূর্বোক্ত, ১২)

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ শিব প্রসন্নলাহিড়ীর 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামক পুস্তকে সিলেটের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঘব্রত নামে একটি পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই মাঘব্রত পূজায় কালিদহ সাগরের জলের উপর সাত গাছা দুর্বাসহ একটি মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থার কথা জানা যায়। এতেও বুঝা যায় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের কোথাও 'কালিদহ' সাগর নামে কোন এক কালে একটি সাগর ছিল। যাতে পূর্বোক্ত মতের সমর্থন মিলে।

এ সমস্ত তথ্য ও অভিমত থেকে সুনামগঞ্জ জেলার বিরাট অঞ্চল বিশাল 'কালিদহ' নামক সাগরের নিচে নিমজ্জিত থাকার উক্তির অকাট্য সমর্থন পাওয়া যায়। লিন্ডসে সাহেবের বিরাট জলারাশিই অতীত কালের কালিদহ সাগর, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। এ কারণেই সম্ভবত সুনামগঞ্জ জেলার ভাটি অঞ্চল আজো বিশাল হাওরে পরিপূর্ণও তুলামূলক নিচু রয়ে গেছে। 'হাওর' শব্দটি মূল শব্দ সাগর (সায়র) থেকে পরে হাওর হয়েছে এ মতও শতসিদ্ধ। বর্ষাকালে এ সমস্ত অঞ্চল এখনো সাগরের আকৃতি ধারণ করে থাকে। সুদূর অতীতে কালিদহ সাগর এর বিস্তৃতি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল বলে মনে করা হয়। যার উপর দিয়ে ১০১১ খ্রিষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং জাহাজে চড়ে সরাসরি তাম্রালিপ্ত থেকে সিলেটে পৌঁছেছিলেন। তাঁর মতে নহরী আজরক নামে একটি নদী কামরূপের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে হাবাঙ্গা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদী দিয়ে বাংলায় ও গৌড়ে যাওয়া যেত। বর্ণিত নদীকে প্রাচীন সুরমা বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাচীন লাউড় রাজ্যের রাজধানী বর্তমান লাউড় পরগনায় অবস্থিত ছিল। এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশব মিশ্র নামক জনৈক ব্যক্তি। খ্রিষ্টীয়

www.pathagar.com

দশম অথবা একাদশ শতকে তিনি কৌনুজ থেকে এখানে আসেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। কারো কারো মতে রাঢ় অঞ্চল বঙ্গ বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ায় সেখানকার বিতাড়িত ও পরাজিত সম্ভ্রান্তজনেরা প্রাণ ও মান বাঁচানোর জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছিলেন। তারই কোনো এক ব্যক্তি এখানে এসে রাজত্ব গড়ে তোলেন। এই রাঢ় শব্দ থেকেই 'লাউড়' শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

লাউড় ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। সম্রাট আকবরের শাসনামলে লাউড় রাজ্য পার্শ্ববর্তী খাসিয়া উপজাতিদের আক্রমণে আক্রান্ত ও পদানত হলে কিছু দিনের জন্য এর রাজধানী বানিয়াচঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অতপর লাউড়ের রাজা গোবিন্দ সিংহ তা পুনরায় শত্রুমুক্ত করেন ও লাউড়ে রাজধানী পুনঃস্থাপন করেন। ঐতিহাসিক ডব্লিও. ডব্লিও. হান্টার এর মতে 'মোগল অধিকারের পর (সম্ভবত ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) লাউড় প্রথবারের মত তার স্বাধীনতা হারায় ও মোগলদের করতলগত হয়।'

লাউড়ের রাজারা ছিলেন কাত্যান গোত্রিয় মিত্র। তাঁদের উপাধি ছিল সিংহ। এ রাজাদের জগন্নাথপুর ও বানিয়াচঙ্গে আরো দুটি উপ-রাজধানী ছিল। লাউড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিব্য সিংহ নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করতেন। কথিত আছে, বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক অদ্বৈতাচার্যের পিতা কুবের আচার্য দিব্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। কুবেরাচার্যের পিতা নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গনেশের মন্ত্রী ছিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যসভার তদীয়পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। এবং তদীয় মন্ত্রী পুত্র অদ্বৈতাচার্যের (জন্ম ১৪৩৫ খ্রি.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই অদ্বৈতাচার্যই শ্রীচৈতন্য দেবের বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিষ্য। দিব্য সিংহ লাউড়ীয়া কৃষ্ণদাশ নামে পরিচিত। এরা প্রাচীন সাহিত্য রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। উল্লেখ্য লাউড়িয়া কৃষ্ণদাশ বা দিব্য সিংহ তদীয় মন্ত্রী পুত্র ও গুরু অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থ 'বাল্যলীলাসূত্র' রচনা করে ছিলেন। তিনি লাউড়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে তিনি নবদ্বীপে চলে যান ও সেখানে দেহধারণ করেন। অদ্বৈতাচার্যের অপর শিষ্য লাউড় নিবাসী ঈশান নাগর 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি ১৫৬৮ সালে রচনা করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ অদ্বৈতচার্য, অদ্বৈত মহাপ্রভু নামে খ্যাত। কথিত আছে অদ্বৈত মহাপ্রভুর মা লাভা দেবী জীবিতাবস্থায় গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গা স্নান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধাবস্থায় এতদূর নিয়ে গঙ্গা স্নান করানো সম্ভবপর ছিল না। এ কারণেই অদ্বৈত মহাপ্রভু তার মাতৃবাক্য পালনের পুণ্য উদ্দেশ্যে যোগসাধনা বলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের জল, রেনুকা (তাহিরপুর থানার বর্তমান যাদুকাটা নদীর প্রাচীন নাম) নদীর জলের ধারায় একত্রিত করে প্রবাহিত করে দিয়ে ছিলেন। এভাবেই তিনি মাতৃ আজ্ঞা পুরণ করেন। তাঁর সাধনা সিদ্ধ ফল 'বারুণী যোগ' নামেও অভিহিত। বর্তমান যাদুকাটা নদীর তীরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিবছর বারুণী মেলা হয় ও ঐ নদী তীরে 'পণাতীর্থে' (পূর্ণাতীর্থে) হিন্দুরা প্রতি বছর চৈত্র মাসে এই শীর্ণ কায়া নদীতে পুণ্য স্নান করে। ঐ নির্দিষ্ট দিনে এ নদীতে স্নান করাকে হিন্দুরা গঙ্গা স্নানের সমতুল্য জ্ঞান করে থাকে। এতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় বলে তাদের বিশ্বাস।

তদবধি পণাতীর্থ হৈল তার নাম
পানাব গাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম (পূর্বোক্ত, ১৪)।

www.pathagar.com

১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মোবারক দৌলা নামে লাউড়ের রাজার একজন উজির ছিলেন বলে সৈয়দ মুর্তাজা আলী সাহেব উল্লেখ করেছেন। ঐ সময়কার লাউড়ের রাজার নাম সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত এই খ্যাতিমান উজিরের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা রাজার নামের চাইতেও গুরুত্ব পেয়েছিল, এ কারণেই তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকতে পারে। সোনারগাঁয়ে প্রাপ্ত ১৪৭৪ সালের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মোবারক দৌলা মালিক উদ্দিন নামক মোয়াজ্জমাবাদ ও লাউড়ের উজর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। (Insepection of Bangle চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২১) প্রখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান আজরফের মতে, লাউড়ের রাজবংশের ইতিহাস তিনি জানতে পারেন লাউড়ের রাজাদের বংশধর ও অধস্তন পুরুষ বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের কাছে থেকে। এই বংশের রাজা গোবিন্দ সিংহ ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হয়ে হাবিব খাঁ নামধারণ করেন। তাঁরই অধস্তন পুরুষ হচ্ছেন বর্তমান বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান পরিবার (পূর্বোক্ত, ১০-১৪)।

১৯৭০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস সমৃদ্ধ শহর ও বাজারকে থানায় রূপান্তরের আদেশ জারি করেন। জানা যায় এরই আওতায় সুনামগঞ্জে থানা স্থাপিত হয়। ইংরাজদের কূটবুদ্ধি ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে। সুনামগঞ্জের অন্যান্য থানা পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন সময়ে এ প্রবাহ ও সংস্কারে শরিক হয়। এর আগে বনগাঁয়ে (রংগারচর ইউনিয়নের পাহাড় ঘেঁষে একটি গ্রাম) সুনামগঞ্জের থানা ছিল বলে জানা যায় (পূর্বোক্ত, ২৫)।

১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ সালে সিলেট জেলার ভিতর দিয়ে কাছাড়ের শিলচর পর্যন্ত রেললাইন খোলা হয়। এর আওতায় ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে দোয়ারাবাজার থেকে খাসিয়া পাহাড় পর্যন্ত একটি রেললাইন খোলা হয়। যা ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। দোয়ারাবাজার খাদ্য গোদামের পাশে এখনো একটি পাড়া আছে যার নাম স্টেশন পাড়া। মনে হয় ওখানে একটি রেল স্টেশন ছিল। পরে ১৯৫৪ সালে ছাতক-সিলেট রেললাইনটি নির্মিত হয় যা আজো বহাল আছে (পূর্বোক্ত, ২৭)।

সুনামগঞ্জে ঐতিহাসিক তিনটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের কথা আজো মুরব্বিদের মুখে শোনা যায়। এগুলো হলো ১৩০৪ বাংলার বড় ভূমিকম্প (স্থানীয় ভাষায় বড় ভৈষাল)। এ ভূমিকম্পের এত ব্যাপকতা ছিল যে পর্যায়ক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত থেমে থেমে এটি সংঘটিত হয়েছিল। এতে সুনামগঞ্জের ২৮৭ জন লোকের মৃত্যু হয়। বহু বাড়িঘরও বিনষ্ট হয়। যার কারণে বৃহত্তর সিলেটে এর পরে পাকা দালান কোঠা নির্মাণে মানুষ ভয় পেত। যে কারণে এতদাঞ্চলে হাল্কা টিনের বাড়ি ঘর তৈরি হতো।

১৩২৬ বাংলা আশ্বিন মাসের বড় তুফানের কথাও মুরব্বিরা ভুলতে পারেননি। এটি শুরু হয়েছিল শেষ রাত থেকে এবং শেষ হয়েছিল বিকাল ৪/৫ টার দিকে। মানুষ ভয়ে চৌকির নীচে এ ভয়ংকর সময় কাটায়। এতেও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ছিল।

১৩৩৬ বাংলার সাদা পানির বাণের কথা আজো লোকমুখে শোনা যায়। এ পানি মণিপুর রাজ্যের বাঁধ ভেঙে এসেছিল। সমগ্র আসাম ও বৃহত্তর সিলেট তলিয়ে যায় এ প্লাবনে। মানুষ নৌকায় ও গাছের ডালে থেকে প্রাণে বাঁচে। এ পানির রং ছিল সাদা এ জন্য তাকে সাদা পানির বন্যা বলা হয়। এ তিনটি ঐতিহাসিক দুর্যোগ মানুষের মাঝে এমন স্মরণীয় যে অনেকে এ সমস্ত মহাবিপদের সাথে তার বয়স নির্ণয় করে থাকেন।

www.pathagar.com

ঐ বন্যা, তুফান বা ভূমিকম্পের সময় কে কত বয়সের ছিল ইত্যাদি। প্রাকৃতি দুর্যোগ, বন্যা, প্লাবনের জন্য এতদাঞ্চলের নাম রয়েছে। এরপর সুনামগঞ্জ ১৯৬৭, ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৪ সালে ব্যাপক বন্যা হয়। আগামীতে এগুলোও স্মরণ কালের ঘটনা হিসেবে স্থান পেয়ে যেতে পারে (পূর্বোক্ত, ২৯-৩০)।

৪. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ

১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মবারক দৌলা মালিক লাউড়ের উজির হন।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে খাসিয়া কর্তৃক সেলবরষ, রামদিঘা ও বংশীকুণ্ডা পরগনা আক্রমণ ও ৩০০ লোক হত্যা।

১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ছাতকে ইংলিশ কোম্পানি স্থাপন।

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দশসনা বন্দোবস্ত।

১৭৮৮-৯০ খ্রিষ্টাব্দে হস্তবোধ জরিপ।

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

১৮৬০-৬৬ খ্রিষ্টাব্দে থাকবস্ত জরিপ।

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর সিলেট জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জে মহকুমা স্থাপন।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি জুবিলী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ভূমিকম্প (১২ ই জুন এ ভূমিকম্প হয়)।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে গৌরিপুর জমিদার কর্তৃক ছাতকের ইংলিশ কোম্পানি ক্রয়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ।

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রধ।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ছাতকে সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে গণভোট/পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন ও জমিদারি বিলোপ।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের বিজয়/ছাতকে রেললাইন প্রতিষ্ঠা।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মহকুমা আইনজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জ জেলায় উন্নীত।

১৯৯৫ ১লা আগস্ট নবগঠিত সিলেট বিভাগ এর কার্যক্রম শুরু হয়।

৫. স্মরণকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১৮৯৭ সন/১৩০৪ বাংলায় বড় ভৈষাল (ভূমিকম্প)।

১৩২৬ বাংলা বড় তুফান (ঝড়)।

www.pathagar.com

১৩৩৬ বাংলা বড় পানি (বন্যা)।
১৯৬৭ ইংরেজি বন্যা।
১৯৭৪ ইংরেজি বন্যা।
১৯৮৮ ইংরেজি বন্যা।
১৯৯৫ ইংরেজি বন্যা।
১৩০৪ সালের ভূমিকম্প হচ্ছে সর্বকালের রেকর্ডসংখ্যক ভূমিকম্প। উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে মাছুলি পট্টম, দ.পূর্বে রেগুন থেকে শুরু করে কাংরা নামক স্থান পর্যন্ত প্রায় ১,৭৫,০০০ বর্গমাইলব্যাপী এটি অনুভূত হয়। ১,৪৫,০০০ বর্গমাইলের দালান কোঠা, ধ্বংস হয়েছিল। সুনামগঞ্জে ২৮৭ জন লোক মারা যায়। তন্মধ্যে শহরের উত্তরে নদীর অপর তীরের যুগিরগাঁও গ্রামেই ৩৯ জন লোক মারা যায়। ১৭৯ জন পানিতে ডুবে, ৮৭ জন বাড়িঘর চাপা পড়ে এবং ৪৩ জন সৃষ্ট ভূ-ফাটলে পতিত হয়ে। মহকুমার ৮০/৯০টি পাকা বাড়ির মধ্যে ৫/৬টি ব্যতীত বাকিগুলো এ ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়। এর দিন কয়েক পূর্ব থেকেই বিশেষ ধরনের শব্দ শুনা যাচ্ছিলো বলে জানা যায় (পূর্বোক্ত, ৬-৭)।

৬. স্মৃতিতে-শ্রুতিতে সুনামগঞ্জ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর বড় ভাই সৈয়দ মুস্তফা আলী লিখেছেন, তাঁর আত্মকথা পুস্তকে লিখেছেন : "তৎকালে বহির্জগতের সঙ্গে সুনমাগঞ্জের একমাত্র যোগসূত্র ছিল নদীপথ। বর্ষার দিনে শ্রীহট্ট হতে ভাটিয়ালি স্টিমার ছাড়তো শেষ রাত্রে। ছাতক হয়ে সুনামগঞ্জ পৌছাত প্রায় দুপুরে। আধ ঘন্টার বেশী থামতো না কেননা মাল বড় একটা নামানো হতো না। সন্ধ্যা নাগাদ সে স্টিমার মার্কুলী পৌছত ওখানে বর্ষাকালে কাছাড়-সুন্দরবন ডিপাচ সার্ভিস নারায়ণগঞ্জ ভৈরব হয়ে শিলচর পর্যন্ত পৌছত, ঐ বড় স্টিমারেই কলকাতা ও ঢাকার পণ্য দ্রব্যের চলাচলের রাস্তা ছিল। আবার প্রত্যেক রাত্রেই বিপুল পণ্য দ্রব্য নিয়ে মার্কুলী হতে স্টিমার রওয়ানা হতো এবং ভোরে সুনামগঞ্জ স্টিমার ঘাটে ঘণ্টা দুই থাকত মাল খালাসের জন্য। অনেক সময় যাত্রীরা সুবিধামত পানাহার সেরে নিতেন। কখনো স্টিমারের গন্তব্য পথ পর্যন্ত সীমিত হয়ে যেত সুরমা নদীর গভীরতার জন্য। কাজেই সুনামগঞ্জ বাজারে ঢাকা ও কলকাতার জিনিসের অভাব ছিল না। স্টিমারে মাল চলাচলের জন্য মূল্যও কম ছিল। আমাদের ছাত্রদের 'White away laid Law' ছিল ঢাকা বাসী শশী মিত্রের দোকান। মিত্র মহাশয় বিশাল বপু নিয়ে বসে থাকতেন। তার একটি যুবক ভাগ্নে ছিলেন, গৌরবর্ণ সুপুরুষ তিনিই দোকান চালাতেন। তাঁর দোকানে বই, পেন্সিল, খাতা পাঠ্যপুস্তক, দোয়াত, ফাউন্টেন পেনের প্রচলন ছিল বলে নানা রকম নিব পাওয়া যেত। তখনো বাজারে Red ink নিব বের হয়নি। কালির বড়ি পাওয়া যেত। আমরা ঘরে এনে কালি তৈরি করতাম। সে দোকানে আবার Ready made টুইলের সার্ট ও ধুতি পাওয়া যেত এক কথায় সেটাই ছিল এ যুগের যাকে বলে departmental Store। শীতকালে জুট ফ্লানেলের শার্ট ও ফ্রক পাওয়া যেত। আমি তিন টাকা বৃত্তি পেতাম বলে আমাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। একবার শীতের সময় আমার এক ছোট ভগীনির জন্য তিন টাকায় একটি জুট ফ্লানেলের ফ্রক কিনে দিয়েছিলাম। আরো বড় বড় দোকান ছিল যেমন আমীর মৃধার দোকান, লক্ষ্মী ভাণ্ডার

www.pathagar.com

ইত্যাদি। হাটে যথেষ্ট মাছ উঠতো এবং মাছ খুব সস্তার ছিল। কিন্তু নীচু জায়গা বলে তরকারি সব্জি কম উঠতো। শীতকালে সুনামগঞ্জের বাজার কমলায় ভরে যেত আর বড় বড় কমলা বোঝাই নৌকা নদী পথে যাত্রা করতো। আবার বর্ষাকালে বড় বড় নৌকায় বরিশালের বালাম চাল ও ভাওয়ালের কাঠাল আসতো। উজান জাহাজে নারায়নগঞ্জের সোডা লেমন ও পাওয়াব্রুটি পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।'(পূর্বোক্ত, ৩১)।

লেখক দেশের প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী ও নাটকের বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গুণীদের অন্যতম আবদুলাহ আল মামুনের ছোট ভাই হচ্ছেন আব্দুল্লাহ আল হারুন। এঁদের প্রয়াত পিতা মরহুম এ এইচ এম এ কুদ্দুছ দীর্ঘদিন সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক 'সুরমা'রও কিছু দিন প্রধান সম্পাদক ছিলেন। লেখকের প্রকাশিত প্রবন্ধের শিরোনামটি 'ক্যানভাসে আঁকা ছবি : সুনামগঞ্জ'। উল্লেখ্য লেখাটি ১৯৬২ সালের 'সুরমা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এর অংশ বিশেষ ... "সিলেট পৌঁছে ভাবছেন কোন পথে যাবেন। ট্রেনে নিশ্চয়ই শুনেছেন সিলেট থেকে বাস বা ছাতক থেকে লঞ্চে সুনামগঞ্জ যাওয়া যায়। তবে সাবধান যদি বিকেলে সিলেট পৌঁছে থাকেন তবে বাস ধরার চেষ্টা করবেন না। ও ট্রেনে পৌঁছার অনেক আগেই শেষ বাস ছেড়ে যায়। আর যদি 'সুরমা মেলে' এসে থাকেন তবে দিব্যি হেসে খেয়ে নয়টায় বাসে চেপে মাঝে রাস্তায় দু'বার নৌকায় নদী পার হয়ে, মস্ত মস্ত ব্রিজ, দুটো আড়াইয়ে পেরিয়ে সুনামগঞ্জ পৌঁছবেন। বাসগুলোও এ লাইনের ট্রেনের মতই। লড়ঝড় পুরানো পালিশহীন বিবর্ণ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে চলে। যতো অকেজো বাস আমদানী করেছে বাস এসোসিয়েশেন এলাইনে। তারা জানে বাসে প্যাসেঞ্জার ঠিক বুঝাই হবেই সেটা চলুক বা না চলুক। আশ্চার্য হয়ে দেখবেন এলাইনে যাত্রীদের যাঁরা বাসে যাতায়াত করে বাসগুলোর জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অসন্তোষ নেই। দিব্যি খোশ হালে আছে তারা। তবে রাস্তা মোটামুটি ভাল বলে মাঝে সাজে বাসগুলো বেশ স্পীডে চলে। তবে ভিতরে তখন ঝাকুনি খেতে খেতে যাত্রীদের হয় প্রাণান্তকর অবস্থা। আমি বলি কি লঞ্চেই আসুন না ছাতক হয়ে। সারা দিন ট্রেন জার্নির পর নদী পথের ভ্রমণটা খুব ভাল লাগবে আপনার। বিকালের লোকাল ট্রেনটা হাপাতে হাপাতে ছটার দিকে আপনাকে ছাতক পৌঁছাবে। যেমন শান্ত ধ্যান গভীর ভাব। সন্ধ্যায় দিকে গা একটু ছমছমই করবে আপনার। যদি লঞ্চে আসে তবে নতুন একটা জায়গাও দেখা হবে। আর যদি বিকালের ট্রেনে আসেন তবেত আপনাকে ছাতক হয়েই আসতে হবে। পা চালিয়ে ৩/৪ মিনিটে লঞ্চ ঘাটে পৌঁছবেন আপনি। ট্রেনের যাত্রীরা সবাই এসে পড়লেই সন্ধ্যার দিকে এ সময় লঞ্চ ছেড়ে দিবে। ওপারে সিমেন্ট কারখানার লম্বা ধূমায়মান চুংগুলোকে বাম পাশ রেখে লঞ্চ এগুতে থাকবে। ধীরে রাত নেমে আসবে। বেশ কতগুলো স্টেশন পেরিয়ে রাত সাড়ে নটার দিকে সুনামগঞ্জ পৌঁছে যাবেন আপনি। যদি বৃষ্টির দিন হয় লঞ্চ ভিড়বে থানার উঁচু ঘাটে। রাত্রির অন্ধকার সুনামগঞ্জ প্রথম স্বাগত জানাবে আপনাকে। সঙ্গের জিনিষপত্র কুলিকে সমজিয়ে লঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে সুনামগঞ্জের মাটিতে প্রথম পা রাখলেন আপনি। প্রথমেই আশ্চর্য হবেন কুলিকে আপনার জিনিসপত্রগুলো বেতের ঝুড়িতে (ছিক্যা) তুলে এক খণ্ড বাসের (বেউ) সাহায্যে কাঁধে তুলতে দেখে যেন হাট ফেরৎ চাষী। ... কুলিরা এভাবেই মাল বয়' (পূর্বোক্ত, ৩২-৩৩)।

সুনামগঞ্জ শহর দেখতে এসে 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হারুন লিখেছেন 'এ ভিলেজ টাউন'। ভার যারা সফর করেছেন তাদের মতে আসামের শহরগুলোর

www.pathagar.com

সাথে এর অনেক মিল রয়েছে। কাছাড়ের হাইলাকান্দি শহর নাকি হুবহু সুনামগঞ্জের মতো। ...সুনামগঞ্জের বাড়িঘর হালকা গাথুনি ও টিনের চাল দিয়ে তৈরি হতো। অনুমান করা হয় ১৩০৪ বাংলার বড় ভূমিকম্পের পর মানুষ দালান কোঠা নির্মাণ করতে ভয় পেত। শহরের রাস্তা ছিল ইট বিছানো। ১৯৫৭/১৯৫৮ সালে রাস্তা পাকার কাজ শুরু হয়। এ শহরের সব রাস্তাই কংক্রিটের। এর কারণ এখানে বালু পাথর ও সিমেন্ট সস্তা ও সহজলভ্য বলে। শহরে রিকশা প্রথম আসে ১৯৬১ সালে নিয়মতিভাবে। প্রথমে ছিল মাত্র একখানা। যাত্রী ছাড়া বাকিরা এর দর্শক মাত্র। রিকসার ভাড়া ছিল চার আনা মাত্র। টেলিফোন আসে ষাটের দশকে। এটা ছিল মেগনেটো। এরপর হয় সিবি, ১৯৮৮ সালে স্বয়ংক্রিয় হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতি আসে ১৯৬২ সালের দিকে। স্থানীয়ভাবে সরকারি উদ্যোগে ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় কোম্পানি গঠন করে এর যাত্রা শুরু হয়। তখন দুটি মাত্র যন্ত্রের সাহায্যে এ বিদ্যুৎ তৈরি হতো। বিকট শব্দ সৃষ্টি করে শুধু মাত্র রাতের বেলায় রাত ১১টা পর্যন্ত এ বিদ্যুৎ সরবরাহ হতো। এর আওতায় খুব কম বাড়ি ঘরই ছিল। মেশিন স্থাপনের জন্য এসেছিল বিদেশি জার্মান ইঞ্জিনিয়ার মি. লিটন সাহেব। এর আগে মিউনিসিপিলিটি কিছু কিছু রাস্তায় কেরোসিন বাতি ও হ্যাজাক মাঝে মাঝে জ্বালিয়ে রাখতো।

সুনামগঞ্জে সিনেমা হল হয় ১৯৬১ সালে। এর প্রথম নাম ছিল 'দিলরুবা' পরে হয় 'নূরজাহান'। এটিই সুনামগঞ্জের একমাত্র সিনেমা হল। ছাতকে রয়েছে 'ছাতক টকিজ'। এছাড়া দিরাই উপজেলায়ও একটি সিনেমা হল রয়েছে। টাউন হলে সিনেমার পূর্ব রূপ স্ববাক ও নির্বাক ছবি প্রদর্শিত হতো কালেভদ্রে। ফলে স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠানই ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের অন্যতম ব্যবস্থা। এ জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকে লোকারণ্য হতো। সরকারি যানবাহন ছিল লঞ্চ ও স্টিমার। সিলেটের জেলা প্রশাসক ঐ যানে চড়ে সুনামগঞ্জ সফর করতেন। এতে থাকারও বসার সুবন্দোবস্ত ছিল। অনেক মিটিংও জাহাজের ভেতরেই সেরে নিতে পারতেন। স্টিমারের হুইসেল শুনেই বুঝা যেত জেলা প্রশাসকের জাহাজ আসছে। মহকুমা প্রশাসকদেরও সফরের জন্য এরকম সুন্দর সুন্দর ছোট খাট লঞ্চ ছিল। এ দ্বারা মহকুমা প্রশাসকগণ মফস্বলে যেতেন। ১৯৫৯ সালের দিকে প্রথম সরকারি গাড়ি আসে মহকুমা প্রশাসকের জন্য। এটি অনেকটা আপ কারের মতো।

সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক পাকা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর। এর আগে এ রাস্তায় বাস চড়তে সময় নিত ছয় ঘন্টার মতো। সিলেটে যেতে হলে ১১টার মেল বাসে সুনামগঞ্জ ছেড়ে বিকালে পৌঁছত সিলেটে। রাস্তা ছিল কাঁচা। বিকাল চারটার মধ্যে সিলেট সুনামগঞ্জ উভয় দিক থেকে বাস ছাড়া হয়ে যেত। রাতে বাস চলতো না।" (পূর্বোক্ত, ৩৩-৩৪)।

ইশতিয়াক আলম তাঁর 'মেঘ কোলে' বইতে লিখেছেন 'ওরা কথা বলছিল ছাতার নীচে আগে বাজার বসতো বলে জায়গায় নাম হওয়া ছাতক বাজারের বাগবাড়ি এলাকার একটি মাটির টিলার উপর গড়ে উঠে। এতটুকু টিলা হলে কি হবে উপরে দেশের একমাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। তার ওপাশে সবুজ প্রান্তর। দূরে নীল আকাশের পটভূমিকায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃতি খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়। পেছনে অনতি দূরে পেপার এণ্ড পাল্প মিল। ... ইংরেজরা এ উপমহাদেশে আগমণ করে ১৬১২ সালে। ২১৭ জন ইংরেজ বণিকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা কর দেয়ার চুক্তিতে দিল্লির কাছে মুগল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা দেওয়ানি লাভ করে।

www.pathagar.com

দেওয়ানি মানে খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব পাওয়া। দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সিলেট জেলা ইংরেজদের অধিকারে আসে। প্রথমে ঢাকা থেকে সিলেট শাসন করা হতো। ১৭৭১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিলেটে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি পাঠায়। তার নাম সামনার। পদের নাম সুপারভাইজার তার দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ বা খাজনা আদায়। ফৌজদারি বিচার করতো মুসলমান সুবাদারগণ। সিলেটে দ্বিতীয় ইংরেজ প্রতিনিধি হয়ে আসে ইউলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে; ১৭৭২ সালের অক্টোবর মাসে। পদের নাম বদল হয়ে কলেক্টর করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। এদের নজর ছিল লাভের দিকে। ... প্রাচীনকাল থেকেই সিলেটের চুনের নাম ডাক ছিল। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মীর কাসিমের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে সন্ধি হয় তাতেও সিলেট জেলার চুন কারবারের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। থ্যাকারের বিশেষ দায়িত্ব ছিল সিলেট জেলা থেকে চুন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা। তার সময় সিলেট থেকে বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার মণ চুন রপ্তানি হতো। ১৯০২/০৩ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় বার্ষিক কুড়ি লক্ষ মণ। কারণ তখনও সিমেন্ট আবিষ্কার হয়নি ... একশত মণ চুনের দাম ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। নদীপথে সিমেন্ট থেকে কোলকাতায় চুন পাঠানো হতো। ... ছাতক থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত সুরমা নদীর দু' পাড়ে ছিল চুনের ভাটা। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মকর্তা কর্মচারীরা চাকরির সঙ্গে ব্যবসা করতে পারতো। ... সিলেটে তখন কালেক্টর হয়ে আসেন রবার্ট লিন্ডসে ১৭৭৮ সালে। ... তিনিই সিলেটে চুন কারখানা গড়ে তোলেন। ... ব্যবসা করে নিজেও প্রচুর লাভবান হন। ... লিন্ডসে ফিরে যান ১২৮৯ সালে। এর পাঁচবছর পর এইচ. টি. রাইট এবং জর্জ ইংলিশ নামক দু'জন ইংরেজ সিলেট এসে চুনের ব্যবসা শুরু করেন 'রাইট ইংলিশ অ্যান্ড কোম্পানি' নাম দিয়ে। রাইট মারা যান ১৮১৮ সালে। জর্জ ইংলিশ একা মালিক হন কোম্পানির। এর নাম রাখা হয় ইংলিশ কোম্পানি। ... ইংলিশ ব্যবসা করতেন ছাতকে। তখন ছাতক থেকে গোয়ালন্দ (রাজবাড়ি জেলা) এবং গোয়ালন্দ থেকে কলকাতা পর্যন্ত নদী পথে জাহাজে চলাচল করতো। সিলেট থেকে যেত চুন, চা, কমলালেবু ও তেজপাতা।

জর্জ ইংলিশ ১৮৫০ সালে সিলেট হাসপাতালে মারা গেলে তার ইচ্ছা অনুসারে এই টিলার উপরে তাকে কবর দেওয়া হয়। তার পরিবারের সদস্যরা ১৮৯০ সালে এই স্মৃতি ও সৌধটি নির্মাণ করেন।...জর্জ ইংলিশ মারা যাওয়ার পরে কোম্পানির মালিক হয় তার ছেলে হেনরী বা হ্যারি ইংলিশ। ১৮৩৫ সালে জয়ন্তিয়া দখলে হ্যারীর সক্রিয়া ভূমিকা ছিল। ছাতকেও চেরাপুঞ্জিতে আরো জমি জমা ক্রয় করে। সিলেট সদরে কোম্পানীগঞ্জ বাজার এই ইংলিশ কোম্পানির নামানুসারে রাখা হয়। শেষ বয়সে হ্যারী জনদরদি হয়ে উঠেন। সাধু সন্ন্যাসীদের মতো দাড়ি রেখে ছিলেন। ১৮৬০ সালে ইংল্যান্ডে হ্যারী ইংলিশ মারা যান। পরে সেখানে তারা লাশ মমি করে রাখা হয়। দশ বছর পর তার স্ত্রী সোফিয়া মারা গেলে দুজনের মৃত দেহ এক সঙ্গে চেরা পুঞ্জি পাহাড়ের মাটির উপর পাকা কবরে সমাহিত করা হয় তার ইচ্ছা অনুসারে। হ্যারীকে মাটিতে কবর না দেওয়ার কারণ ছিল ব্যবসায়িক। চুনাপাথর আহরণের জন্য খাসিয়া সর্দারদের সংগে তার চুক্তির শর্তে উল্লেখ ছিল যতদিন তার দেহ মাটির সঙ্গে মিশে না যায় ততদিন তারা (খাসিয়ারা) চুক্তি করবে না। ফলে পাহাড়ি উপজাতি খাসিয়ারা চিন্তাও করতে পারেনি যে চতুর ইংরেজ মরে যেয়েও তাদেরকে চুক্তির বাঁধনে বেঁধে রাখবে।' (পূর্বোক্ত, ৩৪-৩৫)।

www.pathagar.com

৭. জনবসতির পরিচয়

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেবের মতে 'বাংলাদেশের অপরাপর জেলার লোকদের মতো সুনামগঞ্জ বাসীদের রক্তের মধ্যে প্রটো অষ্ট্রলয়েড বা অষ্ট্রিক জাতীয় লোকের রক্ত সর্বাধিক পরিমাণে বর্তমান। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেটে আগমনের পরে আন্তঃভাষা বিবাহের কারণে তুর্কি, মোগল ও সেমেটিক রক্তের মিশ্রণ হলেও তা অতি নগণ্য ও সীমিত। তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে সমগ্র বাংলাদেশে আর্যরক্ত হোমিওপ্যাথিক ডোজের মত। সুনামগঞ্জ তথা বৃহত্তর সিলেটে পাল বা সেন রাজাদের আধিপত্যের কোন নিদর্শন নেই। সেন রাজাদের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার লোকদের আর্য করণ (Aryenization) যেভাবে হয়েছে বৃহত্তর সিলেটে সেভাবে হয়নি। সুনামগঞ্জবাসীদের রক্তের মধ্যে গারো, কোচ, কুকি, নাগা, বর্মীয়, মনিপুরি প্রভৃতি আসামি লোকদের রক্ত নেই বললেই চলে।' (হোসাইন, ১৯৯৫: ৩৭)।

জাতি, বর্ণ ও ভাষা : বৃহত্তর সিলেটের একাংশ নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলাটি গঠিত। বিভিন্ন জাতি ও বংশের লোক এখানে বাস করে। জাতিগতভাবে হিন্দু ও মুসলমান এখানকার প্রধান অধিবাসী। তবে মুসলমানরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুর সংখ্যাও একেবারে নগন্য নয়। এছাড়া স্বল্প সংখ্যক খ্রিষ্টান, খাসিয়া ও গারো জাতিরও বাস এ জেলায় রয়েছে। অল্পসংখ্যক উড়িয়া, মাদ্রাজি, দেশওয়ালি লোকের বাস ও এখানে আছে। যারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে ছোট কাজ ও ঝাড়ুদারের কাজ করে আসছে, তাদের বংশ পরম্পরায়। বিভিন্ন সময়ে এরা দেশত্যাগ করলেও আজো তাদের একাংশ এখানে রয়ে গেছে।

সুনামগঞ্জের মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে স্বভাবতই হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। তাঁর আগমনের পরই এখানে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তাঁর সঙ্গীর ৩৬০ আউলিয়ার কতিপয় এ জেলায় স্থায়ীভাবে আবাস গড়ার কারণে তাদের বংশধর সৃষ্টি হয়। এ জেলার সৈয়দ, কামালী, কোরেশী প্রভৃতিরা উক্ত আওলিয়াদের বংশধর বলে দাবি করে থাকেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) ৩৬০ জন সঙ্গীর যাঁরা এ জেলায় বসতি স্থাপন করেন তন্মধ্যে হযরত আলা উদ্দিন বাগদাদী আওরঙ্গপুরের নিকটবর্তী সৈয়দপুর গ্রামে, হযরত শাহকামাল শাহার পাড়া গ্রামে, হযরত শেখ কালু এবং সৈয়দ আহমদ পীরেরগাঁয়ে। এ সমস্ত গ্রামগুলোতে তাঁদের বংশধররা এখনো আছেন। দাওয়াই নামক টিলার উপর হযরত দাওর বকস খাতিব এবং সৈদেরগাঁও গ্রামে হযরত ইউসুফ ইরাকীর মাজার রয়েছে। জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর গ্রামে এসেছিলেন ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ সৈয়দ শামসুদ্দিন। ইনি হযরত আলী (রা.) একজন অধস্তন বংশধর। সৈয়দপুর গ্রামের অধিকাংশ সৈয়দরাই তার বংশধর বলে দাবি করে থাকেন। হাজী শাহ শামসুদ্দিন কোরেশীর দুই বংশধর সোণাত্যা থেকে সৈয়দপুর গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সৈয়দপুর গ্রামেরও এর আশপাশ এলাকা তাদের বংশধর রয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় বহু প্রাচীন অভিজাত প্রাক্তন জমিদার পরিবার রয়েছে। প্রজাস্বত্ব আইন আমলে আসার পর এঁদের অধিকাংশই বিলুপ্ত প্রতাপ, তবে অনেক পরিবার এখনও আধুনিক শিক্ষা রাজনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা তাদের প্রভাব বহাল রেখে চলেছেন। ভাটিপাড়া, পাইলগাঁও, সিংচাপইর, সেলবরষ, বীরগাঁও, দোহলিয়া ও লক্ষণশ্রী প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারগণের এককালে খুব নাম ডাক ছিল।

www.pathagar.com

বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বেশিরভাগই ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষা ও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের একাংশ অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এসমস্ত অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। মূলভূখণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার এ সম্প্রদায়ের মূলধারা। হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট বিজয়ের পর এদের অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর ১৯৪৭ এর দেশবিভাগও তৎপরবর্তী বিভিন্ন কারণে এদের অনেকে এ দেশ ত্যাগ করলে স্বাভাবিক কারণে তাদের বাকিদের পূর্ব প্রতাপ ক্ষুণ্ন হয়। তথাপি অনেক পরিবার তাদের দীর্ঘ ঐতিহ্যসহ এখনও সগর্বে নিজ ধর্মে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করছেন। তবে শিক্ষা দীক্ষায় এরা বরাবরই মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসরমান ছিলেন।

বৃহত্তর সিলেটের অংশ হলেও সুনামগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের উপভাষা বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য উপভাষা থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুনামগঞ্জ জেলার সমগ্র অঞ্চলের ভাষা ও উচ্চারণ একরকম নয়। যেমন ছাতক সদর সিলেট এর, ধর্মপাশা ময়মনসিংহ-এর, শাল্লা, হবিগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত।

সুনমাগঞ্জের উপভাষায় অপিনিহিতর প্রভাব খুব বেশি। শব্দের মাঝে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' কে আগে উচ্চারণ করার রীতিকে বলা হয় অপিনিহিত। যথা আজ থেকে 'আইজ' রাত্রি-রাত-'রাইত' ইত্যাদি। 'ক' 'প' প্রভৃতি অল্প প্রাণ শব্দগুলো এখানে প্রায় 'খ' 'ফ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ শব্দরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : পানি-ফানি, কড়ি-খড়ি, পান-ফান ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত ধ্বনি যোগকরেও শব্দকে বিকৃত করা হয়। যথা : ভাল-ভালা, কালো-কালা, লম্বা-লাম্বা। উর্দু,ফার্সি ও আরবির প্রভাব ও এ অঞ্চলের ভাষায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আছে। যেমন : 'আয়রাম' উর্দু 'আরহা হে হাম'। গারো, খাসিয়া ও কুলিরা তাদের নিজস্ব উপভাষায় কথা বলে। পাশাপাশি স্থানীয় ভাষাও তাদের আয়ত্বে রয়েছে পুরোপুরি। সুনামগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা এত বেশি ও সমৃদ্ধ যে এক অঞ্চলের একাধিক শব্দও টান এক মাইল সীমার মাঝে ভিন্নতর শোনা যায়। তবে এ অঞ্চলের ভাষা বাইরের লোকের বুঝতে সময় লাগে না। উচ্চারণও মোটামুটি মার্জিত ও নরম মেজাজের। যা শ্রুতিমধুর তো বটেই। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী তাঁর 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' পুস্তকে লিখেছেন 'সুনামগঞ্জবাসীরা দাবী করেন, তাঁদের কথিত ভাষা ... অপেক্ষা শ্রুতিমধুর, কর্ণরোচক। ... অঞ্চলের ভাষাকে তারা কর্কশ বলতে চান। 'শান্তিপুরের চোপা' অর্থাৎ শান্তিপুরী কথ্যভাষা যেমন বাংলাদেশের সমগ্র স্থানের ভাষা অপেক্ষা মধুর, সুনামগঞ্জের ভাষাও নাকি বৃহত্তর সিলেট জেলার মধ্যে মধুরতম। (পূর্বোক্ত, ৩৭-৩৯)।

৮. সুনামগঞ্জের গারো সম্প্রদায়

সুনামগঞ্জের গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এখানকার একটি আদি ও অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যরা এ দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তাদের সাথে আদিম অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরিবর্তীতে এ আদিম সম্প্রদায় অনার্য বলে পরিচয় লাভ করে। আর্য-অনার্য যুদ্ধে অনার্যরা পরাজিত হয়ে বনে, জঙ্গলে ও পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কালক্রমে সে সমস্ত গহীন বনারণ্যকে তারা তাদের আবাস ভূমিতে পরিণত করে। এরা স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষাদীক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল।

www.pathagar.com

এদের গায়ের রং ছিল ময়লা, নাসিকা ছিল চেপ্টা বর্তমানে গারো সম্প্রদায়কে এদেরই বংশদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

পাক ভারত উপমহাদেশের অনার্যদের বাসস্থান রয়েছে পর্বত ও জঙ্গলে। আমাদের গারোরা পাহাড়, লুসাই পাহাড়া খাসিয়া পাহাড় ও ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরায় এদের ব্যাপক বাস। গারোরা মূলত গারো পাহাড়ের বাসিন্দা ছিল। আর্যদের শ্যেণ দৃষ্টির অগোচরে এরা গহীন জঙ্গলের পথে চলাফেরা করত। আজো তারা কোলাহল বর্জিত জীবন অর্থাৎ পর্বত, পাহাড় ঘেসেই বসবাস করতে আগ্রহী। তাদের বসবাসের ফলে গহীন জঙ্গলে এখন আবাদ ও অনেকাংশ সমতল। এভাবেই তারা বর্তমান সমাজের একাংশ হয়ে আছে। সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে এদের বসবাস রয়েছে। সুনাগঞ্জের বিশম্ভরপুর থানা, সদর থানা, তাহিরপুর ও ছাতক থানা একাংশ এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও আইননুগত নিরীহ নাগরিক। এরা বাঁশ ও কাঠের মাচা তৈরির করে বাসগৃহ নিমার্ণ করত। এখন বৃহৎ সমাজের মতো তারাও বাড়িঘর তৈরি করছে। ঘরের সাথে তারা পাকের ঘর, শুকরের ছোট ছোট খোয়াড় তৈরি করে বাড়ি করে থাকে। বারান্দাতে তারা বৈঠকখানার কাজ সারে।

সুনামগঞ্জে এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে হাজং, মনিপুরী, গারো, কুচ, বানাই ও হাদি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণতলা, আশউড়া গ্রামে এসব সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখনো বসবাস করছেন। বিশম্ভরপুর উপজেলায় কাইতকোন, কালীপুর, আমড়াগড়া, রাজাপাড়া, গামাইরতলা, গোলগাও, অছুকোনা ও দিগলবাক এলাকায় হাজং মণিপুরী ও গারো সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। তাহিরপুর উপজেলার কাকইগড়া, রাজাই, লালঘাট, মাঝেটিলাতে গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে। দোয়ারাবাজার উপজেলার উত্তর দোয়ারা ইউনিয়নের ছনবাড়ি ও ধনী টিলা এবং রাজগাঁও গ্রামে মণিপুরী সম্প্রদায়ের একাধিক পরিবার রয়েছে। দোয়ারাবাজার উপজেলার মাঠগাঁও, জুমগাও ও দৌলৎপুরেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর জন্য আলাদা নিয়ম কানুন রয়েছে। এদের বিয়েশাদিও আলাদা ধরনের। মনিপুরী, হাজং, বুক বানাই সম্প্রদায়ীরা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ। এর মধ্যে বেশির ভাগই প্রটেস্টেন্ট। কেথলিক মোটেও নেই বললেই চলে। ইদানিং প্রটেস্টেন্টরা বিদেশি সাহায্য নির্ভরতার কারণে আবার দুভাগে বিভক্ত। খাসিয়ারা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত। এরা মাতার দ্বারা শাসিত। এদের পুরুষরা কোনো সম্পত্তির মালিক হয় না। পুরুষদের বিয়ে হলে তারা শ্বশুর বাড়ি অর্থাৎ স্ত্রী বাড়িতে যায়।

এদের সাংস্কৃতিক জীবন বেশ জমজমাট। এরা আনন্দ, বিবাহ ও উৎসবে নৃত্যগীত করে থাকে। তাদের গান তাদের নিজস্ব ভাষায় রচিত। তবে এগুলোর সুর বেশ মিষ্টি। এঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিতে জানে না। সমিতির কর্তারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ইদানিং এদের অনেকে স্থানীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। (পূর্বোক্ত, ৬২-৬৩)।

৯. সুনামগঞ্জের পির আউলিয়া দরবেশ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের কারণে বৃহত্তর সিলেট জেলা ইসলাম ধর্মের সরাসরি সংস্পর্শ আসে। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ৩৬০ সঙ্গীরা বৃহত্তর সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং স্থানীয়ভাবে বসাবাস শুরু করেন। এঁরা মানুষকে

www.pathagar.com

ধর্মের পথে আহবান ছাড়াও দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, দুনিয়ার চলার পথ ও আখেরাতের মুক্তির পথ দেখাতে থাকেন। এদের অনেকে এতদাঞ্চলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। যাঁদের বংশধর আজো এ অঞ্চলে রয়েছেন। এদের পদবি সৈয়দ, কোরেশী, কামালী, মীর ইত্যাদি। সুনামগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। বৃহত্তর সিলেট জেলার অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জে যাঁদের আগমন ঘটে তাঁদের কথা বাদ দিয়ে জেলার ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। তাঁদের এ দেশের আসার কারণে ধর্ম-কর্ম ছাড়াও আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, চালচলন, কথাবার্তা শিক্ষা সংস্কৃতিতে এসেছে নতুন জোয়ার। যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। ফলে এগুলো আমাদের নিজস্ব সম্পদে পরিণতি হয়েছে। আমরা নিজেরাও হয়েছি সমৃদ্ধ। হাজার বছরের এ প্রবাহ আজো বহমান। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ৩৬০ জন সঙ্গীদের যাঁরা এ জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন : হযরত আলাউদ্দিন বাগদাদী, হযরত শাহ কামাল, হযরত শেখ কালু, হযরত সৈয়দ আহমদ, হযরত দাওর বখস খতিব, হযরত ইউসুফ ইরাকী ও হযরত শাহ শামসুদ্দিন। হযরত শাহ আরফিন-এর মাজার বর্তমানে লাউড় পাহাড়ের ওপাড়ে ভারতে পড়ে গেছে। তবে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় প্রতি বছরই তিন দিনব্যাপী শাহ আরফিনের ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হযরত ইউসুফ হারুন বোগদাদী (রহ.) মাজার সুনামগঞ্জ শহরের মুহাম্মদপুরে অবস্থিত। এছাড়াও সুনামগঞ্জে অনেক সিদ্ধপুরুষ ও অলি-আউলিয়ার মাজার রয়েছে। যা স্থানীয়ভাবে মর্যাদাসহ সংরক্ষণ করা হয়। (পূর্বোক্ত, ৬৩-৬৪)।

১০. নদ-নদী ও খাল বিল

সুনামগঞ্জ জেলায় নদী ২৫টি, বদ্ধ জলমহাল ৯৯৭টি, ২০ একরের উর্ধ্বে ৪১৮টি, অনুর্ধ্ব ২০ একর ৫৭৯টি, উন্মুক্ত জলমহাল ৭৩টি, মোট জমি ৩,৭৯,২১৬ হেক্টর, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ২৯টি ও ক্যাম্প অফিস ৫টি এবং খেয়াঘাট/নৌকাঘাট ১২৪টি। উল্লেখযোগ্য হাওরের মধ্যে রয়েছে : বানাইয়া, বড় সাওলা, ষোলসাড়, ষোড়ষ, চেপ্টি হাওর, দেখার হাওর, ধানকুনিয়ার হাওর, সোনামড়ল হাওর, জয়ধুনার হাওর, আংগুরলী হাওর, জাওয়ার, করচা, মহাই, নলুয়া, পারুয়া, শনির হাওর, টাঙ্গুয়া, টগার হাওর, মাটিয়ান হাওর, গুরমার হাওর, চন্দ্রসোনার হাওর, পাগনার হাওর, কালিকোটা হাওর, বরাম হাওর, জোয়াল ভাঙা হাওর। (হক, ২০০৬: ৫৮৬,৫৮৭)

সুরমা নদী

www.pathagar.com

১১. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

হাওর অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় সিলেট বিভাগের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ জেলা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। তবে এরপরও এ জেলায় বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সুনামগঞ্জ শহরে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ এবং সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ অন্যতম। জেলার বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে ছাতক ডিগ্রি কলেজ, জামালগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, দিরাই কলেজ, জগন্নাথপুর কলেজ, শাল্লা কলেজ, দি বর্মন কলেজ, দোয়ারাবাজার কলেজ, গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ, বাদশাহগঞ্জ কলেজ উল্লেখযোগ্য।

সরকারি-বেসরকারি কলেজ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত ও বহুপ্রাচীন মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা এ জেলার শিক্ষাবিস্তারে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজগোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জগন্নাথপুর উপজেলায় ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পাইলগাঁও বি এন উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। (পূর্বোক্ত, ২৬৮)।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে উপজেলাভিত্তিক একটি তালিকা নিম্নরূপ :

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা

১. সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়
২. সরকারি এস সি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৩. এইচ এম পি উচ্চ বিদ্যালয়
৪. বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়
৫. সুনামগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৬. লবজান চৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৭. পাগলা উচ্চা বিদ্যালয়, পাগলা
৮. রংগারচর-হরিনাপাটি উচ্চ বিদ্যালয়, আমবাড়ি
৯. আব্দুর রশিদ উচ্চ বিদ্যালয়, দরগাপাশা
১০. ইয়াকুব উল্লা পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় গৌরারং
১১. জয়নগর বাজার হাজী গনিবক্স উচ্চ বিদ্যালয়, জয়নগর
১২. সুরমা উচ্চ বিদ্যালয়, পাথারিয়া
১৩. জয়কলস-উজানী গাঁও রশিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, জয়কলস
১৪. বীরগাঁও উমদাদুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, বীরগাঁও
১৫. গনিনগর ষোলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, পাথারিয়া
১৬. কৃষ্ণনগর-ষোলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, মঙ্গল কাঠা
১৭. চরমহল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, বেতগঞ্জ বাজার
১৮. ডুংরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ডুংরিয়া
১৯. নারায়ণতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণতলা
২০. আব্দুল গফুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দামোদরতপী
২১. হাজী লাল মামুদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গৌরারং
২২. দ্বীনি সিনিয়র মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ

www.pathagar.com

ছাতক উপজেলা

১. ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক
২. ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক
৩. পাল্প এন্ড পেপার মিল উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক
৪. গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, গোবিন্দগঞ্জ
৫. পাইগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, জাউয়াবাজার
৬. মউনপুর এম এল উচ্চ বিদ্যালয়, মউনপুর
৭. চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক
৮. সমতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেওতেরপাড়া
৯. ঝিগলী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিগলী
১০. খুরমা দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়, খুরমা
১১. নূতন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, জাতুয়া
১২. শুকুরুন্নেছা চৌধুরী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, পীরপুর
১৩. গণিপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গণিপুর
১৪. বাংলাবাজার সামরুন্নেছা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নূতন বাংলাবাজার
১৫. বুরাইয়া ফাজিল মাদ্রাসা, বুরাইয়া বাজার
১৬. খরদিরচর আলীম মাদ্রাসা, জাতুয়া
১৭. সিংচাপইর ইসলামিয়া মাদ্রাসা, খুরমা

দিরাই উপজেলা

১. দিরাই উচ্চ বিদ্যালয়, দিরাই
২. ব্রজেন্দ্রগঞ্জ আর সি উচ্চ বিদ্যালয়
৩. রজনীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়
৪. দিরাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৫. রাজানগর কে সি পি উচ্চ বিদ্যালয়, হরনগর
৬. ভাটিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ভাটিপাড়া
৭. জগদল আল ফারুক উচ্চ বিদ্যালয়, জগদল
৮. ধল পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, ধলবাজার
৯. হাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, হাতিয়া
১০. তাড়ল উচ্চ বিদ্যালয়, তাড়ল
১১. রফিনগর উচ্চ বিদ্যালয়, রফিনগর
১২. আলহাজ্ব আব্দুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতপুর
১৩. গচিয়া শামসুদ্দিন সিকন্দর উচ্চ বিদ্যালয়, গচিয়া
১৪. ফকির মোহাম্মদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালি বাজার

জগন্নাথপুর উপজেলা

১. জগন্নাথপুর স্বরূপ চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
২. জগন্নাথপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

www.pathagar.com

৩. সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সৈয়দপুর
৪. সফাত উল্লাহ বিদ্যালয়, মোহাম্মদগঞ্জ বাজার
৫. পাইলগাঁও বি এন উচ্চ বিদ্যালয়, পাইলগাঁও
৬. মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, এ বি কাপন
৭. সিরামিশি উচ্চ বিদ্যালয়, দাওরাই বাজার
৮. ষড়পল্লী উচ্চ বিদ্যালয়, দাওরাই বাজার
৯. রৌয়াইল উচ্চ বিদ্যালয়, দাওরাই বাজার
১০. পাটলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, পাটলী
১১. এরালিয়া বাজর উচ্চ বিদ্যালয়, এরালিয়া
১২. ইসাকপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, গোবিন্দ বাজার
১৩. আটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, জহিরপুর
১৪. নয়াবন্দর উচ্চ বিদ্যালয়, জহিরপুর
১৫. রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, রাণীগঞ্জ
১৬. শাহকামাল উচ্চ বিদ্যালয়, শাহারপাড়া
১৭. অরুনোদয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কুবাজপুর
১৮. হাবিবপুর আলিয়া মাদ্রাসা
১৯. ইকড়ছই আলীয়া মাদ্রাসা

শাল্লা উপজেলা

১. গিরিধর উচ্চ বিদ্যালয়, আঙ্গারুয়া
২. শহীদ আলী পাবলিক পাইলট দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ঘুঙ্গিয়ারগাঁও
৩. গোবিন্দ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঘুঙ্গিয়ারগাঁও
৪. শ্যাম সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়

জামালগঞ্জ উপজেলা

১. জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, সাচনা বাজার
২. জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সাচনা বাজার
৩. ভীমখালি উচ্চ বিদ্যালয়, ভীমখালি
৪. নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, ভীমখালি
৫. আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেলিমগঞ্জ
৬. সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, সাচনা বাজার

তাহিরপুর উপজেলা

১. তাহিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
২. বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়
৩. বালিজুরী এলাহী বক্স উচ্চ বিদ্যালয়
৪. টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৫. তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৬. বালিজুরী আলীম মাদ্রাসা

www.pathagar.com

ধর্মপাশা উপজেলা

১. বাদশাগঞ্জ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়
২. মধ্যনগর বি পি উচ্চ বিদ্যালয়
৩. জনতা উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্মপাশা
৪. বংশীকুণ্ডা মমিন উচ্চ বিদ্যালয়
৫. গোলকপুর আব্দুল হাফিজ উচ্চ বিদ্যালয়
৬. ধর্মপাশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৭. জয়শ্রী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মধ্যনগর
৮. গলহা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মধ্যনগর
৯. আবিদনগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১০. গাছলতা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাইকরাটি

বিশ্বম্বরপুর উপজেলা

১. বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়
২. পলাশ উচ্চ বিদ্যালয়, মেরুয়াখলা
৩. কাটাখালী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়
৪. ধনপুর আসমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ফতেপুর
৫. মুরারী চাঁদ বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ফতেপুর
৬. হাজী মানিক উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়, ফতেপুর
৭. সাতগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, রতারগাঁও
৮. রতারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, রতারগাঁও
৯. মেরুয়াখলা উচ্চ বিদ্যালয়, রতারগাঁও
১০. মেরুয়াখলা সিনিয়র মাদ্রাসা

দোয়ারাবাজার উপজেলা

১. ঘিলাছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নরসিংপুর
২. বড়ভাল পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার
৩. আমবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়
৪. বগুলা রুসমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়
৫. টেংরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দোয়ারাবাজর
৬. প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দোয়ারাবাজার
৭. সমুজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, দোহালিয়া
৮. লিয়াকতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর
৯. লিয়াকতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর
১০. কলাউড়া দারুছুন্নাহ কাশিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, নরসিংপুর। (পূর্বোক্ত, ২৬৮-২৭০)।

সুনামগঞ্জ জেলায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসাগুলো নিম্নরূপ :

সুনামগঞ্জ সদর	প্রতিষ্ঠাকাল
১. দ্বীনি সিনিয়র মাদ্রাসা	১৯৭৭

www.pathagar.com

২. ইয়াকুবিয়া মাদ্রাসা ৩. আমরিয়া মাদ্রাসা	১৯৭৮ ১৯৭৮
ছাতক থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. খরিদিরচর মাদ্রাসা ২. সিংচাপইড় ইসলামিয়া মাদ্রাসা ৩. গোবিন্দনগর ফজিলিয়া মাদ্রাসা ৪. বুরাইয়া মাদ্রাসা ৫. দ্বীনেরটুক মাদ্রাসা ৬. লাকেশ্বর মাদ্রাসা ৭. পালপুর জালালিয়া মাদ্রাসা ৮. নুরুল্লাপুর জালালিয়া মাদ্রাসা ৯. জাহিদপুর জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ১০. নূতনবাজার মাদ্রাসা	১৯৫৭ ১৯৭৫ ১৯৭৭ ১৯৭৮ ১৯৭৯ ১৯৮০ ১৯৮৬ ১৯৮৭ ১৯৮৭ ১৯৮৮
জগন্নাথপুর থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. ইকড়ছই জামেয়া মাদ্রাসা ২. নুরুল্লাপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসা ৩. হাবিবপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসা ৪. রসুলপুর বনগাঁও ইসলামিয়া মাদ্রাসা ৫. কামড়াখাই জয়নগর মাদ্রাসা ৬. হলিয়ারপাড়া জাশেয়া কাদেরিয়া সুন্নিয়া ৭. রসুলপুর জামেয়া আলীয়া মাদ্রাসা ৮. চরা জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ৯. জয়দা আমরিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা	১৯৭০ ১৯৭২ ১৯৭৭ ১৯৮০ ১৯৮২ ১৯৮৫ ১৯৮৭ ১৯৮৭ ১৯৮৯
বিশ্বম্ভরপুর থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. মেরুয়াখলা ফাজিল মাদ্রাসা ২. কাপন জালালিয়া মাদ্রাসা ৩. দিঘিরপাড় দাখিল মাদ্রাসা	১৯৮৫ ১৯৭৫ ১৯৮৭
দিরাই থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. শ্যামাচরইসলামিয়া মাদ্রাসা ২. হায়দরিয়া মাদ্রাসা ৩. ধল আশ্রম মাদ্রাসা	১৯৭৮ ১৯৭৮ ১৯৭৯
ধর্মপাশা থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. খয়েদিরচর মাদ্রাসা ২. মহিষখলা মাদ্রাসা ৩. নোয়াগাঁও মাদ্রাসা ৪. জামেয়া হাতেমিয়া মাদ্রাসা	১৯৭৬ ১৯৭৮ ১৯৭৮ ১৯৮৭

www.pathagar.com

জামালগঞ্জ থানা	প্রতিষ্ঠাকাল
১. লক্ষীপুর তাওয়াক্কেলিয়া মাদ্রাসা	১৯৭৮
২. কালিপুর নেছারিয়া মাদ্রাসা	১৯৭৯
৩. নোয়াগাঁও আটগ্রাম মাদ্রাসা	১৯৭৯
৪. সুকদেবপুর মাদ্রাসা	১৯৮০
৫. সাচনা বাজার মাদ্রাসা	১৯৮৫
তাহিরপুর থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. তাহিরপুর হিফজুল উলুম	১৯৮৬
২. বি এইচ এ উলুম বাদাঘাট রহমানিয়া মাদ্রাসা	১৯৮৮
শাল্লা থানা	**প্রতিষ্ঠাকাল**
১. শাল্লা হাসিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা	১৯৮৭

(পূর্বোক্ত, ২৭১)

১২. ঐতিহাসিক স্থাপনা

দর্শনীয় স্থান : সুনামগঞ্জ সদরে মরমি কবি হাসন রাজার বাড়ি, নারায়ণতলা খ্রিস্টান মিশন, শাহ কামাল সাহেবের মাজার, দোয়ারাবাজার উপজেলায় টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ড, টেকেরহাট চুনাপাথার উত্তোলন কেন্দ্র, তাহিরপুর উপজেলায় পণাতীর্থ, টাঙ্গুয়ার হাওর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় পাগলার মসজিদ, দিরাই উপজেলায় বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের বসতভিটা উল্লেখযোগ্য।

হাসন রাজা মিউজিয়াম : সুনামগঞ্জ পৌরসভা এলাকার তেঘরিয়ায় সুরমা নদীর কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে হাসন রাজার স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি। এ বাড়িটি একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। হাসন রাজা মূলত ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। মরমি সাধক হাসন রাজা জীবনে অসংখ্য গান রচনা করে আজ অবধি লোকপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছেন। কালোত্তীর্ণ এ সাধকের ব্যবহৃত কুর্তা, খড়ম, তরবারি, পাগড়ি, ঢাল, থালা, বই ও নিজের হাতের লেখা কবিতার ও গানের পাণ্ডুলিপি আজও বহু দর্শণার্থীদের আবেগ আপ্লুত করে। এই মরমি কবির রচিত গানে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসন রাজাকে পত্রের মাধ্যমে অভিনন্দন ও প্রশংসা জানিয়েছিলেন।

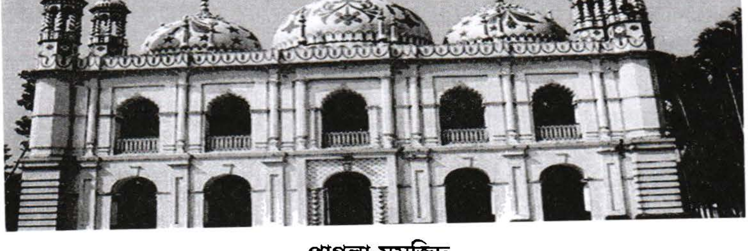

পাগলা মসজিদ

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ পৌর এলাকাধীন গাজির দরগা নামক পারিবারিক কবরস্থানে প্রিয়তম মায়ের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন মরমি কবি হাসন রাজা। হাসন রাজার মাজার দেখার জন্য প্রতি বৎসর বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

ডলুরা শহিদদের সমাধি সৌধ : সুনামগঞ্জ গেলে মুহূর্তেই ৪৮ জন মহান শহিদ মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় অন্তত চোখে ভাসে তার নাম ডলুরা। পাহাড়ের পাদদেশে চলতি নদীর তীরে লুকায়িত আছে সেই একাত্তরের রক্তত্যাগ সংগ্রামের স্মৃতি চিহ্ন। মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জের ইতিহাস খুব সমৃদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধে সীমান্তবর্তী ডলুরা ছিল সুনামগঞ্জের অন্যতম রণাঙ্গন। এই রণাঙ্গনটি ছিল ৪ নং বালাট সেক্টরের অধীন। উক্ত রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন তাঁদের কয়েকজনকে এখানে সমাহিত করা হয়। ১৯৭৩ সালে ৪৮ জন শহিদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ডলুরা শহিদ মাজার।

পাগলা মসজিদ : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাগলা ইউনিয়নের অন্তর্গত পাগলা বাজারের কাছে অপূর্ব কারুকাজশোভিত পাগলা জামে মসজিদ। তার সুন্দর গম্বুজ বহু দূর থেকে দৃষ্টি কাড়ে। এটি জেলার একটি প্রাচীন মসজিদ।

দোহালিয়া জমিদার বাড়ি : ইটার বাৎস্য গোত্রীয় রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশোদ্ভূত জনৈক বাসুদেব দোহালিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। এ বংশের জনৈক মহেশ্বর নামক ব্যক্তি খাসিয়া রাজা ধনুরাজের কাছ থেকে অবৈধ দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করে দোহালিয়ায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দোহালিয়ার জমিদার কুশল রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বার বার কোম্পানি বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। এই পরগনা অনেক ঐতিহাসক ঘটনার স্বাক্ষী। এ বংশের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অন্যতম। মরমি কবি হাসন রাজা পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে দোহালিয়ার জমিদারদের সাথে। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন জমিদারের কাঠের তৈরি দোতলা বাসগৃহ। একটি চুন সুরকির তৈরি শতবর্ষীয় প্রাচীন মসজিদ ও অন্যান্য স্মৃতি চিহ্ন।

গৌরারং জমিদার বাড়ি : গৌরারং জমিদার বংশের আদি পুরুষ নিধিরাম সুরমা নদীর পশ্চিম দিকে গৌরারং গ্রামে প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয়ে তৈরি করেন সুরম্য জমিদার প্রাসাদ। এ বংশের নগেন্দ্র চৌধুরী সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। গৌরারং এর জমিদার প্রাসাদে দেখার মতো রঙমহল, বাঁধাই করা বিরাট পুকুর ঘাট, অন্ধকূপ, যাত্রামঞ্চ ইত্যাদি আপনাকে মুগ্ধ করবে।

টাউন জামে মসজিদ : টাউন জামে মসজিদ পুরাতন কালেক্টরেট ভবন ও জজ আদালত ভবন সংলগ্ন হওয়াতে ঐ মসজিদটি সাধারণ কোর্ট মসজিদ নামেই সমধিক পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে ঐ মসজিদটি সংস্কার করে অনেকটা ঢাকার তারা মসজিদের মতো করা হয়েছে।

সৈয়দ উমেদ হারুন বোগদাদী (রহ.) মাজার : সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর গ্রামে সৈয়দ উমেদ হারুন বোগদাদী (রহ.) মাজার অবস্থিত। উক্ত মাজারটি মোহাম্মদপুর মোকাম নামেই পরিচিত। সম্ভবত তিনি ১২৩০ বাংলা সনে ইন্তেকাল করেন। মোহাম্মদপুর গ্রামের এক পাশে শান্ত, সুন্দরমনোরম পরিবেশ এই মহান বুজুর্গ চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

এসব ঐতিহাসিক স্থাপনার পাশাপাশি সুনামগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির, প্রায় ২০০ বছর পূর্বে জলসুকার জমিদারগণ কর্তৃক

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন কালীমন্দির, বিথঙ্গলের গোঁসাইগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন শ্রী শ্রী কালাচাঁদের মন্দির, প্রায় ৫০০ বছর আগে জগন্নাথপুর উপজেলা সদরে রাজা বিজয় সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দির, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাথারিয়া আখড়া, আচনার জগন্নাথ বাড়ি, দোয়ারাবাজার আখড়া, মধ্যনগর জগন্নাথ মন্দির, দিরাই জগন্নাথ বাড়ি, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাগলা আখড়া অন্যতম ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে স্থানীয়ভাবে আদরণীয় হয়ে আসছে। (পূর্বোক্ত, ১০১)।

১৩. প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্ভাবনা

প্রকৃতির অফুরন্ত দানে সমৃদ্ধ সুনামগঞ্জ জেলা। একই অঙ্গে এর নানা মূল্যবান রত্নালঙ্কার। এ জেলায় রয়েছে সিমেন্ট তৈরির চুনাপাথর, কাচ তৈরির উপযোগী সিলিকা (বালু), জ্বালানি গ্যাস, কাগজের মণ্ড তৈরির উপযোগী নল খাগড়া, মাছে পরিপূর্ণ হাওর, বিল, নদী, নালা, খাল। এতে রয়েছে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক, মণিপুরি মেয়েদের হাতে তৈরি কাপড়, চাদর ও শাল। আরো আছে অফুরন্ত চুন, বালি, পাথর, বোল্ডার ও কয়লা। এ কারণেই সুনামগঞ্জের সুনামযুক্ত নামে হয়েছে সার্থক। নামে ও সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের এ সীমান্ত সংলগ্ন জনপদ। এ জনপদের সংগুপ্ত ও ছড়িয়ে থাকা সম্পদগুলো শুধু জেলার নয় সমগ্র দেশের অর্থনীতির এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ। এ সম্পদের যথাযথ আহরণ ও ব্যবহার হলে এগুলো জাতীয় সম্পদ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পদে পরিণত হতে পারে। যার বিনিময়ে অর্জিত হতে পারে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। এতে হতে পারে হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান। দুঃখজনক হলেও এ সম্পদের যথার্থ অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারের সার্বিক কোনো পরিকল্পনা নেই। যে যে ভাবে পারছেন এ সম্পদকে ব্যবহার করে এর অপচয় ঘটানো ছাড়া এ যাবৎ আর কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এটাও জেলাবাসীর হতাশার অন্যতম কারণ। এর বিবরণ তাহলে শোনা যাক।

'সুনামগঞ্জ জেলা একটি অতি প্রাচীন জনপদ। দেশের এক প্রান্তসীমায় ভারতের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে এর অবস্থান। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রকৃতির অফুরন্ত দানে এর অঙ্গের এতরূপ সত্যি অপরূপ। এত প্রাকৃতিক সম্পদের এমন সমাহার অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না। সম্পদগুলোর মধ্যে এ জেলায় রয়েছে দেশের দুটি সিমেন্ট কারখানা। তন্মধ্যে একটি সরকারি (ছাতক সিমেন্ট কারখানা) অপরটি বেসরকারি উদ্যোগে সম্প্রতি নির্মিত (আইনপুর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি)। টেকেরঘাটে রয়েছে মূল্যবান চুনাপাথরের খনি ও উত্তোলণ কেন্দ্র। বেসরকারি উদ্যোগে শত শত চুনা পাথরের চুল্লি (পাজুয়া) ও ইদানীং নির্মিত হয়েছে গ্যাস দ্বারা পুরানো চুনা তৈরির কারখানা। ক্লিংকার ফ্যাক্টরি, টেংরা গ্যাস ফিল্ড (বহুদিন যাবৎ পরিত্যক্ত)। কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা এবং মণ্ড তৈরির উপযোগী কাঁচামাল (নল ও খগড়া) কাঁচ তৈরির উপযোগী বালু, কয়লা, নুড়ি ও বোল্ডার পাথর।' মাছ এখানকার অন্যতম সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে আরো বহুবিদ মুক্তা মানিক যার সন্ধান এ পর্যন্ত করা হয়ে উঠেনি। টেকেরঘাট এলাকায় ইউরোনিয়াম এর মতো মূল্যবান উপাদান নিচে সংরক্ষিত রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেন।

চুন ও সিমেন্ট : ছাতক সিমেন্ট কারখানটি ১৯৪০ সালে স্থাপিত হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এটি পাক-ভারত যৌথ মালিকানায় পরিচালিত হওয়ার পর ৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত থেকে এর

www.pathagar.com

কাঁচামাল চুনাপাথর আসা বন্ধ হয়ে যায়। এর আগ পর্যন্ত ভারত থেকে রজ্জুপথে এ পাথর আনা হতো (এখন আমদানীর মাধ্যমে হয়ে থাকে)। ফলে ছাতক সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এর চিমনী ধূয়ার উদগীরন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিদেশ থেকে এ পাথর আমদানি করা ছাড়া এর পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন সংকটকালে আবিষ্কৃত হয় টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি। নেয়া হলো উদ্যোগ এ পাথর আহরণের। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিটি সচল রাখার জন্য আল্লাহর রহমতে জেলার বাইরে যেতে হলো না। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এ খনিতে পাথর ৫০ বৎসরের চাহিদা পূরণে সক্ষম। আজো চলছে এ খনি থেকে চুনাপাথর আহরণ। তাদের ধারণা বৃথা হয়ে যায়নি। চুনাপাথর উত্তোলন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই এ থেকে আহরণ কাজ শুরু হয়েছিল। এর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন এ খনির আবিষ্কর্তা ড. এফ.এইচ. খান। এ খনিতে মওজুদ চুনাপাথর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আরো একটি সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেটি হলো এই চুনাপাথর এক ধরণের ক্যালসিয়াম। সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় জীবাশ্ম এখানে জমাট বেধে মাটির টিবির গড়ে তোলে। আর এর নিচে সঞ্চিত জীবাশ্ম প্রাকৃতিক কারণে এর ভূগর্ভস্থ উত্তাপে জমাট বেধেই বিশাল চুনাপাথর স্তরের সৃষ্টি হয়। ফলে এটাও অত্যন্ত পরিষ্কার এ অঞ্চলটি আগে নিশ্চয়ই সমুদ্রগর্ভ বা তার অংশ ছিল। যা কালিদহ সাগর নামে পরিচয় করা সম্ভব হয়েছে। যার বুক চিরে এক কালে সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর বাণিজ্য করে বেড়াত।

কাচ তৈরির বালু : এটা সর্বজন স্বীকৃত সুনামগঞ্জ প্রাপ্ত বালু যার বৈজ্ঞানিক নাম সিলিকন বা সিলিকা। এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। কাচ তৈরিসহ বহুবিধ কাজের জন্য। অথচ এগুলোকে গর্ত ভরাট, ভিটিতে দেওয়ার কাজসহ অনাদর অবহেলায় নষ্ট করা হচ্ছে। এ বালু দ্বারা ইট তৈরিসহ চশমার লেন্স তৈরির কাজে ও কাচের তৈজশ নির্মাণে সহজে ব্যবহার করা সম্ভব। উদ্যোগ নেয়া হলে এখানে গড়ে উঠা সম্ভব শত শত কল কারখানা এখানকার বালু নির্ভরে। এখানকার বালু 'গ্লাস সেন্ড' বলে দীর্ঘ দিন আগে প্রমাণিত হয়েছিল।

টেংরাগ্যাস ফিল্ড : পঞ্চাশের দশকে আবিষ্কৃত দোয়ারাবাজারের টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড এখন মানুষের আকর্ষণের অন্যতম ক্ষেত্র। এ গ্যাস ফিল্ড থেকে আহরিত গ্যাস দ্বারা দীর্ঘকাল ছাতক সিমেন্ট ও পরে মণ্ড কারখানায় ব্যবহার করে সাশ্রয় করা হয়েছিল মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। তৈরি হয়েছিল কোটি কোটি টাকার সিমেন্ট ও মণ্ড।

বাঁশ ও বেত শিল্প : সুনামগঞ্জের বাঁশ ও বেত শিল্পের সুনামগঞ্জ এখন এককালের কথার মতো। যা আজ অতীত স্মৃতি হতে পেরে গৌরব অনুভব করছে। সুনামগঞ্জ জেলার প্রচুর বাঁশ ও মূল্যবান বেত ও মুর্তা নামক গাছ দ্বারা, আসবাবপত্র, শীতলপাটি, চেয়ার, টেবিল, ঝুড়ি, ওয়েস্ট পেপার বক্স, খেলনা, বিদেশে প্রেরণ উপযোগী দ্রব্য তৈরি সম্ভব। অথচ এখন এগুলো গৃহস্থালি কাজ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই ব্যবহার করার সুযোগ নেই। এখানে নেই কোন শিল্প উদ্যোগ। যা দ্বারা কুটির শিল্প কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব। এভাবেই আমাদের মূল্যবান বাঁশ ও বেতের অপচয় হচ্ছে। অথচ এ দ্বারা স্থাপিত শিল্প এ অঞ্চলে সমৃদ্ধি আনতে পারতো।

নুড়ি ও বোল্ডার : সুনামগঞ্জের নুড়ি ও বোল্ডার দ্বারা ক্লিংকার কারখানা গড়ে তোলা কোনো পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। এ সমস্ত কারখানায় বিদ্যুতের খুঁটি, ব্লক (নদীর পাড়

www.pathagar.com

রক্ষার জন্য ব্যবহৃত) রেলের শ্লিপারসহ অনেক কিছুই তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু উদ্যোগের অভাবে এ সম্পদের এভাবেই অপচয় হচ্ছে প্রতি নিয়ত।

মণিপুরি বস্ত্র : সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মণিপুরি সম্প্রদায়ের বাস। তাদের মেয়েদের হাতে তৈরি চাদর, শাল, নিত্যব্যবহার্য কাপড় ও অন্যান্য তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেলেও এগুলোকে শিল্প পণ্য হিসাবে গড়ে তোলো সম্ভব হয়নি।

মুক্তা : সুনামগঞ্জের হাওর বিলে যে ঝিনুক পাওয়া যায় তাতে মূল্যবান মুক্তা জন্মে থাকে। একটা মুক্তার দাম ৩০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ মুক্তা গ্রহরত্ন হিসাবে হর হামেশাই ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ দ্বারা স্বর্ণালঙ্কার মহিলাদের খুবই পছন্দ। এ রত্নরাজির বিদেশেও চাহিদা প্রচুর। এ ঝিনুক থেকে এভাবে প্রাপ্ত মুক্তাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় সুক্তি। এগুলোর সাথে যথাযথ আহরণ ও ঝিনুক পালন পরিকল্পিত উপায়ে করা সম্ভব। এ দ্বারাও গড়ে উঠতে পারে স্থানীয় কারুশিল্প ও স্বর্নালঙ্কার শিল্প। একথা ভেবে দেখার সময় আর কবে হবে।

কয়লা : সুনামগঞ্জের টেকেরঘাট অঞ্চলে প্রচুর কয়লা মওজুদ রয়েছে বলে ভূতত্ত্ববিদরা দীর্ঘকাল আগেই অভিমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এ যাবৎ এ কয়লা আবিষ্কারের কোন সফল উদ্যোগ, এমনকি ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষাও করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া শাল্লা, জামালগঞ্জ, বিশ্বাম্ভরপুর ও দোয়ারাবাজারে প্রাপ্ত মাটিকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। এগুলো মূল্যবান জ্বালানি। অনুমান করা হয় এগুলো কয়লা জাতীয় মাটির উপাদান। ফলে ভূগর্বে কয়লা থাকার সম্ভবনা উজ্জ্বল।

মাছ : সুনামগঞ্জের মাছ সুদূর ঢাকার বাজারসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে চালান করা হয়। শীত মৌসুমে বার্জে বোঝাই করে। সুনামগঞ্জের হাওর, নদী, নালা, খাল-বিলে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হয়। এ সমস্ত স্থান সরকারি মূল্যবান সয়রাতমহাল বা জলমহাল। এ খাত থেকে সরকার বার্ষিক ৪ কোটি টাকার মতো শুধু রাজস্ব আদায় করে থাকেন। এ জেলায় এ ধরনের জলমহালের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। এ মাছ এবং মাছ থেকে তৈরি শুটকি মূল্যবান খাদ্য। যা জেলার আমিষের চাহিদা পূরণ করে সমগ্র দেশের একদশমাংশ চাহিদা পূরণে সক্ষম। মাছ ভিত্তিক কলকারখানার এ জেলায় নেই বললেই চলে। অথচ এ ব্যাপারে উদ্যোগ গৃহীত হলেই এখানে শত শত ফিস প্রসেসিং সেন্টার গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে মাছের মূল্য যেমন বাড়বে তেমনি স্থানীয়ভাবে বহু লোকের শ্রম বিনিয়োগ সম্ভব হবে। উল্লেখ্য এ জেলায় গ্রামের লক্ষ লক্ষ লোক বর্ষা ছয় মাস বেকার বসে থাকে। প্রসেস্ত ফিসসহ তাজা বরফ দেয়া মাছ বিদেশেও চালান করা অতি সহজ যেমন হবিগঞ্জের আজমীরিগঞ্জে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার উপাদান এ জেলা থেকেই মূলত সংগৃহীত হয়ে থাকে।

পাখি সম্পদ : বাংলাদেশের এক প্রান্তসীমায় অবস্থিত সুনামগঞ্জ জেলা। সুনামগঞ্জের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা সুবিদিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদময়ী সুনামগঞ্জের বিরাট বিরাট হাওর অঞ্চলে শীত নামার সাথে সাথে ঘটে রংবেরংগের অতিথি পাখির সমারোহ। পাখি শিকারের জন্য অতীতে এ অঞ্চলের খুব নামডাক ছিল। এখন অবশ্য আইনত নিষিদ্ধ। আকাশ কালো করে হাজার হাজার মাইলের আকাশ পথ পাড়ি দিয়ে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে এ অঞ্চলে ঝাকে ঝাকে পাখি আসতে থাকে। তারপর এখানে প্রায় পাঁচ মাস বসবাসও বংশ বিস্তার ঘটে

www.pathagar.com

এ সমস্ত পাখিকুলের। পাখিদের পাখা ঝাপটার শব্দে হাওর পারের গ্রামবাসীদের ঘুম ভেঙে যেত। ঘুম হতো না শিকারীদের। পাখি শিকার এককালের সখের বিষয়। আজ শুধু অতীত ও মুখরোচক আলোচনার বিষয়। শিকারের নেশা এখনও গ্রামবাসীর কাটেনি। যদিও আইন করে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে হাওয়ার ঠাণ্ডা পানিতে মাথায় শেওলা পেঁচিয়ে ভেসে ভেসে নল উচিয়ে চলা শিকারীদের দল বিশাল হাওরের জলতরঙ্গের ঢেউ তুলতো। তা সত্যি দেখার মতো। জলজ দংশন, কাঁটা বিদ্ধ করা শেওলা (সিংরা) উপেক্ষা করা শিকারীরা আজ একথা চিন্তাও করতে পারে না। এছাড়া শিকারের জন্য বাইরে থেকেও সৌখিন মানুষের ভিড় শীত মৌসুমে কম হতো না। পাখি শিকারীদের মূল আকর্ষণ ছিল এত বিরাট সমারোহ পাখির শিকার আর কোথাও সম্ভব না। এক গুলিতে শত শত পাখি মারার রেকর্ডকে না গড়ে চায় অনায়াসে। গুলি ছাড়াও পাখি ধরা সম্ভবপর হতো। অনেক সময় শিকারের ভয়ে পানিতে ঘাপটি মারা পাখি যায় কোথায়? সে সমস্ত আনন্দ স্মৃতি আজ অনেকট রূপকথার মতো।

সুনামগঞ্জের পানিতে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়ান অঞ্চলের অতিথি পাখি আসতো। এ সমস্ত পাখিরা গরম সহ্য করতে পারে না। এরা গরম পড়লে দেশত্যাগ করত। এখানে গরম শুরু হলে আবার মূল নিশানায় বিনা দূরবীনে, বিনা কম্পাসে, আকাশ পথ চিনে ওরা ঠিক পৌছে যেত তাদের মূল আবাস স্থলে। এও এক মজার ঘটনা।

প্রাণিবিজ্ঞান এ সমস্ত পাখিদের যে নামেই পরিচয় করা হোক না কেন স্থানীয়ভাবে এ সমস্ত পাখিদের নাম খুব সুন্দর। এক এক প্রজাতিকে ডাকা হতো একেক নামে। যেমন পাতিহাঁস, রাজহাঁস, বালিহাঁস, লেঞ্জা, পেড়পেড়ি, চেরচেরি, মৌলভী (লাল রংগের চুট থাকার জন্য) ফরালী, বক আরো কত নামে। এ সমস্ত বুনোহাঁস ছাড়াও নানা প্রজাতীর পাখি রয়েছে এ অঞ্চলে। প্রাণিবিজ্ঞানীদের মতে অনেক বিশেষ বিলুপ্ত প্রজাতিরও বাস এ জেলায় আছে। এ পাখিকূল নিধন বন্ধের জন্য তৈরি হয়েছে সরকারি আইন। তা পুরোপুরিভাবে পালিত সর্বত্র হয় না। চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি। আইন ফাঁকি দিয়ে শিকার চলে থাকে। নইলে এত পাখি আসে কোথা থেকে। যা বাজারে গোপনে বিক্রি হয়। স্থানভেদে প্রকাশ্যেও।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান একবার সুনামগঞ্জে পাখি শিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যথা ইচ্ছা তথা কাজ। সুনামগঞ্জের অদূরে পাগলায় তার আগমণের ব্যবস্থা করা হলো। বহু টাকা খরচ করে পাগলাস্থ আর এন্ড এইচ এর ইন্সপেকসন বাংলো মেরামত করা হলো। সাজানো হলো টিপ টপ। রাত্রি যাপনের জন্য শিয়াল কোটের গরম কম্বল আনা হলো। এত সমারোহ করে প্রমোদ তরীতে করে দেখার হাওরে পাখি মারার স্থানে পাহাড়া বসানো হলো। হাওরে যাতে কেউ পাখি না মারে। তারপর এত আয়োজন বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। পাখি বিহীন পাখি শিকারের নামে। পাখিদের সাথে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হল। পাখিকের ধরে এনে পানিতে পায়ে সুতা বেঁধে ছেড়ে দেয়া হল। যাতে ওরা উড়তে না পারে। এভাবেই শেষ মেস আইয়ুব খান পাখি নাশ করে ফিরে গেলেন।

পাখি সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ কমিটির আহ্বানে (১৯৬৬-৬৭) সালে সুনামগঞ্জের প্রাক্তন মহকুমা প্রশাসক জনাব এ জেড এম শামসুল আলম এক ব্যবস্থা নিলেন। তাহিরপুর থানার 'বেরবেড়িয়া' বিলাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল 'শাহজালাল পক্ষী নিবাস' (পাখিদের অভয়াশ্রম)। হযরত শাহজালাল (রহ.) পাখি ভালোবাসতেন। তার প্রিয় জালালী

www.pathagar.com

কবুতরের কাহিনি সবাই জানেন। এখনও অনেকে সুরমা রঙের কবুতর খায় না হযরত শাহজালালের কথা স্মরণ করে। এ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে তৎকালীন সময়ে ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত অভয়াশ্রম গড়ে উঠে। ব্যয়ভার বহন করে তদানিন্তন সিলেট জেলা পরিষদ। এতে অবস্থায় উন্নতিও হয়েছিল। পাখি মারা ঐ অঞ্চলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে পাখিরা অভয় পেয়ে লোকালয় পর্যন্ত আসতো। পাঁচ ছয় হাত দূরেও পাখি চলে আসতো। স্পিড বোট বা নৌকায় নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার মতো ছিল। এ পক্ষী নিবাসের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এখানে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা। এরপর এ আয়োজন পৃষ্ঠাপোষকতার অভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। এরপর এ যাবৎ এ ধরনের আর কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।

সুনামগঞ্জের মাছ : কথায় আছে, 'মাছ, পানি আর ধান, এই তিনে সুনামগঞ্জ সম্মান।' মাছের দেশ সুনামগঞ্জ। পানির দেশ সুনামগঞ্জ। ধানের দেশও এই সুনামগঞ্জ। আর এ তিনটি জিনিসই হয় পানির দ্বারা, পানিতে, আর পানির সংরক্ষণাগার 'হাওরে'। ফলে, পানির অপর নাম যে জীবন তা আর কেউ মানুক আর নাই মানুক, সুনামগঞ্জবাসীর জীবনে তা অক্ষরে সত্য। শ্রী অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি লিখিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তক সূত্রে জানা যা 'আতুয়া' জাতুয়া ও পাগল' এই তিন জেলে মাছের জানে সুনামগঞ্জ এসে বসতি গড়ে। এদের জন সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তারা নিজেরাই মৎস্য ধরার জন্য তাদের সীমানা নিশ্চিত করে নেয়। আর সে কারণে তাদের নামানুসারে পরিবর্তিতে পরগনাসমূহের নামকরণ করা হয়। তাঁর তথ্য কতটুকু সত্য সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা বোধ হয় এ বিষয়ে একমত হতে পারি যে সুনামগঞ্জে তাদের আকর্ষণ ছিল মাছ আহরণ। অর্থাৎ প্রাক ঐতিহাসিক সময় কাল থেকেই এ জেলায় মাছের উৎপাদন ছিল 'ঈর্ষণী রকমের বেশি'। এ কারণ এখন পুরোপুরি ভাবে অনুপস্থিত বলা চলে না। জেলার বাইরে এখনো মাছের জন্য সুনামগঞ্জের সুনাম রয়েছে। বাইরে থেকে মেহমান এলে মাংসের চাইতে মাছের আপ্যায়নেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি। আসলে মিঠা পানির টাটকা মাছ এর জন্য এখনো সুনামগঞ্জের প্রতি টান বাইরের জনসাধারণের রয়েছে।

মাছের দেশ সুনামগঞ্জ জেলায় এ থেকে রাজস্বও বেশি আদায় হয়ে থাকে। সুনামগঞ্জ জেলায় জলমহাল এর সংখ্যা প্রায় ১৩১৮টি। এর মাঝে রয়েছে ৫২টি ছোট বড় হাওর ১২০০টি ছোট বড় বিল, এ ছাড়া আছে নদী, খাল, নালা প্রভৃতি। এ সবগুলোতেই মাছ উৎপন্ন হয়। জলমহালগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলে উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলমহাল উন্মুক্ত জলমহালগুলো হলো নদী, খাল ও নানা জাতীয় জলমহাল। এগুলোতে সন সন মাছ ধরা হয়ে থাকে। আর বদ্ধ জলমহালগুলোকে 'পাইল' জলমহাল বলা হয়। পাইল জলমহালের নিয়ম হলো ১ম বছরে মাছ চাষের জন্য দল, কাঠা ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষ করা, (বংশ বিস্তার করানো), ২য় বছরে মাছ সংরক্ষণ করা এবং ৩য় বছরের শেষে মাছ ধরা। তিন বছরের এক পাইল হয়ে থাকে। মাছ ধরার মৌসুম শুরু হয় সাধারণত পানি কমার মুহূর্তে অর্থাৎ পৌষ মাস থেকে আর শেষ হয় ফাল্গুন চৈত্র মাসে।

সুনামগঞ্জ থেকে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন মাছ, নৌকা, ট্রাক, লঞ্চ, কার্গো দ্বারা সিলেট, মোহনগঞ্জ এবং ঢাকার বাজারে পৌঁছানো হয়। মাছ চাষ ও এর ব্যবসার সাথে আগে সাধারণত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাই জড়িত ছিল। এর আর্থিক দিক বিবেচনায় এখন বড় বড় হোমরা চোমরা ব্যক্তিরাও এখন এ ব্যবসা করছেন চুটিয়ে। রাতারাতি স্বচ্ছলতা

www.pathagar.com

একমাত্র এ ব্যবসা দ্বারাই সম্ভব মনে করা হয়ে থাকে। সুনামগঞ্জ জেলায় মাছ চাষ প্রাকৃতিক উপায়েই হয়ে থাকে। মৎস্য বিভাগও পোনা সরাবরাহ করে জলমহালগুলোতে। মাছের বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে মৎস্য আইন রয়েছে। পোনা মাছ ধরা এ আইনে নিষিদ্ধ। এ আইন সর্বত্র পুরোপুরি মেনে চলা হলে এর ফলন আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। তাহিরপুর থানার টাঙ্গুয়ার হাওর এ জেলার সর্ববৃহৎ হাওর। এর আয়তন এত বিশাল যে এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চোখে দেখা যায় না। লঞ্চ দ্বারা এর পাহাড়া কাজ চালিয়ে থাকেন ইজারাদাররা। অন্যান্য বড় হাওরগুলির মধ্যে তাহিরপুর থানার শনির হাওর, মাটিয়ান হাওর, সদর থানার হাওর, খরচার হাওর, জগন্নাথপুর থানার নলুয়ার হাওর দিরাই থানার চেপটির হাওর, শাল্লা থানার ভেড়ামোহনা, ধর্মপাশা থানার কাঞ্জির হাওর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সুনামগঞ্জে উৎপন্ন মাছের মধ্যে পাঙ্গাস, রুই, কাতলা, আইড় প্রভৃতির আকারও স্বাদ বেশি। সুনামগঞ্জের জলাশয়গুলোতে অনেক প্রজাতির মাছ এখন বিলুপ্তির পথে তন্মধ্যে বাঘা আইড়, নানিন্দ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুনামগঞ্জে লক্ষ লক্ষ টন মাছ উৎপন্ন হলেও এগুলো স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়া জাতের কোনো সুবন্দোবস্ত নেই। শহরের ওয়েজখালীতে এজেলার একমাত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। মাছ প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা হলে বহুগুণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হতো। পাশাপাশি এতে বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হতো।

বোর ধান : সুনামগঞ্জের বোরো ধান এ জেলার একমাত্র ফসল বললেও অত্যুক্তি হবে না। অন্যান্য ধানের ফসল এখানে হলেও বোরোই প্রধান। আর বোরো ধান এ জেলার উদ্বৃত্ত ফসল। এ জেলায় উৎপাদিত বোরো ধান জেলার বাসিন্দাদের সারা বছরের চাহিদা মিটিয়ে আরো অন্তত ১০টি জেলার সারা বছরের চালের চাহিদা মেটানো হয়ে থাকে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বোরো ধানের রাতা টেপির চাউলের ভাত অত্যন্ত সাদা ধবধবে ও সুঘ্রাণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাইরে অনেকে একে পোলাও ভেবে বসে থাকেন। বোরো ফলন সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। ধান ফলে হাওরের বুকে। হাওরগুলো হাতের তালু বা থালা আকৃতির। পৌষ মাসে এর চাষ শুরু হয়। আর বৈশাখ মাসে এটি কাটা হয়। হাওরের পানি তখন তাকে তলানিতে। বর্ষা আসার আগেই এর কাটা মারা শেষ হয়ে যায়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাহাড়িয়া ঢল বা অগ্রিম বন্যার পদধ্বনি শোনা মাত্র কৃষকের চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়। পানির তোড় ভাসিয়ে নিতে পারে কৃষকের সারা বছরের স্বপ্ন এ চিন্তায় কৃষক তো বটেই অনুপস্থিত মালিক, এক কথায় সবাই থাকেন উদ্বিগ্ন। এছাড়া এ ধান চাষের মৌসুমে বৃষ্টি বাণ হয়ে থাকে। অথচ মধ্যে বৃষ্টি না হলেও এর ভালো ফলন হয় না। এ কারণেও এটি প্রকৃতির উপর পুরোপুর নির্ভরশীল। আবার কাটা মারা শুরুর মুখে বর্ষার আগমন ঘটলে কাটাধান শুকানোর কারণেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে এটি আরেক সংকট। এ কারণে বোরো ফসলটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর মেহেরবানির উপর নির্ভরশীল।

বোরো যেহেতু এ জেলার একমাত্র ফসল এর কোনো বিপর্যয় হলে সারা বছর ধরে চলে এর প্রতিক্রিয়া পরবর্তী ফসল ঘরে না উঠা পর্যন্ত। ফলন ভালো হলে কাটা মারা শেষে শুকিয়ে ঘরে তোলার পরে চলে অপার আনন্দ আর পাওয়া যায় প্রচুর অবসর। শুরু হয় বর্ষা। চলে নাইওরি আনার ধুম। আর ফুর্তি আনন্দের সকল সুযোগ হয় অবারিত। নৌকার বাইচ, কুস্তিখেলা, লাঠিখেলা তো আছেই। বোরো ফসলের সাথে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ওতপ্রোত

www.pathagar.com

ভাবে জড়িত। তবে প্রকৃতি বিরূপ হলে এর বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে। বোরো ধান যেহেতু এ অঞ্চলের উদ্বৃত ফসল এবং এটি প্রকৃতির ছোবল থেকে তাড়া হুড়ো করে তোলে আনতে হয়। তাই এর কাটার মৌসুমে সুনামগঞ্জে ব্যাপক বাড়তি জনশক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ জন্য আগে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন আসতো ভাগের বিনিময়ে ধান কাটার জন্য। এদেরকে বলা হতো 'ভাগালু'। এখন এর পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর কারণ ফসলের অনিশ্চয়তা ও অন্যান্য অঞ্চলের সচ্ছলতা বলে বোধ করা হয়।

ধান কাটার পর 'কমলা'রা দিনরাত ফূর্তি করে থাকে। তারা মালিকের ধান কেটে নিজের ভাগ নিয়ে যাওয়ার সময় ধান ছাড়াও ধুতি, চাদর, লুঙ্গি, খাসি ইত্যাদি কেউ কেউ উপঢৌকন পেয়ে থাকে। যাওয়ার সময় নায়ের আগায় এগুলো প্রদর্শিত হয় গৌরবের চিহ্ন হিসাবে। কোনো কোনো বড় গৃহস্থ ১০ থেকে ২০ হাজার মণ ধান একা পেয়ে থাকেন। চালের বাজার যায় পড়ে। ক্রেতারাও হন খুশি। বোরো ফলনটা এমন সময় আসে যখন দেশে আমনের টানাটানি চলতে থাকে। ফলে এ ফসলের প্রভাব জাতীয়ভাবে পড়ে থাকে। অকাল বন্যা, পোকার আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিরোধে করা হলে বোর ও বর্তমানে আবিষ্কৃত উচ্চ ফলনশীল জাতে ধান ১০০% ভাগ উঠানো সম্ভব হলে, সুনামগঞ্জের ধান সারা দেশের তিন মাসের চাহিদা মেটাতে সক্ষম বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ফলফলাদি : সুনামগঞ্জে কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, আতাফল, তরমুজসহ নানা ধরনের ফল বাণিজ্যিকভাবে উৎপন্ন করা হয়। অতীতে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার ছোট ছোট টিলাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আনারস চাষ হলেও এখন তা হয় না বললেই চলে।

তরিতরকারি : সুনামগঞ্জ তরিতরকারি এবং সবজির জন্য খুবই বিখ্যাত একটি অঞ্চল। এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে বাণিজ্যিক কিংবা সৌখিনভাবে সবজি উৎপন্ন করা হয় না। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার রংগারচর ইউনিয়ন, শাল্লা উপজেলার ভেড়াডহর গ্রামসহ নানা দোয়ারাবাজার, ছাতক, দিরাই উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষ করা হয়ে থাকে। জেলার চাহিদা পূরণ করে সেসব সবজি বাইরেও রপ্তানি করা হচ্ছে।

১৪. সাংস্কৃতিক তথ্যাবলি

সুনামগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। মরমি কবি দেওয়ান হাসন রাজার গান সারা উপমহাদেশে সুপ্রচলিত। এর নিজস্ব মেজাজ, সুর, তাল ও লয়ে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এটি আলাদা সংগীতের মর্যাদা লাভের যোগ্য। মরমি কবি হাসন রাজার মরমি চিন্তাধারা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। তিনি সর্বভারতীয় দর্শন সম্মেলনে হাসন রাজার গানের উল্লেখ করেছিলেন। হাসন রাজার গানকে সর্বপ্রথম জন সাধারণ্যে প্রকাশ করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত পল্লি গায়ক পরলোকগত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, তিনিও এ জেলার সন্তান। তার বাড়ি জামালগঞ্জের বেহেলী গ্রামে। এর পাশাপাশি রাধারমন দত্তের গান বৈষ্ণব প্রভাব বলয়ে এক নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার আকর্ষণকে তিনি নতুন ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন। তার লেখা অতি সুপ্রসিদ্ধ। 'ধামাইল গান' এ এলাকার একটি অতিপ্রিয় গান।

www.pathagar.com

বলা হয়ে থাকে, এ গান রাধারমণের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়াত বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম এবং দুর্বিন শাহের বাউল গান ইতোমধ্যে সারাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁদের গানের রয়েছে বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি।

এছাড়া শের আলী শাহ, সৈয়দ শাহনুর, হুছন আলম, করিম বকস, ক্বারী আমীর উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন আহমদ প্রমুখের লেখা গান এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। নদীনদের মাঝে শফিকুন্নুর অতি প্রাচীন গানের সুরকে নিজস্ব স্টাইলে 'বিনন্দের গান' নামে গেয়ে অতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। দেশের গানে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন মনিরুজ্জামান মনির। তিনি একাধিকবার শ্রেষ্ঠ গীতিকারের মর্যাদার সম্মানের পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া এ অঞ্চলের জারি, সারি, ভাটিয়ালি, বাউল, ধামাইল গানের পাশাপাশি আঞ্চলিক বিয়ের গান সারা দেশে নেতৃত্বের দাবি রাখে।

উল্লেখযোগ্য অভিনয় শিল্পীর নাম : মোহাম্মদ আব্দুল হাই, ব্রহ্মানন্দ দাশ, সুনুমিয়া, রমনী মোহন দাশ, লালা শরদিন্দু দে, বিপিন পাল, ক্ষীরোদ শর্মা, বারীন দত্ত, শাহ নুরুল গনি, গনেশ প্রদাস বসু, মনোরঞ্জন কর্মকার, তরনী কান্ত দে, বিজয় আচার্য, দেওয়ান মহসীন রাজা চৌধুরী, ফারুক চৌধুরী, আশরাফ আলী, মাখন ভট, বজু দাশ, মনির মিয়া, মনোরঞ্জন চৌধুরী, সোহরাব মিয়া, টুনু মিয়া, ছাদির উদ্দিন আহমদ, তৈমুর হোসেন, ভানুশ্যাম, অমিয়েশ চক্রাবর্তী, ধূর্জটি বসু, এজহার মিয়া, ধীরেন সেন, আ.ত.ম. সালেহ, বজলুল মজিদ খসরু, শাহ আবু তাহের, ওয়াফিকুর রহমান, মনোয়ার বখত নেক, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, বজলুল হক, ডিয়ার চন্দন, অংশুমান দাশ, দিগ্বিজয় শর্মা চৌধুরী, আব্দুর রব, রওনক বক্ত, ইসুফ আলী, আব্দুল লতিফ, সান্তনু চৌধুরী, গোস্ট আচার্য ও তুহিন।

সংগীতসাধক, শিল্পী, গীতিকার : হাসন রাজা, দুর্বিন শাহ, রাধারমন দত্ত, উপমহাদেশের প্রখ্যাত গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী, রওশন আরা মুস্তাফিজ, কালা শাহ, ইদন শাহ, সৈয়দ শাহনুর, উজির মিয়া, রামকানাই দাশ, আব্দুল লতিফ, রত্না চক্রবর্তী, রূপালী চৌধুরী, শফিকুন্নুর, দেওয়ান জাফরান রাজা, ফটিক চন্দ, এমরান আলী, দেওয়ান মহসীন রাজা, নিলুফার ইয়াসমীন, শাহ আবদুল করিম, ক্বারী আমির উদ্দিন, আকবর নূর, সুরুজ মিয়া, পেশওয়ার, নুরুল ইসলাম, বুধন মিয়া, রমিজ উদ্দিন, রুহি ঠাকুর, রনেশ ঠাকুর, বশির উদ্দিন সরকার, আলম শাহ প্রমুখ।

লোকজসংস্কৃতির ধারা : সুনামগঞ্জে লোকসংস্কৃতির ধারার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। 'ধামাইল গান' ও 'গাজির গীত' শীর্ষক কিছু গানের ধারা এতদাঞ্চলে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য নিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া জেলায় সারি গান, বিয়ের গান, কীর্তন, জারি, সূর্যব্রত সংগীতের ধারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে প্রতিবছর চৈত্র মাসে পনাতীর্থে মেলা, প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার দিরাই উপজেলার ধল গ্রামে ধলমেলা, প্রতি বছর চৈত্র মাসের প্রথম রোব ও সোমবার শাল্লা উপজেলায় বাহাড়া গ্রামের পাশে সোমেশ্বরী মেলা উল্লেখযোগ্য। এসব ছাড়াও বৈশাখী মেলা, ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে একুশে মেলা, বিজয় দিবসে বিজয় মেলাও হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১৫. রাজনৈতিক ও গুণী ব্যক্তিত্ব

ফজলুল হক সেলবর্ষী (১৮৯৩-১৯৬৮) : ১৮৯৩ সালে সাংবাদিকতায় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ফজলুল হক সেলবর্ষী সুনামগঞ্জের সেলবর্ষী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মৌলভী মোহাম্মদ জাহান আলী। ছাত্র জীবন থেকে তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক ছিলেন। ১৯১৫ সালে মৌলানা আকরাম খাঁ'র সহযোগিতায় তিনি সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'র সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত হন। তিনি আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী এর সম্পাদক ছিলেন। ফজলুল হক 'জ্বিহাদ পার্টি, ছিল মুসলমানদের গোপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতির বাছাই করা তরুণরাই জ্বিহাদ পার্টির সদস্য হতে পারতেন। খিদিরপুরের যোল হাজারী মসজিদ ছিল এর কেন্দ্র। এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে সদস্যগণকে শপথ নিতে হতো। ১৯১৭ সালে সে সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ফজলুল হক কলকাতায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন ভালো বক্তা। তার বক্তৃতা এ কে ফজলুল হকের নামে ছাপা হতে লাগলো। তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। ফজলুল হক তখন নামের শেষে নিজের গ্রামের নাম জুড়ে দিলেন ফজলুল হক সেলবর্ষী। এইভাবে আজ ফজলুল হক সেলবর্ষী নামে পরিচিত। রাজদ্রোহীতার অপরাধে তাকে জেল থেকে দুহালিয়ার জমিদার দেওয়ান আহবাব চৌধুরী পাঁচ হাজার টাকা জামানত দিয়ে তাকে মুক্ত করেন।

ফজলুল হক সেলবর্ষী আনোয়ার পাশার সাথে দেখা করার জন্য স্থল পথে ছদ্মবেশে তুরস্কে রওনা হলেন। তার কর্মকাণ্ডের জন্য সিআইডি পুলিশ সবসময় তাকে অনুসরণ রত। পেশোয়ারের নিকট শবকদর নামক স্থানে তাকে বন্দী করা হয়। আসাম সরকার রাজবন্দী সেলবর্ষীকে কড়া পাহারায় পেশোয়ার থেকে সিলেটে নিয়ে আসে। বিচারে রায়ে সেলবর্ষীর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলের মেয়াদ শেষ হলে সেলবর্ষী ১৯২৯ সালে কলকাতায় ফিরে যান। ১৯২০ সালে তিনি 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। তখন কবি নজরুল ইসলাম, মোজাফ্‌ফর আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। তার অনলবর্ষী লেখনীর জন্য কবি নজরুল ইসলাম তাকে 'ফজলুল তুমি জগলুল' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। ১৯২৪ সালে সেলবর্ষী 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। 'আল-মুসলিম' নামে তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ, আর সম্পাদকীয় ছিল অগ্নিবর্ষী। পত্রিকাটি নিয়মিত তিন বছর চলেছিল। সাপ্তাহিক পত্রিকায় সংগ্রামী প্রচারের সুযোগ সুবিধা সীমিত, তাই তিনি ১৯৩৫ সালে 'তকবীর' নামে একটি দৈনিক সম্পাদনা করেন। ছয়মাস নিয়মিত চলার পর অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪০ সালে সেলবর্ষী 'সাপ্তাহিক মোসলেম'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালে তিনি সিলেট চলে আসেন ও 'যুগভেরী' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে সেলবর্ষী ঢাকা চলে আসেন ও দৈনিক 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। তিনি কিছু কাল দৈনিক 'নাজাত', দৈনিক 'বুনিয়াদ', সাপ্তাহিক 'চাষী' ও মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিস' পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। জ্বিহাদ পার্টির পোগন খাতায় তিনি 'কালাপাহাড়' ও 'কংগ্রেসী মওলানা' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য কর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'শহিদে আজম' নামে তার গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তা'ছাড়া 'দর্শন', মাসিক 'মোহাম্মদী', 'সওগাত',

www.pathagar.com

'মোসলেম ভারত' ও 'আল-ইসলাহ' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রায়ই লিখতেন। সাংবাদিকতার বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর ১৯৮৬ সালে ফজলুল হক সেলবর্ষী ইন্তেকাল করেন (পূর্বোক্ত, ৪৪৭-৪৪৮)।

অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর সিলেট বিভাগের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সুনামগঞ্জস্থ তেঘরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ। সুনামগঞ্জ জুবিলী হাই স্কুল থেকে ১৯২৫ ফার্সিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পরীক্ষা পাস করেন। ১৯২৭ সালে এমসি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস এবং ১৯৩২ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে ১৯৩৭ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জে মোহাম্মদ চৌধুরী একাডেমিতে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালের ২০ নভেম্বর সুনামগঞ্জ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ও পরে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নরসিংদী কলেজের প্রিন্সিপাল, ১৯৬৫-১৯৬৭ সালের মে পর্যন্ত মতলব কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে আবুজর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ইসলামিক স্টাডিজে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় অধ্যাপক, প্রখ্যাত দার্শনিক, প্রতিযশা লেখক এককালীন সাংবাদিক ও রাজনীতিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আজ শুধু সুনামগঞ্জ কিংবা বৃহত্তর সিলেট জেলারই নন বরং সারাদেশেরই গৌরব। তাঁর সাহিত্য কর্ম অগণিত। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে : 'তমদ্দুনের বিকাশ', 'সত্যের সৈনিক আবুজর', 'ইতিহাসের ধারা' 'নূতন সূর্য', 'ব্যাকগ্রাউন্ড অব দি কালচার অব মুসলিম বেঙ্গল', 'জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম', 'ফিলসফি অব হিস্ট্রি', 'সায়েন্স অ্যান্ড রিবিলেশন', 'ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে', 'ইসলাম ও মানবতাবাদ' প্রভৃতি। বাংলাদেশের সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক মনোনীত করে তাঁর গবেষণামূলক কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, নাসির উদ্দিন পুরস্কার, শ্রী জ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কার, ভাসানী পুরস্কার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুরস্কার, বাংলাদেশ মুসলিম মিশন পুরস্কারসহ প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উপমহাদেশের খ্যাতিনামা এই দার্শনিক ১৯৯৯ সালের ১ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। (পূর্বোক্ত, ৪৬৫)।

অক্ষয় কুমার দাস (১৯০৩-১৯৯০) : ১৯০৩ সালে দিরাই থানার সরমঙ্গল ইউনিয়নের চিতলিয়া গ্রামে অক্ষর কুমার দাস জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল বাবু কিঙ্করচন্দ্র দাস ও মাতা শ্রীমতি অষ্টমী দাস। ১৯১৬ সালে অক্ষয় কুমার মাইনর পরীক্ষা পাশ করে সুনামগঞ্জ জুবিলী স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ১৯২০ সালে উক্ত স্কুল থেকে বৃত্তিসহ মেট্রিক পাশ করেন। ১৯২২ সালে সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯২৫ সালে বি.এ পাশ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। অক্ষয় কুমার দাস ১৯২৯ সালে সুনামগঞ্জ বারে যোগ দেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন।

www.pathagar.com

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

অক্ষয় কুমার দাস

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

আব্দুস সামাদ আজাদ

www.pathagar.com

১৯৩৪ সালে বাবু অক্ষয় কুমার দাস সুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে অক্ষয় কুমার দাস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিরাই নির্বাচনী এলাকা থেকে আসাম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৯৩৮ সালে স্যার মোহাম্মদ সাদউল্লাহ এর নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আইন ও শ্রম মন্ত্রী হিসেবে কেবিনেটে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস হাইকমান্ড এর নির্দেশে প্রতিটি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার অবলুপ্তি ঘটলে স্যার সাদউল্লাহ পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে কেবিনেটেও অক্ষয় কুমার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে ইলেকশনে অক্ষয় দাস আসামের এমএলএ নির্বাচিত হন। অক্ষয় কুমার পূর্ব পাকিস্তান আমলেও এমএলএ হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে আইআই চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৯ সালে স্যার ফিরোজ খান নূন মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭২-৭৩ সালে বাবু অক্ষয় কুমার দাস সুনামগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের ২৪ জুন সুনামগঞ্জে অক্ষয় কুমার দাস দেহত্যাগ করেন। (পূর্বোক্ত, ৪৬৩)।

মকবুল হোসেন চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৫৭) : উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক মকবুল চৌধুরী তাহিরপুর উপজেলার বিন্নাকুলি গ্রামে ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৯ সালে সুনামগঞ্জ সরকারি জুবিলী হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে সিলেট এম.সি কলেজ এফ.এ ক্লাসে বর্তি হন। ইতিমধ্যে তিনি রাজনীতির সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়ায় পড়াশুনা অসামাপ্ত রেখেই সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন (হোসাইন, ১৯৯৫: ১১৫)। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'খোলাফায়ে রাশেদীন', 'কোরান পরিচয়', 'শেখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ)', 'মোজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহঃ)', 'কোরান শরীফের ইতিহাস', 'জ্ঞান বাণী', 'ইসলামী জীবনাদর্শন ও শাসন নীতি', 'ইন্দো-পাকিস্তানী উপ-মহাদেশে ইসলামী আন্দোলন'। ১৯৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁর ইন্তেকাল হয়। (পূর্বোক্ত, ৯৪)।

ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (১৮৮২-১৯৭২) : ১৯৮২ সালে সুনামগঞ্জের পাইলগাঁও গ্রামের জমিদার বংশে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রসময় চৌধুরী। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে কৃতিত্বের সাথে এমএ পাশ করেন ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি বি এল পরীক্ষা দেন। ১৯০৭ সালে তিনি সিলেট বারে যোগদান করেন। ১৯২০ সালে তিনি সিলেটকে বঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। 'সিলেট বেঙ্গল রি-ইউনিয়ন লীগ' স্থাপন করেন। তাঁর সহকর্মী ছিলেন রায় বাহাদুর গিরিশ চন্দ্র নাগ ও রায় বাহাদুর রমণী মোহন দাস। তিনি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। ১৯২৪ সালে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সুনামগঞ্জে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর উদ্যোগে পাইলগাঁও গ্রামে ব্রজনাথ হাইস্কুল স্থাপিত হয়। তাঁর উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে সিলেট মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি দু'বছর

www.pathagar.com

ঐ কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। সিলেট শহরের চৌহাট্টা এলাকার তাঁর সেসময়ের বাড়িতেই বর্তমান সরকারি মহিলা কলেজ অবস্থিত। তিনি কিছুদিন 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ ছাড়াও তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক। তাঁর রচিত 'পাইলগাঁও ধর বংশাবলী' ও 'স্মৃতি ও প্রতীতি' উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। ১৯৭২ সালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় থাকা অবস্থায় ১৩৭৯ বাংলার ১৪ই ভাদ্র দেহত্যাগ করেন। (হক, ২০০৬: ৪৮৭-৪৮৮)।

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও ফারুক রশীদ চৌধুরী সুনামগঞ্জের দরগাপাশা নিবাসী মরহুম আব্দুল রশীদ চৌধুরী সাহেবের সুযোগ্য সন্তানদের অন্যতম। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগে কূটনীতিক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের মাধ্যমে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় স্বপক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি দেশের রাষ্ট্রদূতও বহু কূটনৈতিক দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। তিনি পৃথিবীর বহুদেশ যথা আমেরিকা সৌদি আরবসহ বহু দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি পররাষ্ট্র সচিব হন। এরপর এইচএম এরশাদ সাহেবের উপদেষ্টা ও তার সরকারের পররাষ্ট মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি জীবনে প্রথমবারের মতো উক্ত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দুটি আসনে এক সাথে নির্বাচিত হন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করে দেশ ও জাতির এক বিরল সম্মান বয়ে এনেছিলেন। (হোসাইন, ১৯৯৫: ২০৫-২০৬)।

আব্দুস সামাদ আজাদ : আব্দুস সামাদ আজাদ ১৯২৫ সালে সুনামগঞ্জ জেলর জগন্নাথপুর উপজেলার অন্তগর্ত ভোরোখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুস সামাদ আজাদ, ছাত্র জীবনে থেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আসছেন। ১৯৪৪-৪৭ সালে সময়ে তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পদের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি এমসি কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রাদেশিক মুসলমনি ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদক ও উক্ত দলের ওয়ারর্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৯-৫০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন মরহুম প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান উক্ত দলের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার হন ও কারবরণ করেন। ১৯৫২-৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে তাঁর আইনে এমএ ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বহিস্কৃত হন, রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার দায়ে। ঐ সময়ে তিনি যুবলীগের কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫-৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৮ সালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহ-সম্পাদক, দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডে সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন ও ১৯৬২ সালে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। আট মাস কারা ভোগের পর বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ কমিটি তাঁকে মুক্তি দেয়। ১৯৬৭ সালে তিনি এনডিএফ-এর প্রাদেশিক সম্পাদক ও পিডিএম-এর আঞ্চলিক শাখার কোষাধ্যক্ষ ও 'ডাকে'র সদস্য হিসেবে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রবাসী সরকারের দূত হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সংগঠিত করেন। তিনি বোদাফেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন ও বিশ্ব বর্ণবৈষম্য কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন ও যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি সুনামগঞ্জের দু'টি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর তিনি কারারুদ্ধ হন। চার নেতার জেল হত্যার সময় অল্পের জন্য তার প্রাণ রক্ষা পায়। তিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ৫ম সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতার (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসে, তখন তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। প্রয়াত এই নেতার আত্মত্যাগ সুনামগঞ্জের রাজনীতিকে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। (পূর্বোক্ত, ১৭৩-১৭৪)।

সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত : ১৯৭০ সালের নির্বাচন সুনামগঞ্জের দিরাই-শাল্লা নির্বাচনী এলাকা সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের কারণ ছিলেন শ্রী সেন গুপ্ত। তিনি উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সারা দেশব্যাপী সৃষ্ট গণজোয়ারের মুখে এক মাত্র ন্যাপ (মো) প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই গণপরিষদে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য। শ্রী সেন গুপ্ত ১৯৩৯ সালে দিরাই উপজেলার আনোয়ারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হন। ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি ছিলেন উক্ত সংগঠনের জগন্নাথ হল শাখার সভাপতি। ইতিহাসের এম.এ ও আইনের স্নাতক শ্রী সেন গুপ্ত ১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ও গণপরিষদ সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটা ছিল তার জীবনের প্রথম নির্বাচন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি টেকেরঘাট সেক্টরে নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় বারের মতো সংসদ সদস্য হন নবগঠিত অধুনা বিলুপ্ত একতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে। তবে এ নির্বাচন নিয়ে মামলা হলে তাঁর সদস্য পদ বাতিল ঘোষিত হয় ও গোলাম জিলানী চৌধুরী সদস্য গণ্য হন। কিন্তু এর স্বল্প দিনের মধ্যে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালে তিনি ঐক্য জোট প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি চতুর্থ বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এক অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেন। ২০০৮ এর সংসদ নির্বাচনেও তিনি নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালেও

www.pathagar.com

তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। শ্রী সেন গুপ্ত দেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংসদে একজন অভিজ্ঞ সদস্য হিসেবে তাঁর প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একজন সুবক্তা। সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। (পূর্বোক্ত, ১৯০)।

১৬. মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ

১৯৭১ সালে সুনামগঞ্জ জেলা ছিল ৫ নং সেক্টরের অধীনে। এ সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী। সুনামগঞ্জের নেতৃবৃন্দ বালাট, মৈলাম, সেলা, মহেষখাল প্রভৃতি সীমান্ত ফাঁড়ি দিয়ে আশ্রয় শিবিরে একত্রিত হন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য লোক রিক্রোট করতে শুরু করেন। এভাবে ব্যাচ ওয়াইজ ট্রেনিং হতে থাকে। ভারতের তোরা পাহাড় এর অন্যতম। আশ্রয় শিবির পরিচালনা, লোক বাছাই করে ট্রেনিং এ পাঠানো এবং আশ্রয় শিবিরে অবস্থিত শরণার্থীদের কাজে যারা ভূমিকা রাখেন তারা হলেন–আলতাফ উদ্দিন আহমদ, আসদ্দর আলী চৌধুরী, আকমল আলী, আব্দুল বারী, খলিলুর রহমান চৌধুরী, মুহম্মদ আব্দুল হাই, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আফাস উদ্দিন, মতসিন আলী, দেওয়ান কামাল রেজা চৌধুরী, সৈয়দ দেলওয়ার হোসেন, সামরান আলী, নাজির বক্স, আলী ইউনুছ, আব্দুল লতিফ সর্দার, ডা. হারিছ উদ্দিন, হোসেন বখত, মদরিছ চৌধুরী, আকল মিয়া, আব্দুর রহমান উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে যারা ট্রেনিংসহ সক্রিয় অংশ নেন তারা হচ্ছেন– গোলাম রাব্বানী, বজলুল মজীদ চৌধুরী, বরকত আলী, মতিউর রহমান, সাব্বির আহমদ, সুধীর, গৌরাঙ্গ, এবাদুর রহমান, আছদ্দর আলী, শামছুল হক, মালদার আলী, আব্দুল হাসিম, মনোয়ার বখত, শাহজাহান বখত, তালেব উদ্দিন আহমদ, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, সাধন ভদ্র, কাজী বসির উদ্দিন, সেলিম, মানিক কোরেশী, আলী আমজদ, মালেক হোসেন পির, কামাল মিয়া, তারা মিয়া, নওশাদ, জসিম উদ্দিন, আমির হোসেন, বোরহান উদ্দিন, বাচ্চু চৌধুরী, আশ্রব আলী, নবাব মিয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। (হক, ২০০৬: ২২১-২২২)। সুনামগঞ্জ জেলাকে ৫নং সেক্টরের আওতায় চারভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে : ১. ভোলাগঞ্জ : সাব সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন কায়েস চৌধুরী। পরবর্তীতে লে. মো. তাহের উদ্দিন আখঞ্জী অধিনায়কের দায়িত্ব পান। ২. সেলা সাবসেক্টর : ক্যাপ্টেন এ এস হেলাল উদ্দিন। ৩. বালাট সাবসেক্টর : ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন। পরবর্তীতে মেজর এম এ মুত্তালিব দায়িত্ব পান। ৪ টেকেরঘাট সাবসেক্টর : শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। পরবর্তীতে মেজর (অব.) মুসলিম উদ্দিন দায়িত্ব পান। ছাতক আক্রমণের জন্য তৎকালীন কর্নেল জিয়াউর রহমানের নের্তৃত্বাধীন 'জেড ফোর্সের' অধীনস্থ তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন অধিনায়ক মেজর সাফায়াত জামিল ৫নং সেক্টরে বিশেষ অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন।

তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই অংশে ৪টি কোম্পানি ছিল। সেগুলো হলো– ১. আলফা. ২. ব্রাভো। ৩. চার্লি। ৪ ডেল্টা। এই কোম্পানিগুলোর কমান্ডে ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন (পরে রাষ্ট্রদূত), ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, ক্যাপ্টেন মহসীন উদ্দিন আহমদ (মরহুম), লে. নূরুন্নবী খান (মেজর হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত)। এছাড়া আরও যারা এখানে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন তারা হলেন লে. মঞ্জুর (মেজর হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) লে. ফজলে হোসেন (মরহুম)।

www.pathagar.com

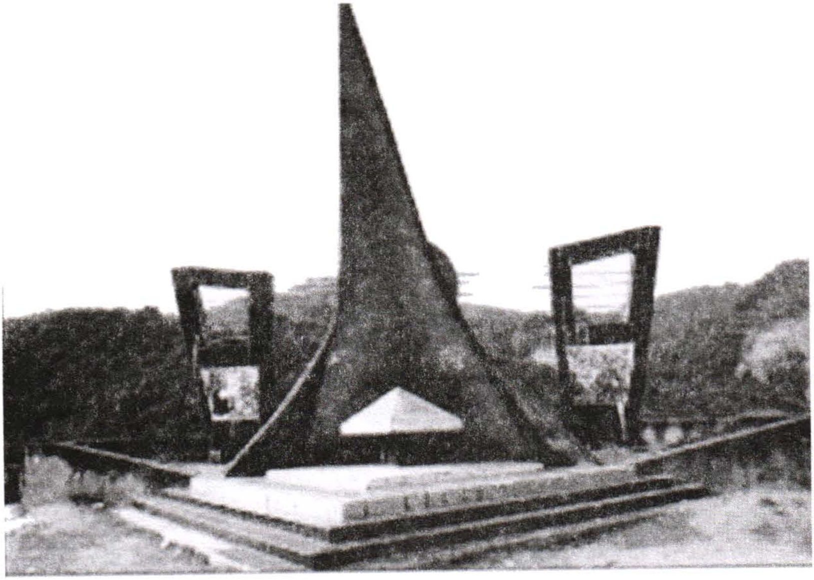

বাঁশতলায় শহিদ স্মৃতিসৌধ

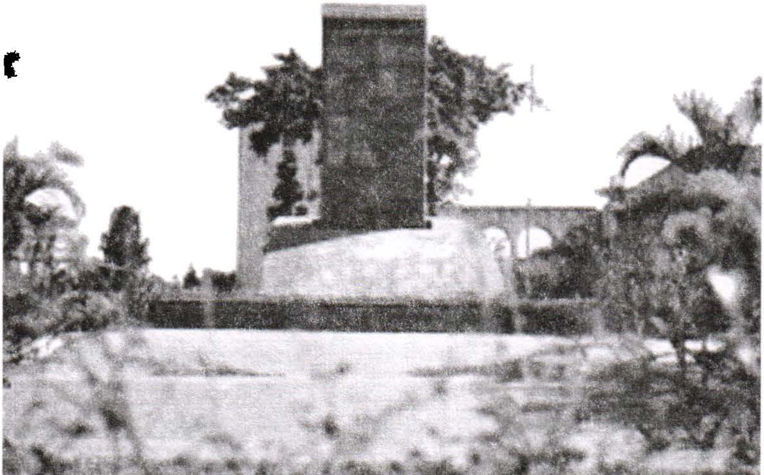

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শহিদ স্মৃতিসৌধ

www.pathagar.com

১৩ অক্টোবর রাতেই সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত নোয়ারাই গ্রাম ও সিমেন্ট কারখানা মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। সেখানে ক্যাপ্টেন আনোয়ার প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলেন। ১৪ অক্টোবর সকালে পাকিস্তানীদের একটি লঞ্চ ছাতক যাচ্ছিল। মুক্তিবাহিনী রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়। ফলে ৯ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। ১৪ রাইফেল মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয় এবং তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। পাকিস্তানী সৈন্যরা সিমেন্ট কারখানা ছেড়ে পালিয়ে ছাতকে চলে যায়। ক্যাপ্টেন আনোয়ারা সিমেন্ট কারখানার ভিতরে ঢুকে পড়েন। ক্যাপ্টেন মহসীন দোয়ারাবাজার আক্রমণের উদ্দেশ্যে সুরমা নদী পার হচ্ছিলেন। দোয়ারাবাজারে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানিদের গুলিবর্ষণের ফলে ক্যাপ্টেন মহসীন ও তার সহযোগী সৈন্যরা নৌকা থেকে মাঝ নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। এর ফলে ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং বহু হতাহত হন। এর দু'দিন পর ক্যাপ্টেন মহসীন ও এই ছত্রভঙ্গ কোম্পানির জীবিত সৈন্যরা চেলায় ফিরে আসেন। গোবিন্দগঞ্জেও অনুরূপভাবে পাকিস্তানিদের প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন নবী ডাউকী সীমান্তের দিকে সরে যান। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের সিলেট থেকে ছাতক এবং দোয়ারাবাজার চলে আসে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার এ কোম্পানির উপরে ১৪ ও ১৫ অক্টোবরে দু'দিন ধরে পাকিস্তান গোলন্দাজ প্রবলভাবে অনবরত গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩০ ফান্ট্রিয়ার ফোর্স ও ফন্টিয়ার ফোর্স কনস্টেবলারি দোয়ারাবাজার থেকে ছাতকে সিমেন্ট কারখানা আক্রমণ করে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির চিন্তা করে মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে থাকেন। পাঁচদিনের ছাতক অপারেশনে ১২ জন নিহত ও প্রায় চার শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়। পঁচিশ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন ও অনেকে গুরুতর আহত হন। (পূর্বোক্ত, ২২২-২২৩)।

মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ জেলায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সেলা সাবসেক্টরের অধীনে অপারেশন দুর্বিনটিলা, আধারটিলা ও পেপারটিলা, টেংরাটিলা। (১৪.০৮.৭১), বালিউর যুদ্ধ, মহব্বতপুর যুদ্ধ, বেতুরার যুদ্ধ, জাউয়া ব্রিজ, ডাবর ফেরি অভিযান, টেবলাই যুদ্ধ ও ছাতক অভিযান; বালাট সাবসেক্টরের অধীনে রাজাবাজার (সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহ), মুসলিমপুর অপারেশন (২০.০৮.৭১), বিরামপুর (২৭.০৭.৭১), কৃষ্ণতলা (২৭.০৮.৭১), ভাদেরটেক (০৯.০৯.৭১), নলুয়া গুজাবিল (২৭.০৯.৭১), বালিউর (১২.১০.৭১),গনিগঞ্জ (০৭.১১.৭১); ভোলাগঞ্জ সাবসেক্টরের অধীনে গৌরীনগর অপারেশন, চানপুর অপারেশন এবং টেকেরঘাট সাবসেক্টরের অধীনে জামালগঞ্জ, তাহিরপুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জগন্নাথপুর থানার সিরামিশ গ্রামে ৩১ আগস্ট ১৯৭১ সালে সকালে ৯-১০টার দিকে পাক হানাদারদের দেশীয় দালালরা পথ দেখিয়ে হানাদার বাহিনীকে এনে স্থানীয় হাইস্কুলে বসিয়ে প্রচার চালায় যে এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য স্কুলে সভা হবে। এ সভাতে অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন। সমবেতদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক, মৌলানা, তহশীল অফিসের কর্মচারী, ইউপি সদস্যরা। সভা থেকে ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী নির্বিশেষে ১২৬ জনকে পিছন দিকে দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায় শহিদ নাজির মিয়ার বাড়ির পুকুর পাড়ে। বিনা অপরাধে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং ২৫০টি বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে ভষ্মিভূত করা হয়। জগন্নাথপুর থানার রাণীগঞ্জ বাজারে রাজাকারদের সাহায্য নিয়ে হানাদার বাহিনী ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ জন নিরীহ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাজারে আগুন দিয়ে ১৫০ টি দোকান ঘর মালামালসহ পুড়িয়ে দেয়। (পূর্বোক্ত,২২৩)।

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ জেলার প্রথম শহিদ হচ্ছেন আবুল হোসেন। তাঁর বাড়ি সদর থানার লালপুর গ্রামে। এ জেলা থেকে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মুক্তিযোদ্ধা মো. ইদ্রিস আলী, মো. আব্দুল মজিদ, মো. আব্দুল হালিম বীর প্রতীক উপাধি লাভ করেন। (পূর্বোক্ত, ২২৪)।

১৭. শিল্পী ও সাহিত্যিক

সুনামগঞ্জ জেলার সাহিত্য সাধনার ইতিহাস এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। এতে রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব ও মুসলিম ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট প্রভাব। সুনামগঞ্জের এ ঐতিহ্য প্রায় পাঁচশ বছরের। এ কারণে এ নিয়ে গর্ব করার মতো ইতিহাস এ জেলায় রয়েছে। সুনামগঞ্জে গীত মহরমের জারিগানে বৌদ্ধদের শূণ্যবাদ ও নির্বাণ সংক্রান্ত ধারাগুলোর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এখানে গীত মহরমের গানে 'নিরঞ্জন' শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। হিন্দুদের মধ্যে নাথ ও যোগী সম্প্রদায়ের লোকের (যাদের পূর্ব পুরুষগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন) সংখ্যা এ অঞ্চলে এখনও নগন্য নয়।

একটি মহরমের গান নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

আগে আল্লাহ নিরঞ্জন
কোথায় তোমার সিংহাসন
শূন্যেতো আছিলাম তুমি
না আছিল কোন জন
এই মহরমের জারিত রইয়াছে
আল্লাহ হায় হায় মাত্তম
ভাই ভাতিজা সারা লইয়া, শিশুগণ
দলে দলে কারবালায় গিয়া
ত্যাজিলা জীবন। (পূর্বোক্ত, ৬৯)

সুনামগঞ্জের সাহিত্যে হিন্দুদের যে বিরাট ও প্রাচীন প্রভাব বিদ্যমান তার কারণ একাধিক। হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত চর্চার ফলে সুনামগঞ্জে একাধিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ রয়েছে। শ্রী চৈতন্যের আর্বিভাবের পর বৃহত্তর সিলেট জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জে বৈষ্ণব মতবাদের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এছাড়া অন্য কারণটি হলো আধুনিক শিক্ষায় হিন্দুদের প্রথম আগমন। সুনামগঞ্জের সাহিত্যে চর্চায় মুসলিম প্রভাব শুরু হয় হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের পর। এর কারণ এতদাঞ্চলে ব্যাপক মুসলিম ধর্মালম্বী সৃষ্টি ও তাদের উপর হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর ৩৬০ সঙ্গীদের এতদাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে সৃষ্ট প্রভাব। এছাড়া ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় সারা বাংলায় যে নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়। তার প্রভাব যতক্ষীণই হোক না কেন তা এখানে সম্প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তীতে হলেও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমান সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ শুরু হলে এ প্রভাব আরো গতিময়তা লাভ করে।

এ কথায় সুনামগঞ্জের সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য চর্চায় ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন ও প্রায় পাঁচশত বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলছে। অতীতের এ সমস্ত ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান ও তাতে প্রাপ্ত ফলাফল উপযুক্ত ভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের তেমন কোনো কার্যকরী উদ্যোগ গৃহীত না হওয়ায় এ সমস্ত মূল্যবান তথ্য বিলীন হতে বসেছে।

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা সাহিত্য চর্চায় বৃহত্তর সিলেটের পথিকৃৎ। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, এ জেলাবাসীরা সর্বমোট সাতটি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন। সুনামগঞ্জবাসীরা ১৫০০ শতাব্দী থেকে শুরু করে এ যাবৎ সংস্কৃত, সিলেটী নাগরী, আরবি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজিসহ নানা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। এ জেলার সাহিত্য সাধনার প্রাচীনতম প্রবাদ পুরুষ হচ্ছেন লাউড়ের সঞ্জয়। (পূর্বোক্ত, ৬৯-৭০)।

সঞ্জয় : সঞ্জয় পঞ্চদশ শতকের কবি। ঐতিহাসিকগণের মতে, কাশিরাম দাশ গৌড়ের পাঠান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাভারত'-এর যে বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাকে বাংলায় প্রথম 'মহাভারত' মনে করা হলেও, লাউড়ের সঞ্জয় তারও আগে আদি 'মহাভারত' বাংলায় রচনা করেছিলেন। এ তথ্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিলম্বে হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী মনিন্দ্র কুমার ঘোষ সঞ্জয়ের পূর্ণাঙ্গ 'মহাভারত' আবিষ্কার করেন, কবি সঞ্জয় ও তাঁর কাজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। 'মহাভারত'-এর প্রথম বাংলা অনুবাদক সঞ্জয় যে, সুনামগঞ্জের লাউড় অধিবাসী ছিলেন তাতে আজ আর কোনো সংশয় নেই। এটিও আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য।

ভেট্টু শাহ : ভেট্টু শাহ বিখ্যাত মারিফতি সাধক কবি সৈয়দ শাহনুরের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁর অনেক গান আজো লোক মুখে শোনা যায়। তাঁর একটি গানের কথা এ রকম : 'দুঃখ কৈমু কোন বাসর/মা অইয়া পুতরে যে করে দুই নজর'। (পূর্বোক্ত, ৮৩)।

হাসন রাজা

রাধারমন

www.pathagar.com

রাধারমণ দত্ত : সাধক রাধারমণ দত্তের বাড়ি জগন্নাথপুর উপজেলার কেশবপুর গ্রামে। তিনি আনুমানিক ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাধামাধব দত্ত একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। এঁরা চক্রপানি বংশীয়। চক্রপানি দত্ত রাজা গৌড়গোবিন্দের রাজবৈদ্য ছিলেন। এ বংশের জনৈক প্রভাকর দত্তের নামানুসারে প্রভাকরপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছিল বলে জানা যায়। এ প্রভাকর দত্তের ছেলে শম্ভুদত্ত জগন্নাথপুরের রাজা বিজয় সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পদবী ছিল দেওয়ান। তাঁর ছেলের নাম কেশব দত্ত। এই কেশব দত্তের নামানুসারে কেশবপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছিল হয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে রাধারমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন, ইটা পরগনার ঢেউ পাশা নিবাসী রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে। এরপর তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর সাধন ভজনের জন্য তিনি নলুয়ার হাওরের নির্জন স্থানে একটি আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভাবে বিভোর হয়ে তিনি গান রচনা করতেন। তাঁর শিষ্যরা সে গান গাইতেন এবং এগুলো লিখে রাখতেন। এভাবেই গানগুলো পরবর্তী সময়ে গীত হতো। ফলে স্বাভাবিক কারণে রাধারমণ দত্তের গানে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে গানের ভণিতাও পরিবর্তন করা হয়েছে। এভাবে রাধারমণ দত্তের গান হারিয়ে যাচ্ছে। ১৯১৬ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। (পূর্বোক্ত, ৭৩ ও ৭৪)।

হাসন রাজা : বাংলা ১২৬১ সনের ৭ই পৌষ সুনামগঞ্জের লক্ষণছিরি গ্রামে মরমি সংগীতের প্রাণপুরুষ হাসন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেওয়ান আলী রেজা ও মাতার নাম বেগম হুরমত জাহান। জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁর শৈশব কাটে অত্যন্ত বিলাসিতার মধ্য দিয়ে। গৃহ শিক্ষকের কাছে তিনি কোরানের সুরা ও ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাসন রাজার বয়স যখন মাত্র পনেরো বৎসর তখন তার পিতা দেওয়ান আলী রেজা পরলোক গমন করেন। কুড়াপাখি, ঘোড়া, হাতি, নৌকা ও মেয়ে মানুষ ছিল তাঁর সখের বস্তু।

হাসন রাজার স্ত্রী মোছাম্মৎ সাজিদা খাতুন ছিলেন ভারতের করিমগঞ্জ জেলার বিখ্যাত জায়গীরদার বংশীয় দেওয়ান গোলাম ইউসুফ সাহেবের কন্যা। তাঁরই গর্ভে হাসন রাজার পুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজা জন্মগ্রহণ করেন। হাসন রাজা তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে গান রচনা করেছেন। মুখে মুখে গান রচনা করে যেতেন, তাঁর কর্মচারীরা তা লিপিবদ্ধ করতেন। 'রাতে খাওয়া-দাওয়া করে তিনি গান রচনা করতেন এবং এ গানে সুর দিয়ে তাঁর গায়িকাদের দ্বারা গাওয়াতেন। নিজ হাতে তিনি ঢোলক তুলে দিতেন। এ ঢোলকের সঙ্গে মন্দিরা বাজাতো সোনাজান নাম্মী এক গায়িকা। পরিচারিকা দিলারামই ছিল গানের মজলিসের পরিচালক। এই গানগুলিই পরবর্তীকালে 'হাছন-উদাস' নামে পুস্তকে ঠাঁই পায়। উল্লেখ্য যে হাসন রাজার বাবা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী মুমেনশাহী জেলার খারীয়াজুরী পরগণার বিখ্যাত ভূঁঞা পরিবারের মজলিশ প্রতাপ সাহেবের বংশে বিবাহ করেন। দেওয়ান আলী রাজা বৈবাহিক সূত্রে অনেক সম্পত্তি লাভ করেন এবং সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী গ্রামে বাড়ি নির্মাণ করেন। রাজা বিজয় সিংহ সর্বপ্রথম যশোর জেলায় এবং পরে সিলেটে জেলায় বিশ্বনাথে আসেন। তিনি তার পূর্ব পুরুষ রামচন্দ্র সিংহ দেবের নামকে স্মরণীয় করার জন্য রামপাশা গ্রামের নামকরণ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ সালে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ও ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে তাঁর হির্বাট লেকচারে হাসন রাজার গানের

www.pathagar.com

উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে হাসন রাজার নিম্নলিখিত গানটি উল্লেখ করেন : "না রহিব ঘরবাড়ি না রইব সংসার/না রহিব লক্ষণছিরি নাম পরগণার/ কান্দিয়া হাসন রাজায় বলে, আল্লা কর সার/কি ভাবিয়া নাচ হাসন শূন্যের মাজার (পূর্বোক্ত)।" ১৯২২ সালে ১ নভেম্বর হাসন রাজা ইন্তেকাল করেন।

শাহেদ আলী : অধ্যাপক শাহেদ আলী একজন ভাষা সৈনিক। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সনের ২৬ শে মে, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানার মামুদপুর গ্রামে। তাঁর পিতা মৌলভি ইসমাইল ও মাতা আয়েশা খাতুন। গ্রামে পাঠশালার পর বৃত্তিসহ মধ্যনগর মাইনর হাইস্কুলে, সেখানে থেকে বৃত্তিসহ সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুলে ভর্তি হন। পরে বৃত্তিসহ এম.সি কলেজে পড়াশুনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ পাস করেন। স্কুল জীবন থেকে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। সুনামগঞ্জে তিনি মুসলিম ছাত্র সংঘের সম্পাদক ছিলেন। সভাপতি ছিলেন মরহুম জনাব আব্দুল বারী চৌধুরী এম.এ এল.এল.বি (পরে এম.এল.এ হন)। একই সময় তিনি মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনেরও সম্পাদক ছিলেন। মুসলিম ছাত্র সংঘের তহবিল গঠনের জন্য তিনি মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন করেন। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গ্রহীত হওয়ার পর তিনি সুনামগঞ্জে নাজাত দিবস সংগঠন করেন। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শাহেদ আলী যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন তখনই তার প্রথম গল্প 'অশ্রু' মাসিক 'সওগাত' ছাপা হয়। তারপর 'সওগাত', 'মোহাম্মদী'সহ অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ নিয়মিত ছাপা হতে থাকে। (হোসাইন, ১৯৯৫: ১২৯)।

স্কুল জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। শাহেদ আলীর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জিবরাইলের ডানা' ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হলে সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ গল্পগ্রন্থের বহু গল্প বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'একই সমতলে' বইটিও ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত। ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমি তাঁকে সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৮৯ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। প্রখ্যাত এই কথাসাহিত্যিক শাহেদ আলী ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (পূর্বোক্ত, ৯৫-৯৬)।

শাহ আবদুল করিম : শাহ আবদুল করিম গণসংগীত, লোকসংগীত এবং বাউল গানের জনপ্রিয়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ধল গ্রামের ধলআশ্রম পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইব্রাহীম আলী এবং মাতার নাম নাইওরজান বিবি। পিতামাতার ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড় এবং একমাত্র পুত্র সন্তান। তাঁর পিতামহের ছোট ভাই নসিব উল্লাহের প্রভাবে গানের পথে যাত্রা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীলের সঙ্গে গণসংগীত পরিবেশনসহ যৌবনে তিনি পেয়েছিলেন মৌলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সান্নিধ্য। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি গান গেয়ে বাঙালি জাতিকে প্রেরণা দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম গানের সংকলন 'আফতাব সংগীত' প্রকাশিত হয়। তবে বইটি এখন দুস্প্রাপ্য। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক

www.pathagar.com

আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীর সমর্থনে গণসংগীত পরিবেশন করেন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'গণসঙ্গীত' পুস্তিকাটি। এরপর পর্যায়ক্রমে 'কালনীর ঢেউ', 'ভাটির চিঠি', 'ধলমেলা', 'কালনীর কূলে' এবং ২০০৯ সালে সর্বশেষ তাঁরই ঘনিষ্ঠজন কবি শুভেন্দু ইমামের সম্পাদনায় 'শাহ আবদুল করিম রচনা সমগ্র' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে প্রথমবারের মতো বিলেত সফরে যান। ১৯৯৭ সালে 'বাঁচতে চাই' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০১ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। এরবাইরে 'মেরিল-প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা', 'সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক এওয়ার্ড', 'বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি সম্মাননা', 'অভিমত সম্মাননা', 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা'সহ বিভিন্ন পদক-সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ২০০৭ সালে প্রথমবারের মতো তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে সুমনকুমার দাশের সম্পাদনায় 'শাহ আবদুল করিম সংবর্ধন-গ্রন্থ' শীর্ষক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। ২০০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা ৫৮ মিনিটে সিলেট নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শাহ্ আব্দুল করিম

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন, *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা, ১৯৯৫।

২. মোহাম্মদ আলী ইউনুছ [সম্পা.], *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ*, সিলেট, ১৯৯০।

৩. মোহাম্মদ মোমেনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৬।

৪. শুভেন্দু ইমাম [সম্পা.], *শাহ আবদুল করিম পাঠ ও পাঠকৃতি*, বইপত্র, সিলেট, ২০১০।

৫. সুমনকুমার দাশ, *বাংলা মায়ের ছেলে : শাহ আবদুল করিম জীবনী*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানুষ নানা সময়ে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। প্রাচীনকালে এসব সাহিত্যের কোনো লিখিত রূপ ছিল না। এর ফলে মুখে মুখেই এসব সাহিত্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। কোনো লিখিতরূপ না থাকায় সংরক্ষণের অভাবে এসব সাহিত্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তের পথে চলে যায়। এরপরও নানা কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের এসব সাহিত্য সমাজে প্রচলিত রয়ে গেছে। নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষের সৃষ্ট এসব সাহিত্য লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে আসছে। নানাধর্মী এবং নানা ধারার এসব সাহিত্যে সাধারণ মানুষের যীবনযাপন, রীতিনীতি এবং সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা স্থান পেয়েছে। তবে নানা ধারায় রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান কালেও লোকসাহিত্য রচিত হয়ে আসছে। কেবল গ্রামীণ সমাজেই নয়, শহুরে সমাজেও মুখে-মুখে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসাহিত্যের জন্ম হচ্ছে। লোকসাহিত্যের ধারায় কিছুটা ভাটা পড়লেও তা একেবারেই মিইয়ে যায়নি। বরং বর্তমানকালের লোকসংস্কৃতি গবেষকদের বদৌলতে উজ্জ্বলতর ভাবে লোকসাহিত্য ক্রমশ আমাদের কাছে নানা মাত্রায় উপস্থাপিত হচ্ছে। এসব সাহিত্য সার্বিকভাবেই আমাদের লোকসাহিত্যকে উর্বর এবং সমৃদ্ধ করে চলেছে। লোকসাহিত্য ফোকলোরের অংশবিশেষ হলেও ফোকলোরের যাবতীয় বিষয়াদিকে কোনোভাবেই লোকসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। কেবলমাত্র লোকগল্প, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পুথিসাহিত্য, লোককবিতা, লোকছড়া, ভাট কবিতা–এমন ধরনের ধারাগুলোকে লোকসাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায়। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজে চিন্তাধারায় সুনামগঞ্জ জেলা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ অঞ্চলের লোকসাহিত্যের বিষয়টি সারা দেশে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

১. লোকগল্প/লোককাহিনি/কিস্সা/রূপকথা/উপকথা

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় নানা ধরনের লোকগল্প ও লোককাহিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে হাওরবাসীর মুখে মুখে প্রচলিত এসব গল্পের যৌক্তিক ভিত্তি না-থাকলেও মানুষেরা এসব গল্প/শ্রুতি বিশ্বাস করে আসছেন। মুখে মুখে এসব জনশ্রুতি সময়ে-অসময়ে নানা স্থানে এ অঞ্চলের মানুষেরা গল্প করে থাকেন। এ-রকম একটি লোকগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলা থেকে। গল্পটি নিম্নরূপ :

শাল্লা উপজেলা সদরের ঘুঙ্গিয়ারগাঁও বাজার থেকে অন্তত পৌনে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কানকলা গ্রামটি। এ গ্রামে যেতে চাইলে পথিমধ্যে 'বাছুরপুতা' নামক একটি শশ্মানঘাট পেরিয়ে তবেই যেতে হয়। এই 'বাছুরপুতা'-কে ঘিরে নানাধর্মী লোকগল্পের প্রচলন রয়েছে পুরো উপজেলাজুড়ে। নির্জন হওয়ায় সন্ধ্যার পরপরই এ রাস্তায় নীরবতা নেমে আসে। একটা ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হয় রাস্তার আশপাশ এলাকা। ঝিঁঝি পোকার শব্দ, হাওরের এলোমেলো বাতাসে এক অন্যরকম গুমোট ও রোমহর্ষক পরিবেশ তৈরি হয়।

www.pathagar.com

সে-রকমই এক অমবস্যা রাতে বছর ত্রিশেক আগে এক ভদ্রলোক কানকলা গ্রামের পার্শ্ববর্তী যাত্রাপুর গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশে রওয়ানা দেন। তখন রাত দশটা হবে। 'বাছুরপুতা' নামক স্থানে এসে দেখেন–সাদা কাপড় পরা আকাশসমান লম্বা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথিককে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পথ চলার নির্দেশ দেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি ভয়ে সেখানেই মূর্ছা যান। এ ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর সন্ধ্যার পর হতে এ রাস্তা দিয়ে আর কেউ পথ মাড়াতেন না। যদিও এখন অনেকেই রাতের বেলা এ রাস্তা দিয়ে পথ মাড়িয়ে চলেন। তারপরও 'বাছুরপুতা'-র নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা কিছুটা হলেও ভয়ে পথ চলেন। লোকমুখে এ গল্পটি এখনো উপজেলাবাসীর মুখে মুখে ফেরে।

২. কিংবদন্তি

কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নায়ক বা বীর কিংবা সাধক ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচিত গাথাই কিংবদন্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ইতিহাস এবং কল্পনার সম্যক মিশ্রণে কিংবদন্তি ব্যক্তির চারপাশ এবং জীবনীগাথা রচনা করা হয়ে থাকে। সচরাচর বাস্তবতার সঙ্গে জনশ্রুতি মিশিয়ে এসব কিংবদন্তি-কাহিনি তৈরি হয়। যেহেতু এসব কিংবদন্তি -কাহিনির কোনো লিখিত রূপ নেই, তাই জনমানসে এসব কাহিনি গল্পের মতো টিকে রয়েছে। মানুষজন বংশপরম্পরায় এসব গল্প এবং লোকশ্রুতিগুলো বিশ্বাসও করে আসছে। মুখে মুখে কীর্তিত এসব কাহিনি থেকে ওই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসেরও কিছু অংশবিশেষ পাওয়া যায়। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অদ্বৈত মহাপ্রভু ও শাহ আরেফিন দুই ধর্মীয় সাধক হিসেবে পরিচিত। তাঁদেরকে নিয়ে হাওরাঞ্চলে নানা ধরনের লোকশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে ঘিরে উপজেলার যাদুকাটা তীরে পণাতীর্থের স্নান হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই তীর্থের সূচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ তিথিতে এখানে স্নানে অংশ নিলে পাপমুক্তি ঘটে বলে সুনামগঞ্জবাসী বিশ্বাস করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু ও শাহ আরেফিন এই দুই ধর্মীয় সাধককের কর্মময় জীবনের বর্ণনা করে অসংখ্য গান ও আখ্যান রচিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার মজলিশপুর গ্রামের বাউল-গীতিকার বশিরউদ্দিন সরকার এই দুই সাধকের গুনগান প্রকাশসূচক পয়ারছন্দে সুদীর্ঘ একটি গান রচনা করেছেন। সংগৃহীত এ গানটি নিম্নরূপ :

সুনামগঞ্জ জেলা ধরে তাহিরপুর থানা
লাউড়ের গড় এলাকায় হজরত শাহ আরফিনের আস্তানা
জিন্দা ওলি বলিয়া সকলেই মানে
শাহ আরফিনের আস্তানা আছে বিভিন্ন স্থানে
ছোটোবেলা আমার নানা-নানীর সাথে
বাসনা হইল যাইতে মেলাতে
ভারত গোমা ঘাটে আছে শাহ আরফিনের আসন
আগে সেথায় গিয়া পাহাড় বাইয়া সাত কুয়া করতাম দরশন

www.pathagar.com

তখনকার সময় কোনো মোটরযান ছিল না
সুনামগঞ্জ থেকে সবাই হাঁটিয়া রওয়ানা
সেই সময় রাস্তা ছিল নল-খাগড়ার মাঝ দিয়া
একা যাইত না কেউ বাঘ ডরাইয়া
সম্মিলিত হয়ে যাইত দলবদ্ধ ভাবে
তখন এলাকায় কিছু লোক ছিল উগ্র স্বভাবে
রাস্তায় কেউ বসে খাবার খাচ্ছে কেউ নাস্তা পান-সুপারি
ভেদাভেদ নাই হিন্দু-মুসলিম পুরুষ কিবা নারী
একই সময়ে অদ্বৈত সাধুর আখড়া বাড়ি হয় পণাতীর্থস্নান
মানুষের ঢল দেখিলে জুড়ায় মনপ্রাণ
একই সময়ে বসে দুজনার দুই মেলা
মনানন্দে আশেক ভক্ত থাকে উতালা
মানুষে মানুষে দেখা ভ্রাতৃত্ব স্থাপন
বোঝা যায় একে অন্যের বড়ো আপন
যার যা তৌফিক মাফিক আস্তানা করে
হাজার হাজার নারী-পুরুষ বসে বালুচরে
শতশত মাইক বাজে হইতেছে ধ্বনি
কেউ গাইতেছে ভাবের গান কেউ উন্মাদিনী
অদ্বৈত সাধুর বাড়িতে বসে সাধু সন্তগণ
তারা সবাই মনানন্দে গাইছেন নাম-কীর্তন
পণ্ডিতেরা মনোযোগে করেন মন্ত্র পাঠ
বোঝা যায় এ যেন সত্য আজব প্রেমের হাট
তীর্থস্নান করার আগে তর্পন করতে হয়
সেথায় রয়েছেন বসে ঠাকুর মহাশয়
প্রণামি দিয়ে সবাই করে পণাতীর্থস্নান
সাধু-ফকির বাউল যারা গায় তারা গান
বাংলা-ভারত থেকে আসে ভক্তজন
দর্শনার্থী হয়ে পুরায় মনের আকিঞ্চন
লালন সাঁইজির গানে আছে অদ্বৈত সাধুর কথা
তিন পাগলে হইল মেলা সে চয়নে গাঁথা
মানুষ যারা হয়ে গেলেন নাম মরে না
আধ্যাত্মিকতা যুগে যুগে তাদের হয় প্রচারণা
শাহ্ আরফিন আর অদ্বৈত সাধু
ভক্তগণকে বিলাইতেছেন অমৃত প্রেম মধু
অদ্বৈত সাধুর বাড়ির পশ্চিমপারে ইসকনের মন্দির
নাম করা পণ্ডিত সেথায় হয় তখন হাজির

www.pathagar.com

সারা রাত ভর চলছে ভক্তিমূলক গান
মনানন্দে গাইছে সবাই আকুলিত প্রাণ
গানের ভিতরে মিলে নিগূঢ় কথার তত্ত্ব
ভক্ত যে জন শুনে সে জন হইয়া মত্ত
মানুষের ভিতরে মানুষ করছে বিচরণ
গুরু চরণ না ভজিলে সবই অকারণ
দেবজীব গুরু ভক্তি জীবে দয়া করে
নামের গুনে কত পাপী তাপী গিয়াছে তরে
অদ্বৈত বাড়িতে শুধু নিরামিষ খাবার
ভক্তবৃন্দ খাইতে পারে অধিকার সবার
শাহ আরফিনের আস্তানায় আছে লঙ্গরখানার চল
সেখানে বসে খাবার খাচ্ছে কত আশেক পাগল
স্নান শেষে অনেকেই শাহ আরফিনের আস্তানায় যায়
আপন মনে ঘুরে ফিরে মন যাহা চায়
কেউবা রাঁধে কেউবা কাঁদে কেউ করে ঘুরাফেরা
বোঝা যায় সবাই যেন একই প্রেমে মরা
প্রেম নগরের বাসিন্দা যারা প্রেমবিলাসী
সবসময় আত্মহারা মন যে উদাসী
শাহ আরফিন আর অদ্বৈত সাধুর মেলা
দিনে দিনে হয়ে উঠবে আরো উজ্জ্বলা
মহামানব মহামানুষ তাঁরা কালের সাক্ষী
সত্য প্রতিফলিত হয় তাঁদের মুখের বাক্যি
সু-নজরে যদি তাঁরা কারো পানে চায়
ভবযন্ত্রণা রোগব্যাধি দূরেতে পালায়
মানুষে মানুষ বিরাজে বলছেন শাহ আবদুল করিম
পির আউলিয়া ফকির সাধুর ক্ষমতা অসীম
নাম ছাড়া ডাক রইয়াছে বলছেন ফকির দুর্বিন শাহ
সে কথা না জানিলে সবই নিরাশা
গুরু বিনে সে আশা কি হইবে পূরণ
নিশ্চয় ভজিতে হবে গুরুর রাঙা চরণ
নাম বাতাইয়া দিবেন গুরু ভক্ত যেজন
কৃপা গুণে আঁধার কেটে পায় নবজীবন
নামের গুণে পাহাড় পুড়ে হয়ে গেল ছাই
নামবিহনে এ ভুবনে কোনো গতি নাই
গুরুবাদী মানুষ যারা বুঝে গুরু ধর্ম
গুরু বিনে বুঝে না সে অন্য কোনো কর্ম
গুরু ধর্ম গুরু কর্ম গুরু সত্য সার

www.pathagar.com

গুরু বিনে কেমনে হইবে ভবসাগর পাড়
গুরু ভজিবারে আছে সকলের নির্দেশ
সত্য গুরু পরশমণি দিবেন উপদেশ
উপদেশ মোতাবেক যদি কাজ করিতে থাকি
খুলিয়া যাবে নিশ্চয় ভক্তের অন্ধ আঁখি
শাহ আরফিন ও সাধুর কথা কি বলিব আমি
নাই আমার ভাষাজ্ঞান নাই তো প্রণামী
নিজগুণে যদি তাঁরা দেন চরণ ছায়া
ধন্য হইবে আমার মাটির মানবকায়া
মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য শুধু বিনিময়
বিনিময় ছাড়া কি আর কোনোকিছু হয়
গুরুদক্ষিণা গুরুর প্রাপ্য ধন
যার কাছে করতে হয় আত্ম-সমর্পণ
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এ চার
যোগে যোগে দেখি মানুষ অবতার
হিংসা অহংকার থাকলে মানুষ হওয়া যায় না
গুরু বিষয় সামান্য নয় গুরু ভক্তের মনের আয়না
গুরু মিলে ঘরে ঘরে শিষ্য মিলা দায়
নিজে শুদ্ধ না হইলে সবই বৃথা যায়
বাড়ির পাশে আরশিনগর থাকে পড়শি
আপন ভেবে নিতে হয় করে স্বদেশী
শাহ আরফিন-অদ্বৈত সাধুর এ মিলন বন্ধন
আশা রাখি অটুট থাকবে সারাটি জীবন
অক্ষয় অভয় অসাধারণ
বহুরূপধারী মনবিহারী তাঁরা দুইজন
চৈত্র মাসের চৈতানীতে আবার মেলা যখন আসে
আবার মেতে ওঠে সবাই আনন্দ-উল্লাসে
যখন আসে ভক্ত সবার বিদায়ের পালা
যাইতে চায় না কেহ রেখে মিলনমেলা
ধীরে ধীরে মেলার ঘটে অবসান
আগামীতে আসবে বলে থাকে মনের টান
এ দ্বারা অব্যাহত থাকবে চিরদিন
কালে কালে আসবে ভক্ত নবীন-প্রবীণ
এর বেশি কি বলিব আমি দীনহীন
বশিরউদ্দিন কয় চিরঞ্জিব অদ্বৈত-শাহ আরফিন
এ পর্যন্ত এখানে রাখিলাম বারণ
এ মিলন চির অম্লান সত্য পরশ রতন।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত সুদীর্ঘ গানটির গীতিকার বশিরউদ্দিন সরকার দুই ধর্মীয় সাধককে নিয়ে একাধিক গান রচনা করেছেন। যেগুলো তাহিরপুর অঞ্চলে বেশ শ্রোতাপ্রিয়। সরাসরি গীতিকারের কাছ থেকে সংগৃহীত এসব গান নিম্নরূপ :

১

আমার মন যাইতে চায় শাহ আরফিনের বাড়ি
কি মায়া লাগাইল শাহ আরফিন ভুলতে না পারি ॥
হাজার হাজার নারী-পুরুষ
শাহ আরফিন নামে হইয়া বেহুঁশ
কতজনা করছে আফসোস প্রেম ভিখারী ॥
প্রেমবাজারে সবাই সমান
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান
মনানন্দে গাইতেছে গান পুরুষ কি নারী ॥
যাদের রে ভাই ভাগ্য ভালো
অন্ধকারে পাইল আলো
পাগল বশিরউদ্দিন আশায় রইল নিয়ে প্রেমের তরি ॥

২

আমার মন হইছে দেওয়ানা
যাইতে হজরত শাহ আরফিনের আস্তানা
যাবো যাবো শাহ আরফিন যাবো আমি তাহার মাস্তানা ॥
নামে এত মধু ভরা
দেখতে চায় মোর মন মনোরা
মন পবনের ঘোড়া লাগাম দিলে মানে না ॥
যেয়ে দেখি প্রেমের বাজার
নারী-পুরুষ হাজার হাজার
যার তার ভাবে করছে ব্যাপার আশেকের লেনদেনা ॥
দেখে পূর্ণ হলো মনস্কাম
যোগে যোগে থাকবে দয়াল শাহ্ আরফিনের নাম
বশিরউদ্দিন জানাই সালাম চাই একটু করুণা ॥

৩

ও দয়াল শাহ্ আরফিন ভক্তের অধীন রও চিরদিন
জানি তুমি জিন্দা ওলি
চাহে ভক্তে চায় তোমার চরণের ধুলি ॥
তুমি তো ভক্তের কাণ্ডারী
বাসনা জানো সবারই
সাজিয়ে প্রেম ভিখারী বুলবুলি ॥
নামে তোমার এত মধু

www.pathagar.com

আসে কত ফকির সাধু
দাও হে কৃপা বিন্দু রহমত ঢালি ॥
তুমি রহমতের খনি করো একটু মেহেরবাণী
দূর করে দিও মনের কলি ॥
বলে পাগল বশিরউদ্দিন
ওগো দয়াল শাহ আরফিন
ভরে দিও আমার ভিক্ষার ঝুলি ॥

৪
হজরত শাহ আরফিন আউলিয়া
আশেক ভক্ত পাগল হইল তোমার লাগিয়া
বসাইয়াছ প্রেমমেলা বাংলা-ভারত জুড়িয়া ॥
বিভিন্ন জায়গায় তোমার আসন গেল রইয়া
মনপ্রাণে সবাই মানে জিন্দা আউলিয়া ॥
নারী-পুরুষ আসে কত আনন্দিত হইয়া
বসাইয়াছ মিলনমেলা হেকমত করিয়া ॥
কয় পাগল বশিরউদ্দিন মনেতে ভাবিয়া
দয়া করো মায়া করো কাঙাল জানিয়া ॥

৪
ও অদ্বৈত সাধুরে কি মায়া লাগাইলে, উদাস বানাইলে
কি যাদু করিয়া আমায় পাগল বানাইলে ॥
নামে তোমার এত মধু ধন্য ধন্য ওরে সাধু
কুলবধূ ঘোমটা আঁচলে
ও তোর প্রেমেতে পাগল ওরে ছাড়িয়া সকল
তুমি ভক্তের সহায় সম্বল পরান কাড়িলে ॥
সাধু ফকির বৈরাগী তোর প্রেমে পাগলিনী
কুলনাশিনী উন্মাদ সাজাইলে
তুমি রসিয়া নাগর ওরে জানো তো খবর
ভক্তদের অন্তরে অন্তর আপনি মিশাইলে ॥
একি তোমার প্রেমের ধারা
মন থাকে পাগলপাড়া
প্রেমের পোড়া আমায় পুড়াইলে
কয় বশিরউদ্দিন যদি বাসো আমায় ভিন
জল ছাড়া কি বাঁচে রে মীন জল না থাকিলে ॥

৫
পণাতীর্থে যাবো অদ্বৈত মহাপ্রভুর বাড়ি
আয় কে যাবে আয়রে সবাই আয় তাড়াতাড়ি ॥

www.pathagar.com

পণাতীর্থে স্নান করিলে
পাপ নাশে গঙ্গাজলে
চলো সবাই দলে দলে পুরুষ-নারী ॥
চৈত্র মাসের চৈতানিতে
আসে ভক্ত দিবারাতে
মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে প্রেমভিখারী ॥
এক নিয়তে যাবে যারা
অদ্বৈত মহাপ্রভুর দয়া পাবে তারা
বশিরউদ্দিন প্রেমের মরা, গায় নামের সারি ॥

৩. লোককবিতা

লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা লোককবিতা। গ্রাম্য কবিরাই এই ধারার প্রধান রচয়িতা। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল ও নিরক্ষর প্রান্তিক এসব কবিরা প্রকৃতি থেকে পাঠ নিয়ে 'স্বশিক্ষিত' হয়েছেন। তাঁদের প্রকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতার যথাযথ কাব্যমানের জন্য ছন্দ-মাত্রার কোনো বালাই না-থাকলেও কোনোভাবেই মূল ধারার কবিতা থেকে এসব কবিতার ভাষাবিন্যাস ও উদ্দেশ্য পিছিয়ে নেই। প্রায় সময়ই এসব কবিতা পয়ার ছন্দে কবিরা রচনা করেছেন। তবে এসব কবিতায় আবার অন্ত্যমিলের ব্যবহার মোটামুটিভাবে লক্ষণীয় রয়েছে। কবিদের সমাজ সচেতনতার বিষয়টিও কবিতায় তীব্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর বাইরে প্রেম-ভালোবাসা, উৎসব-আনন্দ, সুখ-দুঃখ লোককবিতায় স্থান পেয়েছে। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লোককবির জীবনী ও তাঁদের রচিত লোককবিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ভরত চন্দ্র সরকার

ভরত চন্দ্র সরকার ১৯৩৪ সালের ৩ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে। তাঁর পিতা মৃত শরত চন্দ্র সরকার, মা মনমোহিনী সরকার। তিনি একজন প্রখ্যাত গীতিকার। নিম্নে তাঁর একটি লোককবিতা উল্লেখ করা হলো :

১
মোরার দুঃখ গেল বাংলা স্বাধীন এবার হলো,
নৌকা কুল বাদাম তোল আনন্দে জয়বাংলা বলো ॥
বাংলা স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন আর নই আমরা পরার অধীন,
দুঃখে গেল মাস কয়েকদিন এবার শান্তি হলো ॥
রাজাকার দল দালাল সকল এখন উপায় বলো,
কই তোমাদের বন্ধু সকল পাঞ্জাবিগণ কই লুকালো ॥
বাংলা স্বাধীন স্বাধীন করে ছাত্রছাত্রী কত মরে,
দেখতে পারেন জিজ্ঞেস করে ঢাকাতে হলো ॥
২৫শে মার্চ তারিখে ঢাকার বুকে কত শহিদ হলো,
কত জননী দিন রজনী ফেলছে সদায় চোখের জল ॥

www.pathagar.com

বাঙালিরা দলে দলে ইন্ডিয়াতে গেল চলে,
ভর্তি হলো ক্যাম্পে পরে মহামারি আরম্ভিল ॥
ভারত মাতা ইন্দিরা গান্ধী স্বীকৃত এই দিল,
ভরত বলে বাংলা বিজয় বিশ্বজুড়ে রেকর্ড হলো ॥

আব্দুল ওয়াহিদ

আব্দুল ওয়াহিদ একজন প্রবীণ গ্রাম্য কবি। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জাউয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাৎক্ষণিক অসংখ্য কবিতা রচনা করে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর একটি কবিতা নিম্নরূপ :

১
তাতিকোনা তালুকদার বাড়ি
আদি পুরুষের বাংলাঘর
সামনে আছে সুরমা নদী
দেখা যায় ঝিলকার হাওর
আদি পুরুষের বাংলাঘর।
পাশে আছে জামে মসজিদ
আজান পড়লে নামাজ পড়
আদি পুরুষের বাংলাঘর।
কমলা লেবু তেজপাতা
সঙ্গে আছে চুন-চুনা পাথর
পাশে আছে ছাতক শহর
আদি পুরুষের বাংলাঘর।

পির সানজব আলী

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়া গ্রামের পির সানজব আলী স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁর একটি কবিতা নিম্নরূপ :

১
বিশ্বাসকে ঘাতক করে
পাঁচটা নিলেন গুয়ার গাছ
ইজ্জত রাখিল মামির
খাজুর গাছ।

আরব আলী

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়া গ্রামের আরব আলী বাউল ছিলেন। কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর একটি কবিতা নিম্নরূপ :

১
পরারে বুঝাইতে পার
নিজের বোঝা বিষম ধায়

www.pathagar.com

ডুগি ভাঙে, লতা তুলে
জিকাইলে বখরি তুকায়।

৪. লোকছড়া

কথা প্রসঙ্গে ফোড়ন-কাটা বাঙালির চিরকালীন অভ্যাস। আবহমানকাল ধরে লোকপরম্পরায় মুখে মুখে রচিত এবং প্রচলিত লোকছড়া আওড়িয়ে বিভিন্ন আড্ডায় ফোড়ন কাটতে দেখা যায় অনেককেই। এর বাইরে শিশুদের ঘুম পাড়ানো, নলকূপ স্থাপন, ধান মাড়াই, খেলাধুলার সময়, কৃষিবিষয়ক নানা অনুষ্ঠানে লোকছড়ার বহুল প্রচলন দেখা যায়। লোকমানসে সুদীর্ঘকাল ধরে এসব ছড়া চিরন্তর একটা ছাপ রেখে চলেছে। এ কারণেই এসব ছড়া মুখে-মুখেই মুখস্ত হয়ে যায় সবার কাছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায়ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য লোকছড়া। আঞ্চলিক ভাষা থেকে শুরু করে প্রমিত বাংলা ভাষায় এসব ছড়ার পঙ্‌ক্তি রচিত হয়েছে। মৌখিক ভাষায় রচিত হওয়ায় উচ্চারণ-তারতম্যের কারণে একাধিক ছড়ার নানা ধরনের পাঠান্তর ঘটেছে। কিছু ছড়া নিম্নরূপ :

ভোলাভুলি পূজার ছড়া

১

ভোলা ছাড় ভুলি ছাড়, বারো মাইয়া পিছাইয়া ছাড়
ভাত খাইয়া লড়বড়, পানি খাইয়া পেট ভর।
খাইয়া না ছইয়া ফুল, হাজার টাকার মূল।

২

ভোলাভোলি ভোলা ছাড়
মাছি ছাড়, মশা ছাড়
বারো মাইয়া পিছা ছাড়
ঘাস খাইয়া লড়চড়
পানি খাইয়া পেট ভর।

ক্ষেত রোপনের ছড়া

১

শাহ গাজি চুরামণি
স্থলে পর্বতে ধ্বনি
সংকটে গাজির নাম
লওরে ভাই আল্লার নাম
আল্লা নিগাবান
বলরে ভাই মোমিন
আল্লাহ রসুল
আল্লাহ আল্লাহ।

২

জন্মিয়া সুখ অইল না
আমি কপাল পোড়া

www.pathagar.com

খাটলে আলুফা নাই
ভখতের বুরা।
৩
ব্যাঙা ব্যাঙির বিয়া
কুলা মাথাত দিয়া
বাইরও গো ব্যাঙাইর মা
মেঘ ডালিত দিয়া
মেঘ ডালিতে আলতা ফুটা
মেঘ ডালিতে চৈলতা ফুটা
খালো নাই পানি, বিলঅ নাই পানি
আসমান ভাঙিয়া পরে ফোঁটা ফোঁটা পানি।
৪
এমন ভক্কিলার দুয়ারে আইলাম রে
মটকার মাঝে চাউল থইয়া
আল্লার কসম করে রে।
উরউরি দেপতা মুরমুরি ভাই
এখান ছিটা পানি দেও
মেঘে বিইজ্যা যাই
কালা এগু বাইংগন ধলা এগু ফুল ধুতুরা রে
উগার তলে থাকে ব্যাঙ
বিয়ার কালা মেলে টেং
ব্যাঙ বড় রসিয়া রে।

বাঘাই শিন্নির ছড়া

১
ঘরে বাত্তি জ্বালায় বউ দিদিগো দরজা খোলো চাই
দরজা খুলিয়া দেখো বাঘাই সিন্নি গাই।
দামা গেল লামার বন্ধে ডেমি খাইবার আশে
চিতরা ফাকরা বাঘে গিয়া লেঙ্গুর ধইরা টানে।
২
চাউল কার চাউল কার গিরস্থের ঝি
সিন্নি আদায় করো যাই তাড়াতাড়ি
সিন্নি আদায় করিতে যে করবে হেলা
দুই চক্ষু খাইবে তার দুইপরি বেলা।

রোদ ওঠার ছড়া

১
রইদ রাজারে রইদ তুইল্যা দে

www.pathagar.com

ইন্দুবাড়ির সুন্দর কইন্যারে চাল তুইল্যা দে
গাছের তলে কাটাকুটি
গাই পড়ইছে দলা ঢেকি
গাইর নাম চাম্পা, বাছুরের নাম ফুল
উঠান ফাটাইয়া রইদ তুল।

২
শীত করে গো শীতের মাই
খেতার তলে জাগা নাই
খেতা নিল হিয়ালে
আইন্যা দিব বিয়ালে।

৩
ছেবা দেয় ছেউটি তার হওরি বাউটি
ছেবা লাইয়া ঘর যায়
ব্যাঙ ফুইরা ভাত খায়।

৪
কাঁঠাল পাকছে লোকে দেখছে
ভাইরে জংলার বাঘে খাইছে।

৫
বুলবুইল্যারে তর পুটকি ক্যানে লাল?
আল্লায় বানাইয়া দিছইন হিন্দু-মুসলমান।

৬
চইতের চলিতা
বইসাগের নালিতা
জষ্টির দই
আষাঢ়ের কই
শাওনে শসামিটা
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা
আশ্বিন মাসে কুল
আগন মাসে খইয়া-পুটির ঝোল
পুষা কানজি মাগা তেল
ফাগুন চৈতে গুড় আদা বেল।

বৃষ্টি প্রার্থনার ছড়া

১
বেঙাই মার নাকে ফোটা
মেঘ পড়েছে ছইলতা ফোটা
ও বেঙাই মেঘ আন গিয়া ॥
ও বেউলা রানী সাধের মেঘ দেও লুটারপানি

www.pathagar.com

উগারতলে থাকে বেঙ বিয়ার কালে মেলে টেং
ও বেঙাই মেঘ আন গিয়া ॥
গাইল কুলকুল চিড়া কুলকুল
কুলা লইয়া বাইরও লো
ও চেড়ি তোর বিয়ার ধান
মেঘে ভিইজ্যা যায় লো।
ভিজাইয় ছিড়াইয়া ধান
আক্কুর উক্কুর বাড়া বান
কানা মেঘরে কানা মেঘ
তুই আমার ভাই
একদার পানি দিলে
ছিনাইভাত খাই।
ছিনাই ভাত খাইতে খাইতে
শইলে করল ভর
নবী সত্য কেন গো আল্লাহ
মেঘ দিলায় না
মেঘ দিলায় যেমন তেমন
লাঙল দিল ভিজল না।
ধান কাটা গেলে গো
আল্লাহ কাঁচি মানে না।

২

ব্যাঙ্গা ব্যাঙ্গির বিয়া
কুলা মাথায় দিয়া
ও ব্যাঙ্গ পানি আন গিয়া
খালেও নাই পানি, বিলেও নাই পানি
আসমান ভাইঙা পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি
আম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
জাম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
তেও পড়ে মেঘের পানি।

বিবিধ ছড়া

১

চিকা যায় চিক চিকাইয়া
বামন যায় ঠেঙ্গা লইয়া।
ধর চিকা, মার চিকা
চিকার দাম পাঁচ সিকা।

২

উড়ি পাতা ঝনঝন

www.pathagar.com

দুলাভাই আমার পাঁচজন
নাস্তা দিলে খাইন না
বিদায় দিলে যাইন না।

৫. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুথিসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে বলে গবেষকদের ধারণা। এ সাহিত্যের একটি সারবান ও প্রাণবন্ত ধারা সুনামগঞ্জ অঞ্চলেও প্রবাহমান। শুরুর দিকে হিন্দু কবিওয়ালা ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর অসংখ্য পুথি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক মুসলমান কবিওয়ালারাও নানা ধরনের পুথি রচনা করেছেন। হিন্দু কবিওয়ালারা *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পদ্মপুরাণ*সহ নানা ধর্মীয় বিষয়াদি নির্ভর চরিত্রকে মুখ্য রেখে পুথি রচনা করেছেন, অপরদিকে মুসলমান কবিওয়ালারা *ইউসুফ-জোলেখা*, *লাইলী-মজনু*, *জঙ্গনামা*, *আমীর হামযা*, *কারবালার যুদ্ধ*, *গাজি কালু চম্পাবতী*, *সত্যপীরের কাহিনি*সহ ইসলাম ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভর নানা ধারার পুথিসাহিত্য রচনা করেছেন। মরহুম মুন্সি আমিরুদ্দিন প্রণীত *আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি* হাওরাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটি সংগ্রহ করা হয়েছে কাছ থেকে ফুল মিয়ার (৫৫) কাছ থেকে। তাঁর ঠিকানা : গ্রাম–ইয়ারাবাদ, ডাকঘর–ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা–শাল্লা, জেলা–সুনামগঞ্জ; পেশা–কৃষিকাজ, পিতার নাম–হাজী পেশকার আলী, মাতার নাম–খোদেজা আক্তার। পুথিটি নিম্নরূপ :

[হামদ ও নাআ'ত]
বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম স্মরিয়া প্রথম ॥
আদ্য মূল শির সেই শোভিত উত্তম ॥
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার *
যেই প্রভু জীবমানে স্থাপিল সংসার *
সৃজিল পর্বত আদি গিরি শৃঙ্গবর ॥
অগাধ সমুদ্র মধ্যেরে তরঙ্গ লহর *
সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল করি খণ্ড খণ্ড *
সৃজিল পাতাল আদি স্বর্গ নরক আর ॥
স্থানে স্থানে নানা বস্তুরে করিল প্রচার *
সৃজিলেন আগুন পবন জল ক্ষিতি ॥
সৃজিলেক চন্দ্র সূর্য দিবা আর রাতি ॥
সৃজিলেক গ্রহ আর স্নিগ্ধকর জ্যোতি *
সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম আলো অন্ধকার ॥
করিল মেঘের মধ্যেরে বিদ্যুৎ সঞ্চার *
সৃজিল সমুদ্র মধ্যে জলচর কুল ॥
সৃজিল ছিপিতে মুক্তারে রত্ন বহু মূল *
দ্বিতীয় প্রণাম করি হাবীব আল্লাহর ॥
যে সৃষ্টি করিয়া বিধিয়ে করিল প্রচার *

www.pathagar.com

ঘুচাইতে আমাদের ভ্রম অন্ধকার ॥
ভেজিল উজ্জ্বল ছবিরে হাবীব খোদার *
ভক্তি ভরে প্রণামি যে যুগল চরণ ॥
ভেলুয়া সুন্দরীর কেচ্ছা করিব বর্ণন *

[কেচ্ছা শুরু]

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন ॥
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন *
তাহার দেশের নামরে জানানো তেলৈন্যা নগর *
তাহার বাপের নামরে জানো রাজা মনোহর *
মা জননীর নামটিরে জানো ময়না সুন্দরী ॥
সেই ঘরে হইয়াছে জন্ম ভেলুয়া সুন্দরী *
কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান ॥
দেখিতে সুন্দর অতি রসিকের প্রাণ *
আকাশের চন্দ্র যেন রে ভেলুয়া সুন্দরী ॥
দূরে থাকি লাগে যেন রে ইন্দ্রকুলের পরী *
কাছে গেলে দেখা যায় রে সোনার প্রতিমা ॥
আর সুন্দর লাগেরে ভেলুয়ার চোখের ভঙ্গিমা *
চোখের উপর ভুরুরে কন্যার অতি মনোহর
পদ্মফুলের মাঝেরে যেমন রসিক ভ্রমর *
ভালো পুষ্প পাইয়ারে ভ্রমর মধু করে পান ॥
তেকারণে সুন্দর লাগেরে বাঁকা দু-নয়ন *
চোখের উপর কন্যায়রে খেঁচিছে কামান ॥
হেরিলে কাড়িয়ারে লয় জগতের প্রাণ *
চন্দ্র সূর্য যিনিরে যেন ভেলুয়ার বদন ॥
কুন্দের কলিকা যিনিরে হস্ত পদের গঠন *
সারি সারি দন্তগুলিরে যেন মুক্তার বাহার ॥
হাসির বিজলী চটকেরে অতি চমৎকার *
বুকের উপর দুটিরে কনক কোটরা ॥
মধু লোভে মত্ত হইয়াছেরে ভ্রমরা *
এক ডালে জোড় কমলারে রহিছে ধরিয়া ॥
কোন রসিক ভ্রমরা নাহিরে মধু খাইবে বসিয়া *
বার বৎসর হইয়াছেরে ভেলুয়া তের নাহি দূরে ॥
একেশ্বরী থাকেরে কন্যা জোড় মন্দির ঘরে *
ভেলুয়ার কথারে এবে হউক নিবারণ ॥
আমীর সাধুর কথারে কিছু শুন দিয়া মন *
তাহার বাপের নামরে জানো মানিক সওদাগর ॥
মা জননীর নামটিরে জানো সোনাই সুন্দর *

www.pathagar.com

তাহার দেশের নামরে জানো শামলা বন্দর ॥
সেই দেশে হইয়াছেরে জন্ম লাখেরে আমীর সওদাগর *
রূপে গুণে আমীর সাধুররে কি করি বাখান ॥
দিনে দিনে বাড়ে সাধুরে পূর্ণিমার চান *
এক মাস দুই মাস দিলরে সাধুর বৎসর পূরণ ॥
পাঁচ বৎসরের সাধুরে পড়িবার কারণ *
দিন বাছি দিন পাইয়াছেরে আউয়াল শুক্রবার ॥
পড়িবার দিছেরে সাধুরে মাদ্রাসা মাঝার *
প্রথমে বিসমিল্লায়রে সাধু পড়ে আলিফ-লাম ॥
চৌদ্দ এলেম পূর্ণরে সাধু করিছে তামাম *
এই আমীর সাধুররে বৎসর দশ হইল ॥
শিকার করিবার তরেরে সাধুর মনেতে উঠিল *
আমীর সাধুর বাপের নামরে মানিক সওদাগর ॥
তার এক মাঝি ছিলরে নামে গৌরল ধর *
তারপরে আমীর সাধুরে কি কাজ করিল ॥
গৌরলধর মাঝির বাড়িতে যাইয়া পৌছিল *
মাঝি মাঝি বলিরে সাধু যখন দিছে ডাক ॥
গৌরলধরের বধূ আসিয়ারে দিলেন্ত জওয়াব *
কার খাইলাম ধার কর্জরে কার করলাম চুরি ॥
কেনবা ডাকিলারে আমার স্বামীর নাম ধরি *
আমীর সাধু উঠিরে বলে শুনরে খবর ॥
মানিক সাধুর পুত্র আমি আমীর সওদাগর *
আমীরের নামরে বধূ শুনিছে যখন ॥
স্বামীর নিকটে খবর দিল ততক্ষণ *
যখন শুনিলরে সাধু আমীরের নাম ॥
শীঘ্র করি আসিরে মাঝি জানাইল সালাম *
কি কারণে ডাকিলেরে সাধু বলো যে আমারে ॥
চৌদ্দকাহন ডিঙারে মাঝি সাজাইতে লাগিল *
এমন সাজানি সাজায়রে ডিঙা কি করি বাখান ॥
নানান কারিগরে করে জাহাজের প্রমাণ *
আমীর সাধু থাকিবে যেইরে ডিঙারই উপরি ॥
সেই ডিঙা এই রূপেরে মাঝি দিল সাজন করি *
প্রত্যেক তখতায় গায়োর মাঝি ভেলুয়ার ছবি করি ॥
আমীরের ছবি পাশে বসাইলরে সারি সারি *

[আমীর সাধুর গান—রাগিণী বেহাগ তাল মধ্যমান]

গৃহে রহিব কেমনে, গৃহে রহিব কেমনে ॥
কেমনে তাহার বিনে ধরিব জীবনে *

www.pathagar.com

রহে না মন গৃহে আর, কি করি উপায় তার ॥
না পাইলে প্রাণকান্ত, বাঁচিব কেমনে *
কি ক্ষণে তাহারি সনে, দেখা হৈল কু-স্বপনে ॥
ভুলি ভুলি করি আমি ভুলে নাহি দু-নয়নে *
হীন মোয়াজ্জম ভনে, কেন সাধু ভাবো মনে ॥
যাই আমি আনি তারে, মিলাইব দুইজনে *

[ডিঙ্গা সাজাইবার বয়ান]
প্রথমে সাজায়রে ডিঙা নামেতে ফোরকান ॥
সেই ডিঙাতে তুলি লৈছে কিতাব ও কোরান *
দ্বিতীয় সাজায়রে ডিঙা নামে আউল কাউল ॥
সেই ডিঙাতে তুলি লৈছেরে ভালো চিকন চাউল *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে লক্ষ্মীন্দর ॥
নানান মিষ্ট ফল লৈছেরে আমীর সওদাগর ॥
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে ছুড়ি মুড়ি ॥
সেই ডিঙাতে তুলি লৈছেরে মসল্লার গুড়ি *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে হক চুর ॥
মিষ্টিজল ভরি ডিঙারে কৈল ভরপুর *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামেতে রঙ্গমালা ॥
খড়গ আদি অস্ত্র বাছি লৈছে ভালা ভালা *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামেতে কল্যাণ ॥
ঝাড়বন কাটিরে সব করেন্ত ময়দান *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে হংস মালা ॥
ছয়মাসের পন্থ থাকিরে দেখা যায় গলা *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে খৈয়া পেটি ॥
বনে মালে না ভরিলরে কাটি ভরে মাটি *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে কাঞ্চনমালা ॥
সেই ডিঙাতে তুলি লৈছেরে বারুদ আর গোলা *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামেতে হাঙ্গরা ॥
সেই ডিঙাতে সাজাই লৈছেরে সোনার কেমারা *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা নামে গুয়াবর ॥
সেই ডিঙাতে সওয়ার হৈলরে মাঝি কর্ণধর *
তারপরে সাজায়রে ডিঙা শ্যামল সুন্দর ॥
সেই ডিঙাতে সওয়ার হইলরে আমীর সওদাগর *
তারপরে আমীর সাধুরে কি কাম করিল ॥
সৈন্য সেনা লৈরে সাধু ডিঙাতে উঠিল *
সারেঙ্গ সুকানিরে জানো টেণ্ডলের বরাবর ॥
বদর শুমারী কৈরে তুলেরে জাহাজের নঙ্গর *

www.pathagar.com

একদিন দুই দিনেরে জানো আল্লাহর কেরামত ॥
তিন দিনে চলি গেলরে চৌদ্দ দিনের পথ *
সেই স্থানে যাইয়ারে সাধু নিরক্ষিয়া চায় ॥
তৈলৈন্যা নগরের ঘাটরে সাধু দেখিবারে পায় *
সেইখানে যাইয়ারে ডিঙা নঙ্গর করিল ॥
শিকার করিতে সাধু কুলেতে উঠিল *
কুলেতে উঠিয়া সাধুরে দৃষ্টি করি চায় ॥
নয়লক্ষ কবুতররে সাধু দেখিবারে পায় *
নয় লক্ষ কবুতর মাঝে এক কবুতররে ॥
কালেমা তায়্যেব সদা তার মুখে পড়েরে *
কালেমা তায়্যেব যদিরে আমীর কানেতে শুনিল ॥
গুলাইল খেঁচিয়া সাধু সে কবুতর মারিল *
গুলাইলের আঘাত খাইরে সোনার কবুতর ॥
উড়িয়া পড়িল ভেলুয়ার গোচর *
ধড়ফড় করি পড়েরে ভেলুয়ার বুকের উপর ॥
মালিকের বুকে পড়েরে সোনার কবুতর *
হাতের মাঝে লইয়ারে ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল ॥
কোন সতীনের পুতরে মোর কবুতর মারিল
কোন দুষ্টে বিনা দোষে গুলাইল মারিল ॥
কার নষ্ট নাহি করে মোর কবুতর ॥
কোন দুষ্টে গুলি দিলরে তাহার উপর *
বিলাপ করি কান্দেরে ভেলুয়া সুন্দরী ॥
কান্দন শুনিয়া সাত ভাইরে আইল দৌড়াদৌড়ি *
ভেলুয়া সুন্দরীর জানো রে সাত ভাই ছিল ॥
কান্দন শুনিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল *
শুন শুন ওগো ভৈনরে বলি যে তোমারে ॥
কি কারণে কান্দ তুমি টঙ্গির উপরে *
ভেলুয়া বলে শুনরে সাত সহোদর ॥
কোন দুষ্টে মারিল মোর সরদার কবুতর *
এই কথা সাত ভাই যখনরে শুনিল ॥
বারুদের ঘরে যেন আগুন লাগাই দিল *
কহে কেন কেবা আছেরে তলৈন্যা নগরে ॥
তোমার কবুতর মারেরে হেন শক্তি ধরে *
গর্জিয়া সে সাত ভাইরে ডিঙার কাছে গেল ॥
আমীর সাধুরে ডাকিরে সবে কহিতে লাগিল *
এতেক দেমাগ তোমাররে মনে নাহি ডর ॥
কি হেতু মাররিলা মোররে ভগ্নির হাউসের কবুতর *

www.pathagar.com

গৌরলধর উঠি বলেরে শুন দিয়া মন
কবুতরের মূল্য দিতেরে সেই ধন নাই *
আমীর সাধু উঠি বলেরে না করো বড়াই ॥
তোর দেশে আসিয়াছিরে আমি তোরে না ডরাই *
সাত ভাইয়ে বলেরে শালা করো সওদাগরী ॥
কবুতরের মূল্যরে লইব শালা গরদান চাপি ধরি *
তোর বাপে না পারিবে আমীর সাধু বলেরে ॥
তেলৈন্যা নগর সাগরে ডুবাব আমিরে *
সাত ভাইয়ে ক্রোধ করি বাড়িতে আসিয়া ॥
সত্তর হাজার সৈন্য লৈছেরে সাজন করিয়া *
প্রথমে আসিয়ারে তারা কি কাজ করিল ॥
চৌদ্দ কাহন ডিঙারে সাধুর কুলেতে তুলিল *

[আমীর সাধুর সাথে ভেলুয়ার সাত ভাইয়ের যুদ্ধ]

তারপরে আমীর সাধু কি কাম করিল ॥
কুলেতে নামিয়ারে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল *
ক্রোধ করি আমীর সাধু লাগিলরে গর্জিতে ॥
তেলৈন্যা নগরে হৈছেরে কান্দনের রোল *
সাত ভাইয়ে মারে কামান পূর্ব দিয়া চলে ॥
শতে শতে লোক মরে পড়ে দলে *
আমীর সাধু মারে কামান পশ্চিম দিয়া ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিনরে চিনা নাহি যায় *
তীর গোলা কামান আদি মারে লাখে লাখে ॥
বসুমতি কম্পেরে জানো গোর্জের ধমকে *
কামানের আওয়াজ যেন সিংহের গর্জন ॥
দুই দিকে লোক জনরে মরে ঘন ঘন *
কেহ বলে আল্লাহ আল্লাহ কালেমা পড়ে বৈয়া ॥
কেহ বলে আল্লাহর মুল্লুক যাবেরে তল হৈয়া *
কার হস্ত যায়রে কাটা কার পদ নাই ॥
কত জন মরার মধ্যেরে রহিছে লুকাই *
যুদ্ধের ধমকে জানো কান্দে বসুমতি ॥
আমীর সাধু বলেরে আল্লাহ হবে কোন গতি *
মাতা পিতা নাই মোর নাইরে সৈন্যগণ ॥
তেলৈন্যা নগরে আসিরে হইল মরণ *
এই রূপে সাত দিনরে গুজারিয়া গেল ॥
আমীর সাধুর সৈন্য সবরে রণে ভঙ্গ দিল *
তারপরে সাত ভাইয়ে আমীর সাধুরে ধরি ॥
হাতে পায়ে দিল জানোরে জেলখানার বেড়ী *

www.pathagar.com

ধাক্কার উপরে ধাক্কারে মারে জনে জন ॥
আমীর সাধুর দুঃখ দেখিরে বিদরে জীবন *
অকান্দনে কান্দেরে সাধু চোখের পড়ে পানি ॥
কোথায় রৈছ পিতা মোররে দুর্লভ জননী *
এই সব দুঃখরে যদি আমার বাপ দেখিত ॥
তেলৈন্যা নগর জানোরে সাগর ডুবাইত *
আমীর সাধুয়ে কান্দেরে করি হায়রে হায় ॥
মারি ধরি সাত ভাইয়ে বাড়িতে লইয়ারে যায় *
আমীর সাধুর দুঃখ দেখিরে কান্দে সর্বজন ॥
মৎস্য আদি জীব জন্তুরে পশু পক্ষীগণ *
মারি মারি সাত ভাইয়ে বাড়িতে আনিল ॥
সাতমণি পাথর সাধুর বুকের উপর দিল *
পাথরের ভারে আমীর সাধুর সীনা হয় চুর ॥
কান্দি কান্দি কয়রে সাধু আল্লাহর হুজুর *
সাধুর কান্দন শুনিয়ারে ভেলুয়ার জননী ॥
লাঠি হাতে লই বুড়িরে চলিছে তখনি *
ধীরে ধীরে যাইরে বুড়ি নিরক্ষিয়া চায় ॥
সোনার বরণ তনুরে সাধুর ভুমিতে গড়ায় *
তার কাছে যাইরে বুড়ি পুছিল খবর ॥
কার পুত্র বাপুরে তোমার কোন দেশে ঘর *
আমীর সাধু বলেরে বুড়ি শুনরে খবর ॥
মানিক ধরের পুত্র আমিরে আমীর সওদাগর *
আমার মায়ের নামরে জানো সোনাই সুন্দর ॥
আমার রাজ্যের নামরে জানো শ্যামলা বন্দর *
এই কথা শুনিরে বুড়ি কান্দিয়া উঠিল ॥
বুকের পাষাণ ফেলিয়ারে জড়াইয়া ধরিল *
ভৈনপুত্র ভৈনপুত্র বলিরে বুড়ি বন্ধন খুলিয়া ॥
ঘরেতে আসিলরে বুড়ি আমীর সাধুরে লইয়া *
সাত ভাইয়ে দেখিয়ারে তারা গর্জিয়া উঠিল ॥
দুষ্ট সওদাগরে মায় কি লাগিরে আনিল *
মায় বলে শুনরে যাদু আমার বচন ॥
এই বেটা হয় জানরে আমার ভৈনের নন্দন *
তোমরা সকল ভাই শুন মন দিয়া ॥
না চিনিরে যুদ্ধ করিরে আনিছ ধরিয়া *
আমার এক ভৈন আছেরে জানো সোনাইরে সুন্দর ॥
মায়ে বাপে দিছেরে বিয়া শ্যামলা বন্দর *
ভৈনের সঙ্গেরে আমি করিয়াছি সত্য পণ ॥

www.pathagar.com

বেটি হইলে বিয়া দিবরে মোর বেটার সদন *
আমার ঘরে হইলে বেটি বিয়া দিমু দানে ॥
দুই ভৈনের ধর্মের কথারে আল্লাহতালা জানে *
ভেলুয়ার মায় যখনরে এ কথা কহিল ॥
সাত ভাইয়ে গোশ্বারে সব পানি হইয়া গেল *
সোনা রূপার পানি দিয়ারে গোসল করাইল ॥
তারপর দাসী সবরে কাপড় আনি দিল *
রেশমী কাপড় দিছেরে আনি করিবারে সাজ ॥
মাথায় আনি দিলরে সাধুর হাজার টাকার তাজ *
গায়ে দিল পশমী কোট পিন্দনের চিকন ধুতি ॥
পায়ের মাঝে দিছেরে আনি ভালো চিনার জুতি *
সব লোক দেখি সাধুরে বলে হায়রে হায় ॥
ভেলুয়ার যোগ্য মতোরে বর বিধাতা মিলায় *
এই মতো কতদিনরে গুজারিয়া যায় ॥
ভেলুয়ার বিয়ার কথারে সকলে চালায় *
কেহ বলে সোনা রূপারে কিছু নাহি লিব ॥
কেহ বলে এমন জামাইরে দানে বিয়া দিব *
কোন জনে উঠি বলেরে লক্ষ টাকা দিয়া ॥
এমন জামাই না পাইবারে ভেলুয়ার লাগিয়া *
আমীর সাধুর উপরে জানো সবে রাজী হৈল ॥
শুভদিন দেখিরে সবে তারিখ করিল *

[ভেলুয়া ও আমীর সওদাগরের বিবাহের বয়ান]

শুভ দিনে শুভক্ষণে বহু ধুমধাম সনে
করে সবে বিয়ার আয়োজন ॥
জেয়াফত করি তবে লক্ষ লক্ষ নর সবে
করাইল আহার ভোজন ॥
কত স্থানে কত মতে বাদ্য বাজে নানা মতে
নাচে কত নাটুয়া সুন্দরী ॥
মণিমুক্তা অলংকারে আর রত্ন পাঠেশ্বরে
সাজাইল ভেলুয়া সুন্দরী ॥
রাজ বেশ পরাইয়া রত্ন মুকুট শিরে দিয়া
সাজাইল আমীর সওদাগর ॥
দুলা দুলহীন করি রাজি আনিয়া শরার কাজি
পড়াইল খুৎবা বিবাহের ॥
খোৎবা পড়াইল পরে বর-কন্যা একত্র করে
মিলিলেক যেন রবি শশী ॥

www.pathagar.com

চোখে চোখে দেখা হৈল প্রেম আলিঙ্গন দিল
সুখে তথা গুজারিল নিশি ॥

ভেলুয়ার বিয়ারে জানো ভাই যদি হৈল ॥
আমীর সাধুর ডিঙারে সাত ভাইয়ে তৈয়ার করে দিল *
নানা দ্রব্য দিলরে জানো টাকা পয়সা ধন ॥
ভেলুয়ারে লই দেশেরে সাধু করিল গমন *
চপলঅ চঞ্চল ডিঙারে হুঙ্কারিয়া যায় ॥
একদিনে আসিরে সাধু শ্যামলা বন্দর পায় *
ঘাটের মাঝে আসিরে সাধু মারিছে কামান ॥
ঠাটা বিজলী হেনরে ভাঙিল আসমান *
কামান শুনিয়ারে সব নদীর কূলে আসি ॥
আমীর সাধুরে দেখিরে সব লোক হইয়াছে খুশি *
মাতাপিতা আসিলরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
আমীর সাধু কান্দন করেরে চরণে পড়িয়া *
মা বাপের চরণে পড়িরে বহুত কান্দিল ॥
ভেলুয়ারে লই সবে ঘরে চলি গেল *
এইরূপে আমীর সাধু রহে কত দিন ॥
আমীরের উপরে আল্লাহ ফিরায়রে কু-দিন *
আমীর সাধুর এক ভৈনের নাম বিবলঅ সুন্দরী ॥
বিয়া নাহি হয় জানোরে আছে একেশ্বরী *
রূপে গুণে বিবলারে অতি চমৎকার ॥
দিবানিশি ঘরে বসিরে ভাবে করতায় *
শাশুড়ি ননদী জানোরে যার ঘরে আছে ॥
কোনোমতে সুখ নাইরে সেই বধূর কাছে *
তারপরে কি হৈলরে শুন গুণিগণ ॥
আমীর সাধুর মায়ে ভৈনে করেন্ত গর্জন *
আমীর সাধুর ভৈনে বলে শুন সাধু ভাই ॥
সব কথা পাসরিয়াছরে ভেলুয়ারে পাই *
বধূ লইয়া থাকোরে সাধু পালঙ্গে বসিয়া ॥
নানান খুশি করোরে সাধু ভেলুয়ারে লইয়া *
ঘাটে রৈছে ঘাটের ডিঙ্গারে সাধু ভাই নষ্ট হইয়া যায় ॥
দাড়ি মাঝি কত আছেরে তারা বইসা মাহিনা খায় *
তারপরে মা জননীরে বলে আমীর সওদাগর ॥
ঘরে আসি রইলে বসিরে ভেলুয়ার গোচর *
হাউলার পুত্র নহে সাধু হাল চাষী খাইতা ॥
জেলের ছেলে নওরে তুমি জাল যে বসাইতা *
সুন্দর বধূ পাইয়ারে সাধু বাণিজ্য পাসরিলা ॥

www.pathagar.com

সওদাগরের পুত্র হইরে ঘরে বসি রইলা *
এই কথা শুনিরে আমীর সাধু কহিতে লাগিল ॥
মাতা ভগ্নির কাছেরে আমীর সাধু জবাব ভালা দিল *
লজ্জা নাহি দিবারে মাতা কহি বারে বারে ॥
আমি কালি চলি যাইমুরে বাণিজ্য কামাইবারে *
এ কথা কহিয়া সাধু ভেলুয়ার কাছে যাই ॥
বাণিজ্যের কথা পাসরিলরে সুন্দর কন্যা পাই *
ফজরে উঠিয়ারে বিবলা নিরক্ষিয়া চায় ॥
হাতেতে লইয়ারে সাধু ভেলুয়ার পানের খিলি খায় *
এমত দেখিয়ারে বিবলার বাড়িল বিদ্বেষ ॥
আপনে ছিঁড়িয়া ফেলেরে আপন মাথার কেশ *
আমীর সাধু বলেরে ভৈন খোদার কসম লাগে ॥
উজানি নগরে যাইমুরে কালি ফজরের আগে *
এই কথা কহিয়ারে সাধু ভেলুয়ার দিকে চায় ॥
সুন্দর মুখ দেখিরে সাধু বাণিজ্য পাসরিয়া যায় *
তারপরে ফজরেতে সাধুরে দেখিয়া ॥
গালাগালি করেবে বিবলা বহুত গর্জিয়া *
বধূর ভারুয়ারে ভাই মোর ভারুয়া আওরতের ॥
সুন্দর কন্যা পাইয়ারে বসি রহিছ ঘরেতে *
এই কথা শুনিরে আমীর সাধু ভেলুয়ারে কয় ॥
বাণিজ্য কামাইবার যাইবরে কহিলাম নিশ্চয় *
মোর কপালে নাহি তোমায় রূপ চাহিতাম বসিয়া ॥
মা ভৈনের কটু কথায়রে আমার ফাটি যায়রে হিয়া *
মায়ের কথারে আমি শিরে তুলি লইলুম ॥
বিবলার কথায়রে সুন্দর কন্যা ঘরের বাহির হইলুম *
এই কথা সুন্দররে কন্যা শুনিল যখন ॥
আমীর সাধুর পায়েরে পড়ি জুড়িল কান্দন *

[আমীর সাধুর বাণিজ্যের কথা শুনিয়া ভেলুয়ার বিলাপ]

বাণিজ্যের কথা শুনিরে ভেলুয়া কান্দিয়া উঠিল ॥
না যাইও না যাইও বলিরে সুন্দর কন্যা চরণে পড়িল *
না যাইও না যাইও রে সাধু বোল্লাম তোমারে ॥
হাতের বাজু বেচিয়া সাধু খাবামু তোমারে *
না যাইও না যাইও রে সাধু কহি বারে বার ॥
তোমারে খাবামু বেচিয়া সপ্ত ভরির হার *
না যাইও না যাইও রে সাধু আমি করি মানা ॥
তোমারে খাবামু বেচিয়ারে গলার সোনার দানা *
না যাইও না যাইও রে সাধু মোর প্রাণধন ॥

www.pathagar.com

তোমারে খাবামু বেচিয়ারে হস্তের কাঙ্গন *
না যাইও না যাইও রে সাধু আমার আশকের পাগল ॥
তোমারে খাবামু বেচিয়া কানের ছিকল *
না যাইও না যাইও রে সাধু জীবনের ধড় ॥
তোমারে খাবামু বেচি সোনার চাদর *
না যাইও না যাইও সাধু তোমার পায়ে ধরি ॥
তোমারে খাবামু বেচি পিন্দনের শাড়ি *
না যাইও না যাইও রে সাধু আমারে ফেলিয়া ॥
ঘরে ঘরে মাঙ্গি খামু তোমারে লইয়া *
না যাইও না যাইও রে সাধু আমি তোমায় বলি ॥
তোমারে খাবামু বেচিরে গলার হাসলি *
না যাইও না যাইও রে সাধু শুন সমাচার ॥
তোমারে খাবামু বেচি অষ্ট অলংকার *
তুমি মোর প্রাণধন জীবনের জীবন ॥
মোরে ফেলি বাণিজ্যেতে না যাইওরে কখন *
তুমি যদি যাওরে আমারে ফেলিয়া ॥
তোমারে না দেখি আমি মরিব কান্দিয়া *
দূর দেশে যাবে তুমি বাণিজ্য করিতে ॥
আমারে সঁপিয়া তুমি যাবে কার হাতে *
শাশুড়ি ননদী ঘরে অগ্নি বরাবর ॥
জ্বালাইয়া মারিবে মোরে কাষ্ঠের আকার *
এই মত ভেলুয়ায় যে অনেক কান্দিল ॥
বিবলার কথায়রে সাধু ব্যাকুল হইল *
তারপরে আমীর সাধুয়ে কি কাজ করিল ॥
মা জননীর কাছেরে সাধু যাইয়া পৌছিল *
যাও বলো মোরে মাগো বোল্লাম তোমারে মুই ॥
বিদায় দেহ মোরে মাগো বাণিজ্য কামাই *
ঘরে আছে সুন্দর ভেলুয়ারে মা যতনে চাহিবা ॥
কোন অপরাধ কৈল্যেরে আপনে ক্ষমিবা *
না দিও গোবর ফেলিতে কন্যার গায়ে দাগ লাগিবে ॥
না দিও উঠান কুড়াইতেরে কন্যার পায়ে ধুলা পড়িবে *
মরিচ বাটিতে না দিওরে ভেলুয়ার হাত জ্বলিবে ॥
না দিও পানি আনিতেরে কন্যার গায়ে ব্যথা হইবে *
তারপরে আমীর সাধুয়ে করিছে গমন ॥
বাপের নিকটে যাইয়া দিছে দরশন *
শুন শুন পিতা মোর শুন নিবেদন ॥
কালুকা বাণিজ্যে আমি করিব গমন *

www.pathagar.com

সেবিতে না পারিলাম বাপের চরণ ॥
বাণিজ্যে যাইতে হৈল অদৃষ্টের লিখন *
পিতার চরণে মোর এই নিবেদন ॥
ভেলুয়ারে জানিবা তোমার দুহিতার মতন *
একথা কহিরে সাধু করিছে গমন ॥
গৌরলধরের বাড়ি যাইয়ারে দিছে দরশন *
গৌরলধল গৌরলধর বলিরে যখন ডাকিল ॥
ঘরে থাকি গৌরলধর জওয়াব ভালা দিল *
তারপরে গৌরলধর নিরক্ষিয়া চায় ॥
আমীর সাধু দেখিয়ে তবে বলে হায়রে হায় *
শীঘ্রগতি চলি গেলেরে আমীর গোচর ॥
যাইয়া সালাম করি পুছিল খবর *
আমীর সাধু বলে শুনরে কহি যে তোমারে ॥
কালুকা ফজরে যাইমুরে উজানি নগরে *
এই কথা কহিরে আমীর সাধু করিছে গমন ॥
ভেলুয়ার কাছেরে যাই দিল দরশন *
শুন সুন্দরী ভেলুয়া কহি যে তোমারে ॥
হাসি মুখে বিদায় দেওরে বাণিজ্যে যাইবারে *
বিধির নির্বন্ধ আমি কিরূপে খণ্ডাই ॥
তোমার হাতের রন্ধন কন্যা না খাইলাম আর *
ভেলুয়ায় বলেরে সাধু কহি যে তোমারে ॥
কোথায় পামু চাউল ডাউল বলয়ে আমারে *
বিয়া করি আনিয়াছরে মোরে সাত দিন হৈল ॥
শাশুড়ি ননদী মোরে রন্ধনে না দিল *
তারপরে সুন্দররে কন্যা কি কাজ করিল ॥
বিয়ার দিনের কুলার চাউল সব বাছিয়া লইল *
বাগানেতে যাইয়ারে কন্যা নিরক্ষিয়া চায় ॥
খোরমা আর খেজুর সব দেখিবারে পায় *
বাদাম কিচমিচ আর ডাব নারিকেলের জল ॥
একে একে নানান দ্রব্যরে লইয়ে সকল *
সেই সব তৈয়ার করিবারে বদনা এক আনি ॥
তারমধ্যে রাখে জানরে ডাব নারিকেলের পানি *
তারপরে ভেলুয়ায়রে চুলা এক করি ॥
ক্ষীরসা রান্ধিল জানরে ভেলুয়া সুন্দরী *
বাসনেতে করিয়া ভেলুয়া ক্ষীরসা আনিল ॥
আমীর সাধু দেখিয়ে তবে বলিতে লাগিল *
আমীর সাধু বলেরে কন্যা কহি যে তোমারে ॥

www.pathagar.com

কিবা করিয়াছ রন্ধন আনহ হুজুরে *
তারপর ভেলুয়ায় সামনে আনিল ॥
একত্রে বসিয়ারে খানা দুই জনে খাইল *
খানা খান দুইজন খোশালিত মন ॥
হাস সাফ করাইয়ারে ভেলুয়ায় দিছে ততক্ষণ *
তারপরে ভেলুয়ায় তামাক সাজাইল ॥
আগুন আনিতেরে সাধু হুকুম করিল *
না পারিব বলিরে যখন ভেলুয়ায় কহিল ॥
হুক্কার নলের বাড়ি সাধু খেঁচিয়া মারিল *
নলের বাড়ি খাইয়ারে ভেলুয়ায় পড়ে বেহুশ হৈয়া ॥
পালঙ্গের উপরেরে জানো রহিছে বেহুশ শুইয়া *
বেহুশে রাখিয়ারে সাধু ফজরে উঠিয়া ॥
ডিঙ্গার মাঝে চলি গেলরে আল্লাকে ভাবিয়া *
তারপরে আমীর সাধু ডিঙ্গাতে উঠিল ॥
ছাড়ো ছাড়ো বলিরে সাধু কহিতে লাগিল *
গৌরলধর মাঝিয়ে বলেরে আমীর সওদাগর ॥
কি কি সারা দিছেরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর *
আমীর সাধু বলেরে আমার কোনো সাধ নাই ॥
ডিঙ্গা ছাড়ি দেওরে মাঝি বাণিজ্যেতে যাই *
মাঝি উঠিয়া বলে লাখেরে আমীর সওদাগর ॥
বেজার করিয়াছ বুঝিরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর *
ভেলুয়ার হাতে বুঝি না দিছ পান ফুল ॥
তেকারণে সকলের দিশা হবে ভুল *
এই কথা শুনিরে আমীর সাধু কিছু না কহিল ॥
দাড়ি মাঝি লইয়ারে সাধু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল *
সারেঙ্গ সুকানি যায়রে টেঙলের বরাবর ॥
বদর শুমারী কৈরে তুলেরে জাহাজের লঙ্গর *
সারা রাতি চালায় ডিঙ্গারে আমীর সাধু করি বলাবলি ॥
হীন মোয়াজ্জম বহেরে আবার ঘাটে আইল চলি *
ফজরে উঠিরে দাড়ি মাঝি দৃষ্টি করি চায় ॥
দিশা ভুল হইয়া তারা চিহ্ন নাহি পায় *
ডাকাডাকি করিরে দাড়ি মাঝি জিজ্ঞাসা করিল ॥
কোন দেশে আইলামরে মা বৈন আমাদেরে বল *
স্ত্রীরে ডাকেরে মা মায়েরে ডাকে নানী ॥
কোন দেশে আইলামরে কহ তবে শুনি *
এই শুনিরে বধূয়া হাসে খল খল ॥
আমীর সাধুর দাড়ি মাঝি তারা হইছে পাগল *

www.pathagar.com

গৌরলধর বলেরে আমার আমীর সওদাগর ॥
ঘাটের ডিঙ্গা ঘাটে আইলরে শুনরে খবর *
এই কথা শুনিরে আমীর নিরক্ষিয়া চায় ॥
ঘাটের মাঝে দেখিরে ডিঙ্গা বহুত লজ্জা পায় *
গৌরলধর মাঝিয়ে বলেরে কহি যে তোমারে ॥
ভেলুয়ার সারা আনরে সাধু ডিঙ্গার মাঝারে *
এই কথা শুনিরে আমীর সাধু করিছে গমন ॥
ভেলুয়ার কাছে যাইয়ারে সাধু দিছে দরশন *
ভেলুয়ায় দেখিরে সাধু হাসিতে লাগিল ॥
কত টাকা লাভ পাইছরে আমার কাছে বল *
আমীর সাধু বলেরে সুন্দর কন্যা বলি যে তোমারে ॥
হাসিমুখে বিদায় দেওরে যাই বাণিজ্য কামাইবারে *
এই কথা শুনিরে ভেলুয়া হাসিতে লাগিল ॥
পান গুয়া দিয়ারে সাধুরে বিদায় করিল *
আমীর সাধু বলেরে আমার গৌরলধর মাঝি ॥
শীঘ্র করি ডিঙ্গা ছাড়রে ভেলুয়ারে করেছি রাজি *
সারেঙ্গ সুকানীল টেণ্ডলের বরাবর ॥
বদরগুমারী করি তুলেরে জাহাজের লঙ্গর *
ছাড়ো ছাড়ো বলিরে ডিঙ্গা যখন দিছেরে ছাড়ি ॥
ছয়মাস থাকি শুনা যায়রে পালের কড়মড়ি *
এমন চালান চালায়রে ডিঙ্গা আল্লার কেরামত ॥
এক ঘণ্টায় চলি যায়রে তিনদিনের পথ *
ঘরে থাকি ভেলুয়ায় কি কাজ করিল ॥
আমীর সাধুরে না দেখিরে ভেলুয়ায় কান্দিয়া উঠিল *
বিয়া করি সাত দিনরে সাধু ঘরে না রহিলা ॥
আমারে ছাড়িয়ারে সাধু বাণিজ্যেতে গেলা *
কোন দেশেতে গেলারে সাধু না দেখিলাম মুখ ॥
অভাগিনীর মনেরে সাধু রহিছে এই দুঃখ *
আমারে ছাড়িয়ারে গেলা মাছলী বন্দর ॥
মলিন না হইছেরে আমার হলুদের চাদর *
অকান্দনে কান্দেরে ভেলুয়া পালঙ্গে বসিয়া ॥
দেখা দাও প্রাণের সাধুরে আমারে আসিয়া *
হাজার টাকার শিন্নী দিমুরে আল্লাহতালার নামে ॥
আর হাজার টাকার শিন্নী দিমুরে রাসুলের নামে *
আর হাজার টাকার শিন্নী দিমুরে গাজি কালুর নামে ॥
আমীর সাধুরে আনি দাওরে আমার মোকামে *
কালুশা উঠিয়া বলেরে গাজি ভাই ফকির ॥

www.pathagar.com

ভেলুয়ার শিন্নী খাইয়া যাও করিয়া শিগ্যির *
তোমার নামে ভেলুয়ারে ও ভাই শিন্নী মানতা করে ॥
না খাইলে শিন্নীরে গদা মারিব মাথার উপরে *
গদার কথা শুনিরে গাজি ফকির মনেতে ভরিয়া ॥
বিহঙ্গম পক্ষীরে আনে ডাক ভালা দিয়া *
ডাক শুনি বিহঙ্গম পক্ষী শীঘ্র চলি আইল ॥
কি কারণে ডাকরে গাজি আমার কাছে বল *
গাজিয়ে উঠিয়ে বলেরে পক্ষী শুনরে খবর ॥
আমীর সাধুরে লই যাওরে ভেলুয়ার গোচর *
তারপরে কহি পক্ষীরে শুন সমাচার ॥
ফজরে আনি দিবারে সাধুরে ডিঙ্গার মাঝার *
এই কথা শুনিরে পক্ষী করিল গমন ॥
আমীর সাধুর কাছেরে পক্ষী দিল দরশন *
পক্ষীয়ে যাইয়ারে বলে সাধু শোন সমাচার ॥
শিন্নী মানতা করিয়াছে ভেলুয়ায় তোমার *
রাইতে ২ দেখা করো ভেলুয়ার সাথে ॥
ফজরে আনিয়া দিমুরে আপনার ডিঙ্গাতে *
আমীর সাধু বলেরে পক্ষী কিরূপে যাইব ॥
পক্ষীয়ে বলেন্তরে সাধু পিঠে করি নিব *
এক ডাক দুই ডাকরে সাধু দিমু তিন ডাক ॥
তিন ডাকে চলিয়া আসিবা আমার সাক্ষাৎ *
তিন ডাকের মধ্যেরে যদি না আসিবা তুমি ॥
তোমারে রাখিয়ারে সাধু চলি যাইমু আমি *
এই কথা শুনিয়ারে আমীর সাধু সওয়ার যে হইল ॥
পলকের ভিতরে তারে ভেলুয়ার কাছে নিল *
ভেলুয়া ভেলুয়া বলিরে সাধু যখন দিছে ডাক ॥
কোঠার ভিতরে থাকিরে ভেলুয়া দিলেন্ত জওয়াব *
কেবা আসি ডাকরে তুমি নিজ নাম ধরি ॥
কার নাতি কার পুতিরে আমি চিনিতে না পারি *
আমীর সাধু উঠি বলেরে কন্যা না চিনিলা মোরে ॥
পঞ্চকুলে বিয়া করিরে আনছি তোমারে *
মাণিক সাধুর পুত্ররে আমি আমীর সওদাগর ॥
নিঃসন্দেহে খুলহ দ্বার নাহি করো ডর *
ভেলুয়ায় উঠি বলেরে মিথ্যা বলো তুমি ॥
বাণিজ্যেতে গেছেরে মোর দুর্ল্লভ সোওয়ামী *
তুমি যদি হবে স্বামী চিহ্ন দেহ মোরে ॥
হীরার অঙ্গুরী আছেরে মোর স্বামীর হস্তের উপরে *

www.pathagar.com

সেই অঙ্গুরী দাওরে সাধু কোঠার মাঝার ॥
তবে যে খুলিব আমি কোঠার দুয়ার *
হীরার অঙ্গুরীরে সাধু কোঠার মাঝে দিল ॥
অঙ্গুরী পাইরে ভেলুয়ায় কেওয়াড় খুলিল *
কোঠার মাঝে গেলরে জানো আমীর সওদাগর ॥
সাধুরে বৈঠক দিলরে কন্যা পালঙ্গ উপর *
ভেলুয়ারে দেখিরে তবে মন শান্ত হইল ॥
চরণে পড়িয়ারে ভেলুয়া সালাম করিল *
আমীর সাধু বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ॥
রাইতে ২ চলি যাইমুরে ডিঙ্গার উপর *
এই কথা শুনিরে ভেলুয়া খানা খাওয়াইল ॥
তারপরে দুইজনে শয়ন করিল *
কামেতে বিভোর হইছেরে তারা দুইজন ॥
তারপরে নিদ্রা গেলরে হইয়া অচেতন *
হেনকালে বিহঙ্গম তিন ডাক দিল ॥
ডাক শুনি আমীর সাধু দৌড় ভালা দিল *
তাড়াতাড়ি চলি গেলরে পক্ষীর ডাক শুনি ॥
ভেলুয়ার কোঠার কেওয়ার না বান্ধিয়াছে পুনি *
ভেলুয়া সুন্দরী ছিল নিদ্রাতে বিভোর ॥
আমীর সাধু যাইবার কালেরে না পাইছে খবর *
আমীর সাধু লই পক্ষী করিছে গমন ॥
ডিঙ্গাতে লিয়া রাখিলরে সাধু মহাজন *
আমীর সাধুর কথারে এবে হউক নিবারণ ॥
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন দিয়া মন *
ভেলুয়া সুন্দরী জানরে নিদ্রা মাঝে ছিল ॥
ফজরে উঠিয়ারে বিবলায় নিরক্ষিয়া চাহিল *
কেওয়াড় খোলা দেখিরে বিবলায় করে হায়রে হায় ॥
মা বাপেরে বোলাই আনিরে সবাকে দেখায় *
বাণিজ্যেতে গেল ভাই মোর সাত দিন হৈল ॥
সুন্দরী সতী ভেলুয়ায়রে কোন রসিক পাইল *
সারা রাতি মজা করে রসিক নাগর পাই ॥
তেকারণে ভেলুয়ার হোশ গোশ নাই *
তারপরে ভেলুয়ায় চেতন পাইয়া ॥
কান্দিয়া উঠিলরে সতী কন্যা একথা শুনিয়া *
কোরান দাও কেতাব দেওরে আমি খোদার ঘর ছুঁই ॥
এক স্বামী বিনে আমি না জানিনু দুই *
ভেলুয়ায় বলেন তোমরা শুন সর্বজন ॥

www.pathagar.com

রাত্রি কালে আসি ছিলরে মোর প্রাণধন *
এই কথা শুনিয়ারে সবে হাসিয়া উঠিল ॥
ডিঙ্গা লই আমীর সাধুরে কিরূপে আসিল *
কেহনা করিল বিশ্বাস একথা শুনিয়া ॥
ঘরের বাহির করিলরে তারা সকলে মিলিয়া *
কেহ বলে ভেলুয়ারে নানান শাস্তি করো ॥
কোনজনে বলেরে গলে দড়ি দিয়া মরো *
কেহ কেহ বলে মাররে যেই দেশে নাই সাক্ষী ॥
বিবলায় বলে আমি দাসী বানাই রাখি *
গোবর ফেলিতে যাওরে ভেলুয়া গোয়াইলের ভিতর ॥
উঠান কুড়াই খাইবারে দুষ্ট ভেলুয়া শ্যামল বন্দর *
কান্দিতে কান্দিতেরে ভেলুয়া গোয়াইল ঘরে গেল ॥
হাজার গরুর গোবররে ভেলুয়া ফেলিতে লাগিল *
গরুর উপরে তেলুয়া শাপ দিল জান ॥
যেই গরু যেইখানে গেল রহে সেই স্থানে *
উঠানরে ভেলুয়ায় কুড়াইতে লাগিল ॥
সাড়ে তিন সের মরিচরে তারপর বাটিবারে দিল *
অকান্দনে কান্দেরে ভেলুয়ায় মরিচ দেখিয়া ॥
সাড়ে তিন সের মরিচ বাটেরে ভেলুয়ায় চোখেরে পানি দিয়া *
তারপরে হুকুম করেরে ভেলুয়ার ঠাঁই ॥
কলসী ভরি আনরে ভেলুয়া যমুনাতে যাই *
এই কথা শুনিয়া ভেলুয়া উঠিছে কান্দিয়া ॥
কার সাথে যাইমুরে আমি পানির লাগিয়া *
কলসীর পানিরে ভেলুয়ায় ফেলাইল লিয়া ॥
কান্দি কান্দি গেলরে সুন্দর কন্যা জলের লাগিয়া *
ভেলুয়ার আগে আগেরে বিবলায় কোন কাজ করে ॥
ভেলুয়ার সাথে যাইতে মানা করে ঘরে ঘরে *
কলসী লইয়ারে ভেলুয়ায় আস্তে আস্তে যায় ॥
প্রতি ঘরে যাইরে পুতের বধূ ডাকি ডাকি চায় *
এক বধূ বলেরে আমি যাইতে না পারি ॥
আর বধূ বলেরে আমার কাম আছে ভারী *
কোন বধূ বলে আর পানি আছে ঘরে ॥
আর কেহ বলে আমার কাকাইল ব্যথা করে *
একাকিনী হইরে সুন্দর কন্যা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
যমুনার ঘাটে গেছেরে কন্যা জলের লাগিয়া *
যমুনা দেখিয়া কন্যা কান্দিয়া উঠিল ॥
আমারে ছাড়িয়ারে সাধু বুঝি এই পথে গেল *

www.pathagar.com

[ভেলুয়ার বিলাপ]
কোন দেশে গেলারে সাধু সঙ্গে নাও মোরে ॥
পানির কলসী ভরিয়া কি মতে যাইমু ঘরে *
মা বাপের ঘরেতে আমি জল নাহি আনি ॥
কেহনা বুঝিবে দুঃখ আমার নাহিক জননী *
বাণিজ্যেতে গেলা সাধুরে মোরে করে একেশ্বরী ॥
শাশুড়ি ননদী মোররে হৈল কাল বৈরী *
সাত ভাইয়ের ভগ্নি আমীরে মাটিতে না পড়ে পাও ॥
সোনালি পোষাকে মাগরে ঢাকিয়া রাখিছে গাও *
বাপে শত দাসী দিছেরে মোরে সেবার কারণ ॥
বিবলার দাসী হইলামরে ছিল নির্বন্ধের লিখন *
যেই দেহ ছিলরে মোর পালঙ্গ উপরে ॥
সেই অঙ্গে গেলাম আজিরে গোয়াইলের ঘর *
ধুলা বালু যেই অঙ্গেতে না লাগে কখন ॥
গোবর লাগিল আসিরে সব বদনে বদন *
চন্দ্র সূর্য যেই অঙ্গ না দেখিছে কখন ॥
ননদী পাঠাইল আজি জলের কারণ *
কোথা গেলা আমীর সাধুরে আসি দেখো শীঘ্র করি ॥
জলের জন্য যমুনায় আইছেরে তোমার ভেলুয়া সুন্দরী *
এইরূপে বিলাপি ভেলুয়ারে বহুত কান্দিল ॥
কলসী লইয়া পরেরে জলেতে নামিল *
কলসী ভরিয়া কন্যা রাখিল কূলেতে ॥
জলেতে নামিল কন্যা গোসল করিতে *
কতেক কহিরে ভেলুয়ার চুলের বাখান ॥
মাথা ভরা চুল জানরে পায়ের সমান *
চুলের ভারেতে ভেলুয়া উঠিতে না পারে ॥
পানিয়ে ধরিয়া টানেরে ভেলুয়ার যমুনার ধারে *
হেনকালে ভেলুয়ায়রে ডাকিতে লাগিল ॥
ভেলুয়ার ডাক শুনিরে কত পোলা হাজির হইল *
কি কারণে ডাকরে ভেলুয়া কহ সে খবর ॥
আমারে টানিয়া তুলো বাপু কূলের উপর *
আমার সাধু আসিলরে শুনো কই পোলা ॥
আম জাম দিমুরে জানো আর কলা মূলা *
এই কথা শুনিরে পোলা কি কাজ করিল ॥
গাছের ডাইল আনিরে ভেলুয়ারে টানিয়া তুলিল *
কূলেতে উঠিল জানো ভেলুয়া সুন্দরী ॥
চুল শুকাইবারে কন্যা বৈসে একেশ্বকরী *

www.pathagar.com

[ভেলুয়ারে লুটিয়া নিবার বয়ান]
ভেলুয়ার কথারে এবে হইক নিবারণ ॥
ভোলা সওদাগরের কথারে শুনো গুণিগণ *
ভোলা গিয়াছিল জানরে মাছলী বন্দরে ॥
সওদাগরী করিরে ভোলা ফিরে আইসে ঘর *
হাটঘাট নালা নদীরে সব আইল দিয়া ॥
আমীর সাধুর ঘাটেরে ডিঙ্গা উতারিল গিয়া *
সেই ঘাটে আসিরে ভোলা দৃষ্টি করি চায় ॥
আকাশের চন্দ্র যেনরে ঘাটে দেখা যায় *
এক চন্দ্র উদয় জানিরে পূর্ব পশ্চিম ধারে ॥
আজ কেন দেখিরে চন্দ্র দরিয়ার কিনারে *
ঢালিল লঙ্গর ভোলা আমীর সাধুর ঘাটেরে ॥
কূলেতে উঠিল ভোলা বলাবলি করে *
তারপরে ভোলা সাধুরে করিছে গমন ॥
ভেলুয়ার কাছেরে ভোলা দিল দরশন *
সেই স্থানে যাইরে ভোলা দৃষ্টি করি চায় ॥
স্বর্গ বিদ্যা হুর কিবা ভোলা দেখিবারে পায় *
ভেলুয়ার নিকটে ভোলা পুছিল খবর ॥
কার বেটি কার বধূরে তোমার কোন দেশে ঘর *
ভেলুয়ায় বলেন শুনো সেইত খবর ॥
মোর স্বামীর নাম জানোরে আমীর সওদাগর *
আমার বাপের রাজ্যের নাম জানো তৈলৈন্যা নগর ॥
বাবাজির নামরে জানো রাজা মনোহর *
মা জননীর নামরে জানো ময়না সুন্দরী ॥
আমি অভাগিনীর নামরে জানো ভেলুয়া সুন্দরী *
একে একে তোমার কাছেরে আমি কহিলাম খবর ॥
মায়ে বাপে দিছেরে বিবাহ মোরে শ্যামলা বন্দর *
এই কথা শুনিয়া ভোলা কহিল তখন ॥
দেখিলাম আমীর সাধুররে হইয়াছে মরণ *
তারপরে কি হইলরে ভেলুয়ায় শুনহে খবর ॥
সবে মিলে দিলাম মাটিরে মাছলী বন্দর *
ভেলুয়ায় বলেরে আমি জানি সে খবর ॥
মলিন হইতরে তবে আমার সিথির সিন্দুর *
ভোলা উঠি বলেরে কন্যা শুনহে খবর ॥
তোমাকে লুটিয়া নিবরে আমি কটালি নগর *
এইকথা শুনিরে ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল ॥
চোখের পানি পড়িরে ভেলুয়ার বুক ভিজে গেল *

www.pathagar.com

নানান বিলাপ করি ভেলুয়া জুড়িল কান্দন ॥
কোথায় রৈল আমীর সাধুরে আমার প্রাণধন *
এই সমে মোর সাধুরে যদি খবর শুনিত ॥
ভোলা সওদাগরের ডিঙ্গা সাগরে ডুবাইত *
জলের কারণেরে বিবলায় যমুনায় পাঠাইল ॥
দুষ্ট ভোলা পাইয়ারে সাধু মোরে লুটি নিল *
রাত্রিকালে আসিরে সাধু আমার নিকটে ॥
কেওয়াড় খোলা রাখিরে সাধু ফেলাইছ সঙ্কটে *
বহুত কান্দিয়ারে কন্যা ব্যাকুল হইল ॥
আঙ্গুলেতে ধরিরে ভোলা ডিঙ্গাতে তুলিল *
ভেলুয়ারে দেখিরে তবে ভোলা সওদাগর ॥
আস্তে গেলরে দুষ্ট কন্যার গোচর *
ভেলুয়ায় দেখি তারে করে দিল মানা ॥
না শুনিলে আমার কথারে তোমার চক্ষু হবে কানা *
এই কথা শুনিরে ভোলা হাসি হাসি চায় ॥
ভেলুয়ার সঙ্গেরে ভোলা ঠাট্টা করিতে যায় *
ভেলুয়ায় বলেরে দুষ্ট একি চমৎকার ॥
মস্কারী করিতে চাহরে সঙ্গেতে আমার *
বারেবারে মানা কৈল্যামরে মানা শুনিলা মোর ॥
দোন চক্ষু কানা হউকরে ডিঙ্গার উপর তোর *
ভেলুয়ার সতী ছিলরে শুন গুণিগণ ॥
তেকারণে কানা হইলরে ভোলার দুই নয়ন *
ঘুরি ২ পড়েরে ভোলা চোখে নাহি দেখে ॥
দাড়ি মাঝি বলে ভোলা আস্তে ২ ডাকে *
দাড়ি মাঝি দেখিরে তারা বলে একি চমৎকার ॥
দৈত্য ভূত তুলি লৈছেরে বুঝি ডিঙ্গার মাঝার *
মোরা যত দাড়ি মাঝিরে ভেলুয়ায় অন্ধ করি দিবে ॥
জনে ২ ধরিরে সুন্দর কন্যা বসি বসি খাইবে *
এই কথা কহি সবে ভেলুয়ার কাছে গেল ॥
মা জননী ডাকি দাড়ি মাঝি কহিতে লাগিল *
শুন ২ মাতারে শুনরে মন দিয়া ॥
ভালা করি দাওরে চক্ষু ভোলার লাগিয়া *
নিবেদন করি মা জননী শুনরে খবর ॥
আর না আসিবেরে ভোলা তোমার গোচর *
এই কথা শুনিরে ভেলুয়া আল্লার কাছে কয় ॥
সেইক্ষণে ভোলার জানোরে চক্ষু ভালা হয় *
এই মতে কত দিনরে ভোলার ডিঙ্গা চলি যায় ॥

www.pathagar.com

আর এক দিনরে ভোলা ভেলুয়ার দিকে চায় *
দুষ্টামির ভাবেরে ভোলা যদি সে হাসিল ॥
সুন্দর কন্যা দেখিরে ভোলার ডিঙ্গা চরে তুলি দিল *
দাড়ি মাঝি দেখিরে বলে ভোলা তুমি দুষ্ট ॥
তোমার কারণে ভোলা আমা সবাকায় কষ্ট *
তোমারে মারিয়া ভোলা আমরা মরিব ॥
সর্ব্বজনে মিলিয়া তোরে দরিয়ায় ঢালিব *
বারে বারে মানা করি ভেলুয়ার কাছে না যাইও ॥
মা জননী ডাকি ভেলুয়ারে মান্যতা করিও *
তার পর দাড়ি মাঝি তারা করিছে গমন ॥
সবে যাই বেড়াই ধরেরে ভেলুয়ার চরণ *
তোমার কাছে না আসিবেরে ভোলা কহিলাম সার ॥
যদি আইসে ভোলা ডুবাই দিও সাগর মাঝার *
ভেলুয়ায় বলেন মোর মনে দিলা তাপ ॥
ভোলারে ডাকিলাম আমি ছয় মাসের বাপ *
দাড়ি মাঝি শুনি তারা সব হইল খুশি ॥
বালুচর মাঝেরে ষোল ডিঙ্গা উঠিল ভাসি *
ভোলা সওদাগরের কথা এবে হউক নিবারণ ॥
ভেলুয়ার কথা এবে শোনো খাণিক্ষণ *
ভেলুয়ারে লইরে ভোলা দেশে চলি যায় ॥
আমীর সাধুর কাছেরে সুন্দর ভেলুয়ার পত্র যে পাঠায় *
প্রথমেতে লেখেরে জানো আল্লাজির নাম ॥
তারপরে লেখেরে ভেলুয়ায় হাজার সালাম *
শুন শুন সাধু মোর শুন নিবেদন ॥
তোমার লাগিয়ারে সাধু বিদরে জীবন *
তারপরে লেখেরে ভেলুয়ায় আপনার হাল ॥
রাত্রিকালে আসিয়ারে সাধু ঠেকাইলা জঞ্জাল *
কোঠার দরওয়াজা তুমি খোলা যে রাখিয়া ॥
ঘুমেতে রাখিয়া সাধু গেল যে চলিয়া *
ফজরে আসিয়ারে বিবলায় নিরক্ষিয়া চায় ॥
কেওয়ার খোলা দেখিরে বিবলায় করে হায় হায় *
তোমার মা ভৈনরে সাধু দাসী বান্দী মিলি ॥
ঘরের বাহির কৈল মোরে করি গালাগালি *
নানান মতে দুঃখরে তারা দিছে জনে জন ॥
দাসীর মত পাঠাই দিছেরে মোরে জলের কারণ *
জলের কারণেতে যাইরে আমি একেশ্বরী হইয়া ॥
দুষ্ট ভোলা দেখি মোরে লইয়া গেল লুটিয়া *

www.pathagar.com

ভোলা সওদাগরের বাড়ি জানো কট্টালি নগর ॥
ছয়মাসের বাপ ডাকিয়াছিরে ডিঙ্গার ভিতর *
এই পত্র পাইয়া সাধু চলিয়া আসিবা ॥
ছয়মাসের ভিতরে আসিলেরে আমার লাগ পাইবা *
খোওয়াজেক ডাকিয়ারে কন্যা পত্র দিল হাতে ॥
এই পত্র দিবা তুমি আমার সাধুর সাক্ষাতে *
খোওয়াজ পাইয়া পত্র শীঘ্র চলি গেল ॥
আমীর সাধুর হাতে পত্র খোওয়াজ নিয়া দিল *
পত্র পড়ি গৌরলধর মাঝিরে কয় আমীর সওদাগর ॥
ভেলুয়ারে নিছেরে লুটি শুন ভোলা সওদাগর *
এই কথা কহিরে সাধু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল ॥
বিজলীর মতরে ডিঙ্গা চলিতে লাগিল *
অতি বেগে চলেরে ডিঙ্গা যেমন পবন তরী ॥
ছয়মাসে থাকি শুনা যায়রে পালের কড়মড়ি *
এমন চালান চালায়রে ডিঙ্গা আল্লাহর কেরামত ॥
একদিনে চলি আইলরে চৌদ্দ দিনের পথ *
ঘাটেতে আসিয়ারে সাধু লঙ্গর ফেলিল ॥
দাড়ি মাঝি রাখি আমীর সাধু ধরে চলি গেল *
ঘরেতে যাইয়ারে সাধু কি কাজ করিল ॥
মা বাপের চরণে যাইয়া সালাম করিল *
মাতা ভগ্নির কাছেরে সাধু জিজ্ঞাসে খবর ॥
কোথায় আছে বলরে মাতা ভেলুয়া সুন্দর *
মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুন দিয়া মন ॥
তোমার ভেলুয়া সুন্দরীর হইছেরে মরণ *
আমীর সাধু বলেরে ভগ্নি শুনরে খবর ॥
কোন জায়গায় দিছরে মাটি আমার ভেলুয়া সুন্দর *
কবর দেখাই দিলরে বিবলা ভগ্নি যাই ॥
আমীর সাধু বলেরে আমি মাটি খুদি চাই *
কবর খুদিয়া আমীর সাধু দৃষ্টি করি চায় ॥
একটি কুত্তারে সেই কবরে দেখা যায় *
মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥
বড় দুষ্ট ছিলরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর *
এই কথা শুনিরে সাধুর কথা এবে হউক নিবারণ ॥
ভেলুয়া সুন্দরীর কথা এবে শুন দিয়া মন *
পত্র লিখি দিয়া ভেলুয়া খোওয়াজের হাতে ॥
দিবানিশি কান্দে কন্যা শান্ত নহে চিতে *
হায় হায় আমীর সাধু জপে প্রতি দিবা ॥

www.pathagar.com

শীঘ্র দেখা দিয়া চিত্ত শান্ত করিবা *
বাণিজ্যেতে গেলা মোরে ফেলি একেশ্বর ॥
দুষ্ট ভোলা হরি নিল কট্টালি নগর *
দিবানিশি কান্দে কন্যা দানা নাহি খায় ॥
বিরহে তাপিত হইয়া বারমাসী গায় *
শুনরে মালঞ্চ তুমি, খেদ চিন্তা করো না ॥
আসিবে বসন্ত ফিরে, তা কি তুমি জানো না *
পুনঃ পুষ্প বিকশিবে, বুলবুল আসিবে তবে,
মত্ত হইয়া প্রেমভাবে পুরাইবে বাসনা ॥
যদি গত হৈল নিশি, না কান্দ প্রদীপ বেশি,
পুনঃ ফের আসিবে নিশি, সেই সময় ভেব না ॥
শুন হে মালঞ্চ তুমি, খেদ চিন্তা করো না ॥

[ভেলুয়া সুন্দরীর বারমাসী]
আইস অনাথিনী নাথ মোর, আইস বন্ধুয়া মোর ॥
জ্বলি অঙ্গার হৈনু, বিরহ অনলে তোর *
বিরহ বেদনা, বিষম যন্ত্রণা, সহিতে না পারি বালা ॥
সদা সন্তাপিত, দহে মোর চিত্ত, মধুরা নগরে কালা *
জীবন হৈল দায়, প্রাণ না বাঁচয়, ভাবিয়া বিষম জ্বালা ॥
হরিষে বিষাদ, নাই কোনো সাধ, পুড়িল আমার ভালা *
প্রথমে আশ্বিন, সময় প্রবীণ, প্রিয়া মোর পরবাস ॥
শরতের রীত, দহে নারী চিত, ভাবিয়া হইলাম নৈরাশ *
আহা প্রাণেশ্বর, হইল দেশান্তর, না পাইল বার্ত্তা সার ॥
আশ্বিনের শেষ, না আইল দেশ, মোর অতি দুঃখ ভার *
প্রবেশ কার্তিক, নৈরাশ অধিক, খাওয়ার ঢাকা দিনমণি ॥
নিশির শিশির, অঙ্গ নহে স্থির, কোথা যাব বিরহিনী *
আহা প্রাণেশ্বর, দগ্ধে অন্তর, স্মরিয়া তোমার মায়া ॥
কহিবারে দুঃখ, নাহি স্বরে মুখ, তাপিত হৃদয় কায়া *
অগ্রাণ প্রবেশ, নানা ফুল বেশ, বিরাজিত বিকশিত তাতে ॥
আল সর আসি, মধু খায় বসি, মন সুখে করে গীত *
আহা প্রাণনাথ সকল অনাথ, তুমি বিনে সদা মোর ॥
পাপিষ্ঠ নয়ান, ঝরে অনির্বাণ, তুমি বিনে প্রাণেশ্বর *
পৌষ হৈল বৈরী, আমি একেশ্বরী, হেমন্তের বাণ অতি ॥
উত্তম সমীর শুকায় শরীর, অভাগীর কোন গতি *
হেমন্তের বাণ হৃদয় খান খান, অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
আহা প্রাণপতি, নিঠুর প্রকৃতি, না লইলা বাত্তা মোর *
মাঘ প্রবেশিল, যুবতী সকল, হীন ভয় মনে গুণি ॥

www.pathagar.com

স্বামী সঙ্গে মিলি, করে নানা কেলি, অভাগিনী একাকিনী *
হেমন্ত দহিয়া, মন অঙ্গ হিয়া, হৈল আমার কালা ৷৷
হেন শীতকালে, কান্ত নাহি কোলে, কত সহে প্রাণ জ্বালা *
ফাল্গুন প্রবেশ হেমন্তের শেষ, চলিল বসন্ত ঋতু ৷৷
নবীন পবন, পেল পুষ্পগণ, নানা মতে বিকশিত *
কোকিলের ধ্বনি, দিবস রজনী, আনন্দ প্রভুত সব ৷৷
শুনি মধুস্বর, দন্ধে অন্তর, একাকিঁনী পরাভব *
মধুব্রত ফুল, প্রমাণ বহুল, পুষ্প মধু করে পান ৷৷
দেখি সেই ঋতু, ফাটে নারী চিত্ত, সদায় আকুল *
আহা প্রাণপ্রিয়া, দহে মোর হিয়া, সতত তোমার লাগি ৷৷
না নিলা খবর, মর্ম জর জর, নারী অতি দুঃখ মাগি *
মদনের বাণ, অঙ্গ খানখান, নিজ কান্ত মনে স্মরি ৷৷
সহিতে না পারি, খাইমু কাটারী, যৌবন হইল বৈরী *
আহা প্রাণনাথ, রহিলা কোথাত, মোর না লইলা সংবাদ ৷৷
এই দুঃখে মরি, রহিলা, পাসরি, মোর ঘটে প্রমাদ *
পাই মনস্তাপ, ছয়মাসের বাপ, ডাকি ভোলা সওদাগরে ৷৷
গেল ছয়মাস, না পুরিল আশ, বন্দী আমি ভোলার ঘরে *
হইয়া হুতাশ, আর ছয় মাস, লইয়াছি অবকাশ ৷৷
ছয়মাস যাবে, যদি না আসিবে, হইবে সমূলে নাশ *
চৈত্রেতে তপন, অস্থির মদন, সদা হানে প্রেম বাণ ৷৷
শুনি পিকনাদ, ঘটায় প্রমাদ, বিফল সতত প্রাণ *
আহা প্রাণেশ্বর, দহে কলেবর, হইল অলি প্রাণের বৈরী ৷৷
সদায় গুঞ্জরে, বসি পুষ্প পরে, মধু খায় মোরে হেরি *
প্রবেশ বৈশাখ, সময় নিজাঘ, রবি তাপ খরতার ৷৷
অগ্নির কিরণ, না যায় সহন, নাহি শান্তি মনে মোর *
যাহার কারণ, রাখিলাম প্রাণ, সেই কেন নাহি পার ৷৷
যৌবন রমণী, জোয়ারের পানি, ভাটি লক্ষ্যে চলি যায় *
প্রবেশ জ্যৈষ্ঠের, হৃদয় কমল, ভাঙিয়া আমার পড়ে ৷৷
মোর কর্মফলে, কান্ত পিকানলে, মন হরে *
এই দুঃখ মোর, সদা দেশান্তর, আমার হস্তে রস ঝরে ৷৷
আইল আষাঢ়, বৃষ্টি আনিবার, চমকে যখন দামিনী *
মেঘের গর্জন, শুনি ভয় মন, লাগে অতি একাকিনী ৷৷
নদীর কারণ, না দেখি তখন, অহর্নিশ ভয় পায় *
আহা প্রাণেশ্বর, না দেখি ভাস্কর, হেরী ভীত তনুময় ৷৷
প্রবেশ শ্রাবণ, অস্থির মদন সহিতে না পারি আর *
সু-ভাগ্য যুবতী লই প্রাণপতি, করে নানান বেভার ৷৷
মোর কর্ম দোষে, পতি দূর দেশে, রহিয়াছে দেশান্তর *

www.pathagar.com

দেখি গায় পির, নহে দেহ সু-স্থির, প্রাণ কাঁপে তার তরে ॥
ভাদ্দর প্রবেশ, বরিষার শেষ, বন্ধু মোর না আসিল *
মোর মনে লয়, আসিল নৌকায়, বরিষা শেষ হইল ॥
আহা প্রাণেশ্বর, গেল যে বৎসর, বার্তা না পাইনু আমি *
করি বিষ পান, ত্যাজিব পরাণ, প্রাণ বধি ভাগী হইবা তুমি ॥
বৎসর পুরিল, বন্ধু না আসিল, মোর হইল সর্বনাশ *
যৌবনকাল বৈরী, ভক্ষিব কাটরী, ছাড়িলাম জীবনের আশ ॥
এই রূপে সতী, কান্দে প্রতিনিতি, মনের সন্তাপি অতি *
কান্দিয়া সদায়, বারমাসী গায়, নিভিল হৃদয় বাতি ॥
হীন মোয়াজ্জমে, দহিয়া মরমে, কহে শুন কন্যা সতী *
না কান্দ বিশেষ, দুঃখ হবে শেষ, আসিবে তোমার পতি ॥

[আমীর সাধু কট্টালি নগরে যায় ভেলুয়া সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করে]
রাগান্বিত হইরে সাধু করিছে গমন ॥
টোলা বারুইয়ার বাড়িতে গিয়া দিল দরশন *
বারুইরে যাইরে বলে ভাই শুন দিয়া মন ॥
সারিন্দা খুদাইরে আমার শান্ত কর মন *
এই কথা শুনিরে বারুই কোন কাজ করিল ॥
সারিন্দারে মূল্যরে জানো টাকা একশত লইল *
বৈল্লাম গাছের সারিন্দারে মন পবনের বৈঠা ॥
জঙ্গলেতে যাইয়ে বোরুই ভাইয়ে সকলই আনিল *
একশত টাকা লইরে সারিন্দা বানাই দিল ॥
সারিন্দা লইয়ারে সাধু করিল গমন *
বাজারেতে যাইরে সাধু দিল দরশন ॥
দাড়াইস সাপের রগের তার কিনিল তখন *
তিরিশ টাকা দিয়ারে তার খরিদ করিয়া ॥
বাজাইতে লাগিল সারিন্দা আল্লাহকে ভাবিয়া *
এক তারে বলেরে আমার আমীর সওদাগর ॥
আর তারে বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর *
আর তারে বলেরে দুষ্ট ভোলা সওদাগর ॥
লুটিয়া নিয়াছে আমার ভেলুয়া সুন্দর *
ভেলুয়া বলেরে সাধু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কট্টালি নগরে গেল ভেলুয়া লাগিয়া *
যেদিন আমীর সাধু কট্টালি পৌছিল ॥
সে তারিখে ভেলুয়ার বিয়ার দিন ছিল *
গোসলের কারণে সখীগণ জল ভরিতে যায় ॥
আমীর সাধুর গীত শুনিরে বলে হায়রে হায় *

www.pathagar.com

আমীর সাধু গায়রে গীত শুনরে খবর ॥
সাত সখী শুনিরে গীত সাধুর গোচর *
সখী সবে গীত শুনিরে করিছে গমন ॥
ভেলুয়ার নিকটে আসি দিল দরশন *
সাত সখীর মাঝেরে ছয়জন সখী আইল ॥
বড় সখী গীত শুনিরে সেখানে রহিল *
ভেলুয়ায় বলেরে আমার বড় সখী কই ॥
সবে বলে বড় সখী গীত শুনে ওই *
সখী সবে বলেরে ভেলুয়া শুনরে খবর ॥
সারিন্দা ফকির আসিছে এক বড়ই সুন্দর *
তোমার নাম ধরিরে ভেলুয়া সারিন্দা বাজায় ॥
বড় সখী ঘাটে থাকিরে ফকিররে চায় *
ফকিরের বাড়ি জানরে কন্যা শ্যামলা বন্দর ॥
সেই ফকিরের নাম জানরে আমীর সওদাগর *
ছয় সখী আসিরে তারা ভেলুয়ারে কয় ॥
বড় সখী ঘাটে বসি মুসিবতে রয় *
দাসীর কলসি আমীর সাধু শীলকায়া করিল ॥
তেকারণে বড় সখী আসিতে নারিল *
তারপরে বড় সখী কি কাজ করিল ॥
ফকির ফকির বলিয়া ডাকিতে লাগিল *
বড় সখী কহে শুন ফকিররে ভাই ॥
কলসি তুলি দেওরে সাধু ঘরে চলি যাই *
আমীর সাধু আসিরে কুমন্ত্রণা দিল শেষে ॥
পিন্দনের কাপড় সখীর নিলরে বাতাসে *
কাপড় ধরিতে সখীরে যখন চলিল ॥
সে সময় কলসিতে সাধু অঙ্গুরী ফেলে দিল *
ভেলুয়ার নিকটেরে সখি শীঘ্র আইল চলি ॥
সেই পানি আনিরে ভেলুয়ার মাথায় দিল ঢালি *
আমীর সাধুর অঙ্গুরী ভেলুয়ার কাপড়ে পড়িল ॥
সাধুর অঙ্গুরী দেখিয়ারে ভেলুয়ায় চিনিল *
অঙ্গুরী পাইয়ারে কন্যায় ভোলাকে ডাকিয়া ॥
নিবারণ কররে সাধু আমার তোমার বিয়া *
আমার বাপের দেশের এক ফকির আসিয়াছে ভাই ॥
তার গীত শুনিবরে আজি কহিলাম বুঝাই *
তেরিবেরি কৈল্যেরে আজি চক্ষু হবে কানা ॥
গীত শুনিবার তুমি না করিবা মানা *
মনে ডর পাইরে ভোলা ক্ষান্ত করি দিল ॥

www.pathagar.com

দাসী পাঠাই দিয়ারে কন্যা ফকিররে নিল *
ফকিরের মুখরে ভেলুয়ায় যখন দেখিল ॥
মনে মনে বহুতররে ভেলুয়ায় কান্দিতে লাগিল *
নানান গীত গায়রে ফকির নানান বেশ ধরে ॥
ফকিররে দিছে বাসরে ভেলুয়ার কেঠা ঘরে *

[আমীর সাধুর গান]
তোমার পিরিতে মজে, হলেম কত জ্বালাতন ॥
যোগীবেশে এলেম হেথা, আমার প্রাণধন *
মাতাপিতা রাজ্য তেজে, বেড়াই আমি তোমায় খুঁজে ॥
দেখাতে কি মন মজে, দেহ আমায় মধু পান *
প্রাণপ্রিয়সী বিধুমুখী, ইচ্ছা হয় নয়নে রাখি ॥
আমাকে দিও না ফাঁকি, ধরি তোমার দুই চরণ *
উভয়েরি প্রেমবাণে, বন্দী হইলাম দুই জনে ॥
সাক্ষী রাখি নিরঞ্জনে, যৌবন করলাম সমর্পণ *
রচক বলে এক ভাবে, ভাবের ভাবে যে মজিবে ॥
অমূল ধন সেই পাবে, কার সবে নিবেদন *

ভাত পানি খাইয়ারে ফকির করিশে শয়ন ॥
রাত্রি নিশিকালেরে সুন্দর ভেলুয়া করিছে গমন *
সাধু সাধু বলিরে ভেলুয়া বুকে নিল টানি ॥
মুক্তা ঝরণী ঝরেরে কন্যার দুই নয়নের পানি *
লোটন কবুতরের মতরে কন্যা ধরিছে বেড়াই ॥
দেরীর কাজ নাইরে সাধু চল রাত্রি রাত্রি যাই *
আমীর সাধু বলেরে কন্যা আমি চোরের পুত্র নই ॥
রাত্রি রাত্রি চলি যাইতামরে ভেলুয়ায় লই *
কাকে করে কলরব কোকিলা কুহুরে ॥
ভেলুয়ায় চলি গেল আপনা মন্দিরে *
সেই দেশে এক জনের নাম ছিল মুনাফ কাজী ॥
ফজরে উঠিয়ারে ফকির দিছে এক আরজি *
শুন শুন কাজী সাহেব শুনরে খবর ॥
দুষ্ট ভোলায় লুটি আনেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর *
ওয়ারেন্ট যাইয়ারে তবে ভোলাকে আনিল ॥
মুনাফ কাজী দেখি তবে জিজ্ঞাসা করিল *
ফকিরের বধূরে তুমি আনিছ লুটিয়া ॥
গরিব দুঃখিয়ার বধূ জানিরে তুমি করো বিয়া *
এই কথা শুনিরে ভোলা কহিতে লাগিল ॥

www.pathagar.com

জন্ম ভরি ফকির শালায় কোন বধূর মুখ না দেখিল *
ঘরে ঘরে যাইরে ফকির নানান গীত গায় ॥
পেটের কারণেতে সারিন্দা বাজায় *
দেশে দেশে হাটেরে ফকির নানান দেশে রয় ॥
যার বধূ সুন্দর দেখেরে ফকির তারে বধূ কয় *
আমার বধূ দেখিরে ফকির বেহুশ হইয়া ॥
তোমার কাছে নালিশ করে শালা ভেলুয়ার লাগিয়া *
কাজীয়ে শুনিয়া বলে ভোলা সওদাগর ॥
ভেলুয়ারে আন তুমি আমার গোচর *
তোমার বধূ হইলেরে ভোলা তুমি লইয়া যাইবা ॥
ফকিররে ধরিয়া তুমি জেলখানায় দিবা *
ফকিরের বধূ হইলেরে আমি ফকিররে দিব ॥
ভেলুয়ারে আনরে আমি জবানবন্দী লইব *
সুন্দর সতী ভেলুয়ায় স্বামী পাইছে দুই ॥
আদালতের ঘরে আন জিজ্ঞাসিব মুই *
এই কথা শুনিয়া ভোলা বাড়ির মধ্যে যাই ॥
ভেলুয়ারে নানান কথারে দিয়াছে শিখাই *
পাল্কীর মাঝে করিরে তারে ভোলা সওদাগর ॥
ভেলুয়ারে আনে জানরে মুনাফ কাজির ঘর *
ভেলুয়ার নিকটে কাজী পুছিল খবর ॥
কোন স্বামী ভেলুয়ারে প্রাণের দোসর *
ভেলুয়ায় বলেরে কাজী শুন নিবেদন ॥
সারিন্দা ফকির মোররে স্বামী প্রাণধন *
মুনাফ কাজী শুনিরে জানো ভেলুয়ার কথা ॥
পাল্কীর দিকে চায় কাজীয়ে ফিরাইয়া মাথা *
নব্বই বৎসর হইছেরে কাজীর শতের বাকি দশ ॥
বাম হস্তের আঙ্গুল দেখিরে কাজী হইয়াছে বেহুশ *
কোথায় যাব কি করিব কাজীর হইয়াছে ভাবনা ॥
পাল্কীর মাঝে দেখে কাজী বিজলীর কণা *
মনে মনে কত খুশিরে কাজীর খুশির সীমা নাই ॥
ভোলাকে গর্জিয়ারে কাজী দিয়াছে দৌড়াই *
আমীরকে বলেরে কাজী শুনহ খবর ॥
ভেলুয়ারে রাখিয়া তুমি চলি যাহ ঘর *
তোমার যোগ্য নহেরে ভেলুয়া কহিলাম ভাঙিয়া ॥
আর কোন জনে পাইরে লই যাবে লুটিয়া *
আমার ঘরে থাকিবরে ভেলুয়া ভালোবাসা পাই ॥
তোমার সঙ্গে গেলে মরি যাবে নানান কষ্ট পাই *

www.pathagar.com

এই কথা শুনিয়ারে সাধু জ্বলিয়া উঠিল ॥
মুনাফ কাজীর ঘর হইতেরে সাধু নিকালিয়া গেল *
বাহিরে আসিলরে সাধু গোস্বায় জ্বলিয়া ॥
গৌরল ধরের কাছেরে পত্র দিল যে লিখিয়া *
[ভোলার সাথে আমীর সাধুর যুদ্ধ]
শুন শুন গৌরল ধররে শুন সমাচার ॥
সৈন্য লই আইসরে কট্টালি নগর *
আমীর সাধুর পত্র যদি গৌরল ধর পাইল ॥
সাজ সাজ বলিরে গৌরল ধর আদেশ করিল *
এমন সাজ সাজেরে সৈন্য হাতে লইয়া কোচ ॥
পশ্চিমবাসী সৈন্য সাজেরে বড় বড় মোচ *
তারপরে সাজেরে সৈন্য বন্দুক কান্ধে লইয়া ॥
বাংলাদেশি সৈন্য সাজে ঢাল কান্ধে লিয়া *
ঢাকাইয়া সৈন্য সাজেরে বড় বড় টিয়া ॥
বড় বড় পেড়ুয়া সাজে গদা হাতে লিয়া *
নানা দেশের নানা বাসীরে সৈন্য লিয়া সাথে ॥
গৌরল ধর চলি আইলরে আমীর সাক্ষাতে *
মাঝিরে দেখিয়ারে সাধু খুশি বাগে বাগ ॥
মুনাফ কাজীর বাড়ি আসিরে মারে এক ডাক *
ডাক শুনি মুনাফ কাজী বেহুশ হইল ॥
ভেলুয়ারে লইয়া সাধু ডিঙ্গাতে আসিল *
তারপরে আমীর সাধু কোন কাজ করিল ॥
যুদ্ধের বাজনারে সাধু বাজাইতে লাগিল *
মুনাফ কাজী শুনিরে আর ভোলা সওদাগর ॥
যুদ্ধের বাজা শুনিয়া তারা মনে পাইল ডর *
ঢাক ঢোল নাকাড়া বাজে জান ঘন মারে কাটি ॥
শিঙ্গা বিরলার শব্দেতে কাঁপে বসুমতি *
ভোলা সওদাগর জানিরে কতেক সৈন্য লইয়া ॥
যুদ্ধের ময়দানে আসিরে উতরিল গিয়া *
দুই সৈন্য চলি আইলরে বলি মার মার ॥
বন্দুকের ধনিতে হৈলরে রাজ্য অন্ধকার *
আমীর সাধু মারে কামানরে শব্দ যায় দূর ॥
লাখে লাখে সৈন্য মরে মুণ্ড হয় চুর *
বন্দুক কামান মারে আর মারে তীর ॥
ঢলি ঢলি পড়ে ভোলার যত ছিল বীর *
মার মার মার মার শব্দ হৈল অতি ॥
ভোলা সওদাগর বলে মোর হবে কোন গতি *
মারা গেল বহুত লোকরে কট্টালি নগরের ॥

www.pathagar.com

না রৈল রাজ্য বাড়ি ঘর সে দেশের *
আমীর সাধুর মহাবীর করিয়া সন্ধান ॥
ভোলারে ধরিয়া সাধু মারিল গরদান *
ছোট বড় যত সৈন্যরে না রাখিল আর ॥
কাজীরে পাঠাইয়া দিলরে যমের দুয়ার *
তারপরে কি করিল শুনরে খবর ॥
আমীর সাধু চলি আইলরে ডিঙ্গার উপর *
ভেলুয়ায় বলেরে সাধু শুন মোর বাণী ॥
কট্টালিতে রাখিবা একরে আমার নিশানী *
আমীর সাধু বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ॥
কি নিশানি রাখি যাইমুরে কট্টালি নগর *
ভেলুয়ায় বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥
এক দিঘি দিবারে ভোলার ঘর ভিটার উপর *
ভেলুয়ার কথারে আমীর সাধু যখন শুনিল ॥
কট্টালিতে ভোলার ভিটায়রে এক দিঘি করে দিল *
ভেলুয়ার নামেতে দিঘি দিল সওদাগর ॥
কোম্পানীতে বান্ধিয়াছেরে ইস্টিশনের ঘর *
তারপরে আমীর সাধুরে কি কাজ করিল ॥
ভেলুয়ারে লইরে সাধু দেশেতে আসিল *
মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥
পরীক্ষা না করি আনরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর *
এই কথা শুনিরে আমীর সাধু কিছু না কহিল ॥
মায়ে ভৈনে ভেলুয়ারে পরীক্ষাতে দিল *
[ভেলুয়া পরীক্ষা দিবার কথা শুনিয়া আল্লাহর নিকট কান্দিয়া মোনাজাত করিবার বয়ান]
ওহে প্রভু দয়াময় তব নাম রক্ষা পতি ॥
তব দাস দাসীগণে বিপদেতে করো মুক্তি *
দয়াময় নাম ধরো সকলই করিতে পার ॥
তোমা বিনে নাহি গতি দাসী প্রতি কৃপা কর *
যে কেহ বিপদে ঠেকে উদ্ধারিয়া লও তাকে ॥
দয়া করো মম প্রতি পড়িয়াছি আমি দুঃখে *
যদি তুমি না ত্বরাবে তাড়ন নাম কেন তবে ॥
ওহে প্রভু দয়ামতি পরীক্ষায় উদ্ধারি লিবে *
দুই কর তুলি কন্যা কান্দিয়া বিস্তর ॥
মোনাজাত করে সতী প্রভুর গোচর *
মেহের নজর করে পাক পরওয়ারে ॥
কবুল করিল দোয়া দয়ার সাগরে *
[ভেলুয়ার পরীক্ষার বয়ান]
প্রথমে পরীক্ষা জানরে শুন কহি সার ॥

www.pathagar.com

লোহার চাউল আনি দিলরে ভাত রান্ধিবার *
সেই চাউল লইরে কন্যা করিছে গমন ॥
পাকঘরেতে লিয়ারে কন্যা করিল রন্ধন *
আমীর সাধু দেখিরে ভাত বলে চমৎকার ॥
লোহার চাউলের ভাতরে সতী কন্যায় রান্ধে কি প্রকার *
মায়ে ভৈনে বলেরে তুমি যাহার ফকির ॥
সে যে দেখিরে তোমার চাইতে বড় যাদুগীর *
তারপর সিদ্ধ ধান্যরে আনি দিল যাই ॥
সেই ধান্যের গেজরে কন্যায় দেখাইল ভাই *
একে একে পরীক্ষা করে সকলে দেখিল ॥
তুলা পরীক্ষার কথারে শেষে ভাঙিয়া কহিল *
ভেলুয়া কহেরে আমার আমীর সওদাগর ॥
তুলা পরীক্ষায় দিলেরে আমার না পাবে খবর *
সকল পরীক্ষাতে কন্যায় জিনিয়া উঠিল ॥
তুলা পরীক্ষার লাগিরে মনেতে ডরিল *
কি করিতে পারে তুলারে কন্যা যদি থাকে সতী ॥
অসতী হইলেরে তোমার হইবে দুর্গতি *
এই জওয়াব দিলরে আমীর প্রভাতে উঠিয়া ॥
শ্বাশুড়ি ননদী আইসেরে পরীক্ষার লাগিয়া *
ভেলুয়ারে লইরে তারা বান্দী দাসী মিলি ॥
ঘৃত ঢালি দিল জানরে সর্ব অঙ্গে মলি *
সত্তর মন তুলারে সব ময়াদানে রাখিয়া ॥
আর সত্তর মন ঘৃত দিলরে তুলাতে ঢালিয়া *
ভেলুয়ারে সাজাইয়ারে তার বান্দী দাসীগণ ॥
তুলার উপরে বসাইলরে করিয়া যতন *
সেই তুলা দেখিরে কন্যা জুড়িছে কান্দন ॥
আর না পাইলেরে সাধু আমার দরশন *
কোথায় রৈছ আমীর সাধুরে মোর প্রাণপতি ॥
যাইবার কালে দেখা দেহরে আমার সঙ্গতি *
তোমার লাগিয়ারে সাধু ত্যাজিলাম মা বাপ ॥
যাইবার কালেরে অভাগিনী না পাইল জওয়াব *
কোথায় রইলা সাধুরে আমার আমীর সওদাগর ॥
যাইবার কালে না পাইলামরে তোমার খবর *
এই মত সুন্দর কন্যায়রে বহুত কান্দিল ॥
তুলার উপর নিয়ারে তারে বসাইয়া দিল *
যখন আগুন দিলরে তুলাতে জ্বালিয়া ॥
হু হু শব্দ করি অগ্নিরে উঠিল জ্বলিয়া *
আগুনের তেজরে গেল উঠিয়া আসমানে ॥

www.pathagar.com

সব লোকে বলেরে কথা না বাঁচিবে জানে *
কেহ বলে সতী কন্যা পুড়ে হবে ছাই ॥
কেহ উঠি বলেরে কন্যা এই দেশেতে নাই *
নানা মতে নানা কথারে তারা সকলে কহিল ॥
আগুনের জোরে কন্যারে পবনে উঠিল *
ভেলুয়ারে লইরে পবন শুন্যে চলি যায় ॥
রোকামে থাকিয়ারে সাত পরী দেখিবারে পায় *
পবনের ভার হইলরে ভেলুয়া সুন্দর ॥
সাত ভৈনে দেখেরে থাকি রোবাম শহর *
ভেলুয়ার দেশে তারা করে গতাগতি ॥
সেই পরীর সাথেরে ভেলুয়ার বহুত পিরিতি *
সাত ভৈনে দেখিরে তারা করে হায়রে হায় ॥
মোদের সবার ভৈনেরে সত্য কন্যা মারা যায় *
পবনের ভর করি তারা আসিল চলিয়া ॥
রোকাম শহরে গেলরে জান ভেলুয়ারে লইয়া *
ভেলুয়া চলি গেলরে রোকাম শহর ॥
আমীর সাধুর কথা কিছু শুনরে খবর *
এক দিন দুই দিনরে ভাই তিন দিন হইল ॥
ভেলুয়ারে না দেখি সাধুরে কান্দিয়া উঠিল *
কৈগেলরে কৈগেলরে আমার চোখের রওশনী ॥
কৈগেল কৈগেল মোর পাশের পরাণী *
এইমত আমীর সাধুরে বহুত কান্দিয়া ॥
ঘরের বাহির হইলরে ভেলুয়ার লাগিয়া *
হাটে মাঠে বিলে বনেরে সাধু চলে রাতদিন ॥
কোথা হৈতে কোথায় যায়রে রাস্তায় না পায় চিন *
জঙ্গলে জঙ্গলেরে সাধু ভ্রমি আচম্বিতে ॥
দেখা হইলরে এক ফকিরের সাথে *
আমীর সাধু পাইল যদি ফকিরের দরশন ॥
কান্দিয়া লুটাই পড়েরে ফকিরের চরণ *
ফকির উঠিয়া বলেরে সাধু না কান্দিও তুমি ॥
তোমার মনের কথারে সাধু সব আমি জানি *
কতদিন থাকরে সাধু আমার গোচর ॥
তারপরে পাঠাই দিমুনে রোকাম শহর *
বিবাহ করিয়াছরে তুমি ভেলুয়া সুন্দরী ॥
নানান দুঃখ পাইল তোমার ভেলুয়া সুন্দরী *
তোমার মায়ে ভৈনেরে করিয়াছে তার দুর্গতি ॥
তেকারণে রোকামেতে গেলরে ভেলুয়া সতী *
রোকামেতে গেলেরে সাধু ভেলুয়ার লাগ পাইবা ॥

www.pathagar.com

সাত ভৈনেরে তুমি চোখে না দেখিবা *
রোকামেতে সাত পরীরে তারা ভ্রমণ করিয়া ॥
আমার নিকটে আইসেরে তারা দোওয়ার লাগিয়া *
আলোক রথে করিরে তারা শূন্যে উড়ি যায় ॥
নানান মিষ্ট ফলরে তারা আমারে খাওয়ায় *
সেই রথে চড়ি পরী রোকামে যাইতে ॥
গোপনে যাইওরে তুমি চড়ি আলোক রথে *
এই কথা কহিরে সাধু কি কাজ করিল ॥
গায়েবী এক টুপি আনিরে সাধুর মাথায় দিল *
ফকিরে বোলায়রে সাধু শুন সমাচার ॥
এই টুপি শিরে দিলে কেহ না দেখিবে আর *
সেই টুপি পাইয়ারে সাধু খুশি হইল মন ॥
হেনকালে উড়ি আইল পরী সাতজন *
পরী সব দেখি সাধুয়ে টুপি দিল শিরে ॥
আলোক রথ রাখরে সাত পরী নামে ধীরে ধীরে *
ফকিরের কাছেরে তারা গেল সাতজন ॥
যাইয়া সালাম তারা করে জনে জন *
[ভেলুয়া উদ্ধারের বয়ান]
দোয়া লই সাত পরীরে তার আলোক রথে যায় ॥
হেনকালে সাধুরে ডাকি ফকিরে বুঝায় *
ফকিরে বলেন্তরে সাধু মুই বোল্লাম তোমারে ॥
রথের নীচে বৈসরে তুমি টুপি দিয়া শিরে *
সেই কথা শুনিরে আমীর সাধু টুপি মাথায় দিয়া ॥
পরীর সাথে গেলরে সাধু রোকামে চলিয়া *
রোকামে যাইয়ারে সাত পরী রথ নামাইল ॥
ধীরে ধীরে আমীর সাধু উঠি দৌড় ভালা দিল *
তারপরে কি হৈলরে আর শুনরে খবর ॥
সেই তারিখে নাচ হবেরে রোকাম শহর *
আমীর সাধুর কথারে এবে হউক নিবারণ ॥
সাত পরীর কথারে কিছু শুন দিয়া মন *
ভাত পানি খাইরে তারা সাজন করিয়া ॥
সাত ভৈনে চলি আইল ভেলুয়ারে লইয়া *
রাজসভা পূর্ণ হইছে পাত্র মিত্র আসি ॥
হেনকালে আদেশিল রাজা সভা মাঝে বসি *
কুশলে ইন্দ্রের বাদ্যরে সবে জানো বাজাইতে কহিল ॥
হেনকালে আমীর সাধুরে সভার মাঝে গেল *
ভেলুয়ারে সাথে করিরে জানো সাত ভৈনে নাচে ॥
আমীর সাধু নাচ দেখিরে মনে মনে হাসে *

www.pathagar.com

তারপর আমীর সাধুরে দৃষ্টি করি চায় ॥
একজন সভায় বসিরে মৃদঙ্গ বাজায় *
পরীর কুলের বাজারে মৃদঙ্গ বাজাইতে না জানে ॥
টুপি শিরে দিয়ারে আমীর সাধু মৃদঙ্গ ধরি টানে *
কোন জনে টানেরে মৃদঙ্গ দেখা নাহি যায় ॥
মনে মনে ডরিরে বাজনা মৃদঙ্গ ফেলিয়া ধায় *
গাঁজাখোর বাজন্যা যদি গাঁজা খাইতে গেল ॥
আমীর সাধু লইরে মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল *
ইন্দ্র কুলের বাজারে সাধু জানে নানা তাল ॥
ইন্দ্র রাজায় শুনি বাজা হইল খোশাল *
টাকা পয়সা বকশিস দিলরে রাজায় শুনিয়া বাজন ॥
একে একে দিলরে সাজের ঘৌরান *
ইন্দ্র রাজায় বলেরে মৃদঙ্গ বাজনা ক্ষমা কর ॥
নাহি শুনে মানা বাজায়রে আমীর সওদাগর *
ইন্দ্র রাজার পূজার সময়রে নষ্ট হইয়া যায় ॥
যত মানা করে রাজায়রে সাধু অধিক বাজায় *
ইন্দ্র রাজায় বলেরে মৃদঙ্গ বাজায় কোন জনে ॥
কানে শুনা যায়রে কেবল না দেখি নয়নে *
তবে আমি বলিরে বাজন্যা শুনরে খবর ॥
শাপ দিয়া জ্বালাইয়া দিমুরে তোমার রোকাম শহর *
নতুবা কি চাওরে মৃদঙ্গ আমার গোচর ॥
ভয় পেয়ে হাজির হইলরে আমীর সওদাগর *
টুপি রাখি আমীর সাধুয়ে দিছে দরশন ॥
সুন্দর ভেলুয়া দিয়ারে আমার রাখহে জীবন *
এই কথা শুনিয়া রাজা জ্বলিয়া উঠিল ॥
ভেলুয়া ভেলুয়া বলি রাজায় ডাকিতে লাগিল *
গোশ্বাতে জ্বলিয়ারে রাজায় ভেলুয়ারে কয় ॥
আমাকে বলিলারে তোমার বিয়া নাহি হয় *
ইন্দ্র রাজায় বলেরে ভেলুয়া দেখিবারে পাই ॥
সারা রাত্রি মৃদঙ্গ বাজায়রে তোমার সুন্দর জামাই *
ভেলুয়ায় শুনিরে বড় শরমিন্দা হইল ॥
শাপ দিয়া ইন্দ্র রাজায়রে শিলকায়া করিল *
যখন শিলকায়া হইলরে ভেলুয়া সুন্দরী ॥
আমীর সাধু কান্দন করেরে রাজার পায়ে ধরি *
ইন্দ্র রাজায় বলেরে সাধু না কান্দিও তুমি ॥
এক বৎসর গেলেরে ভালো করি দিমু আমি *
কান্দিয়া আমীর সাধুরে রোকাম শহরে থাকে ॥
ভেলুয়া ভেলুয়া বলিরে সদায় মুখে ডাকে *

www.pathagar.com

এই মতে বারো মাসরে যদি হইছে পূরণ ॥
আশির্বাদ দিয়া ভেলুয়ারে করিল চেতন *
এই মতে তিন বৎসর গত হইয়া গেল ॥
ভেলুয়ারে লইরে সাধু আপন দেশে আইল *
হীন মোয়াজ্জম কহেরে শুন বন্ধুগণ ॥
ভেলুয়া সুন্দরীর গীতরে হইল সমাপন *
ভুল চুক হইলে মোররে লইবেন ক্ষমিয়া ॥
দোয়া করিবেন মোরেরে অধম জানিয়া *

৬. ভাট কবিতা

গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রেম-ভালোবাসা, দ্বন্দ-সংঘাত, বিরোধ-গোষ্ঠীগত ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, পরকীয়া, রাধাকৃষ্ণের প্রণয় আখ্যান, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি অবলম্বনে গ্রাম্য কবিরা একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। সেসব দীর্ঘ কবিতা 'ভাট কবিতা' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সুরনির্ভর এসব কবিতা পাঠ বাংলা লোকসাহিত্যের এক উর্বর ধারা। এ ধারাটি গ্রামীণ কবিদের মধ্যে এখনো সচল ও সজীব রয়েছে। সচরাচর ডিমাই সাইজের চার থেকে আট পৃষ্ঠার মধ্যে নিউজপ্রিন্ট কাগজে এসব ভাট কবিতা মুদ্রিত করে খুবই অল্পমূল্যে গ্রাম্য হাটবাজার এবং স্কুল-কলেজে বিক্রেতারা বিক্রি করে থাকেন। তবে গ্রামীণ মেলা-মচ্ছব এবং উৎসব-পার্বণে এসব ভাট কবিতার বিক্রি ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। কোনো ঐতিহাসিক বিষয় এবং সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেও ভাট কবিতা রচিত হয়ে থাকে।

ভরত চন্দ্র সরকার ভাট কবিতার একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর বয়স ৭৫ বছর। তিনি মেলা-মচ্ছবে এবং হাটে-বাজারে দাঁড়িয়ে ভাট কবিতা সুর করে পাঠ করে ক্রেতাদের আকর্ষণ করেন এবং বিক্রি করেন। তাঁর ঠিকানা–পিতা : মৃত শরত চন্দ্র সরকার, মাতা : মৃত মনমোহিনী সরকার, গ্রাম : বিষ্ণুপুর দত্তপাড়া, ডাকঘর : কাদিরগঞ্জ, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ। তাঁর বাড়িতে ১০ দিন যাতায়াতের পর তাঁরই রচিত একটি বহুল জনপ্রিয় ভাট কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সংগৃহীত ভাট কবিতা-১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবের করুণ কাহিনি
এবং বাঙালির দুঃখের কবিতা

পল্লি কবি ভরত চন্দ্র সরকার
বিনীত কবিকার
গ্রাম : বিষ্ণুপুর ডাক : কাদিরগঞ্জ, থানা : শাল্লা
জেলা : সুনামগঞ্জ।
মূল্য : ১০ টাকা, রেজি নং–৪৪৬

www.pathagar.com

ওহে বিশ্বপতি এই মিনতি চরণে তোমার
লিখিতে কবিতা ১ বাসনা আমার ২ ॥
আমি অন্ধ হইয়া যাই বাইয়া বঙ্গবন্ধুর তরী,
এবারে শুনাব এক দুঃখের হিস্টরি।
বন্দি মাতা পিতা জন্মদাতা ওস্তাদ যে জন,
দার শোধিতে নেই ক্ষমতা থাকিতে জীবন ॥
গেল আইয়ুব শাই ২ নিল ভাই বাংলার বহু ধন,
ইয়াহিয়া আসিল দেশে মাতবর আরেকজন ॥
পরে গদি নিয়া ২ ভাবে মিয়া তামাকের দরকার,
পরশ্বি হুক্কা ভুট্টো এল ঠিক্কা মজুমদার ॥
এসে তিনে মিলে ২ দিলে দিলে যুক্তি করল সার,
এ জীবনে বাংলার তত্ত্ব ছারতাম না রে আর ॥
দেখে ছাত্রদলে ২ সবাই মিলে মিটিং আরম্ভিল,
রাজ বন্দীদের মুক্ত দাও ভাই দাবি জানাইল ॥
লাগল গণ্ডগোল ২ হুলুস্থুল সারা বাংলা জুড়ে,
কত করে মুক্ত করে আনল মুজিবেরে ॥
নতুন ভোটের পাল্লা ২ দিল হিল্লা বাংলাদেশে ভাই,
শেখ সাহেব দাঁড়াইল নৌকায় ভেবে মালেক শাই ॥
নৌকায় পাশ করিল ২ রেকর্ড হলো বিশ্বজুড়ে তার,
মাথায় হাত দিয়ে ভাবে ইয়াহিয়া সরকার ॥
মুজিব বাংলার নেতা ২ মোদের কথা কিছুই না শোনিবে,
ছয় দফার দাবি তার সব ঠিক রাখিবে ॥
চালাও কৌশল ফন্দি ২ করো বন্দি শেখ মুজিবেরে,
জীবন ভরে লাহোরেতে জেলে রেখে দিবে ॥
যাও টিক্কা মিয়া ২ সৈন্য নিয়া যত অস্ত্র পার,
ইচ্ছামতে বাঙালিরে লাইন করে মার ॥
এইসব যত দল ২ পশু সকল বাংলাতে আসিল,
শেখ সাহেবকে নিয়া মিটিং এগার দিন হলো ॥
পরে শোনা গেল ২ টিক্কা হলো গভর্নর বাংলার,
বলে ২৪ ঘণ্টায় বাঙালিদের করিব ছারখার ॥
২৫ শে মার্চ তারিখে ২ ঢাকার বুকে রাত্র ভাই দশটায়,
হঠাৎ করে কামান বোমার শব্দ শোনা যায় ॥
কেউবা ঘুমের ঘরে ২ রাস্তায় পরে প্রাণটি কেউ হারাল,
পশ্চিমাদের কুমন্ত্রণা কেহ না জানিল ॥
করল কার্ফো জারি ২ ঢাকার বাড়ি লুট আরম্ভিল,
কত শত নারীদেরে ধরে নিয়া গেল ॥
বাংলায় পড়ল সারা ২ বাঙালিরা অবাক হয়ে গেল,

www.pathagar.com

এরপর দিনে শেখ সাহেবকে বন্দি করেছিল ॥
নিয়া লাহোরেতে ২ কি মতে আবদ্ধ রাখিল,
খোদা বিনে অন্য কেউ আর জানতে না পারিল ॥
সারা বাংলাদেশে ২ রাক্ষস ভেসে পাঞ্জাবী চাইল,
অকৈইত অত্যাচার কত করিতে লাগিল ॥
মারল বুদ্ধিজীবী ২ ছাত্র কবি সীমা-সংখ্যা নাই,
মসজিদ, মন্দির, গীর্জা কত পুড়ে করল ছাই।
দারুণ জঙ্গী শাহী ২ রাজশাহী বগুড়া রংপুর,
কুষ্টিয়া বরিশালে জেলা পাবনা দিনাজপুর ॥
মানুষ নিরূপায় ২ কোথায় যায় পালাবে কোথায়,
চতুরদিকে কামান বোমা শব্দ শোনা যায় ॥
রাত্র দ্বিপ্রহরে ২ অন্ধকারে দলে দলে যায়,
রাস্তায় আবার চোর ডাকাতে তাদেরে আটকায় ॥
সঙ্গে যা পায় ২ নিয়া যায় করে অত্যাচার,
মেয়েদেরে নিয়ে পুরুষ ঠেকছ রে এবার ॥
দারুণ পাঞ্জাবীরা পাড়ায় পাড়া কুমতলবে ঘুরে,
মেয়ে ছেলে না পাইলে আগুন দিয়া পুড়ে ॥
মানুষ ঘর ছেড়ে ২ রাস্তায় পড়ে অনাহারে মরে,
দুধের শিশু মায়ের কোলে কান্দে কান্দে মরে ॥
এরূপ দিন যায় ২ আয়রে আয় বাড়ে কেমন বাড়ে,
বাঙালি পাইলে তারা লাইন করিয়া মারে ॥
একা ঠিকা দায় ২ টিক্কা বেটায় দিচ্ছে আগুন জ্বেলে,
সোনার বাংলা পুড়ে ছারখার সেই টিক্কার অনলে ॥
যায় না নৌকা বাইয়া ২ জল খাওয়া নদীনালা যত,
মানুষ মরে ভেসে আছে মাছ মরার মতো ॥
আবার শহর ছাড়ি ২ জীপে চড়ে গ্রামে গ্রামে যায়,
বাঙালিরা কোথায় আছে খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
ক্রমে ভাটি দেশে ২ আষাঢ় মাসে গানবোটে ছড়িয়া,
ঢাকা হইতে সিলেট যায় শেরপুর নামিয়া ॥
অমনই যথায় তথা স্প্রিট বোট চালায় গ্রামে গ্রামে যায়,
হাঁস মুরগি কতই তারা ধরে নিয়ে খায় ॥
পেয়ে পরার ধন ২ কুকুরের মতো কামড়া কামড়ি করে,
পেট ফুলিয়ে কতটি যে ঘোড়ার মতো মরে ॥
গেল প্রথম খণ্ড ২ দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক শোনা যাবে,
লিখিতে তাদের বার্তা কবি প্রস্তুত হবে ॥
এসে বাংলাদেশে ২ রাক্ষস বেশে খাইশে গোস্ত ঘি,
জানোয়াররা বুঝতে নারে মায়ের আদর কী ॥

www.pathagar.com

দেখুন জিজ্ঞেস করে ২ ঢাকা ছেড়ে আসিয়াছে যারা,
স্বচক্ষেতে হত্যা লীলা দেখিয়াছে তারা ॥
কত শিশুদেরে ২ জোর করে মায়ের সামনে নিয়া,
হত্যা করে আছাড় মারে মা থাকে চাইয়া ॥
দেখে মায়ের প্রাণে ধৈর্য মানে কেমনে বলো ভাই,
করে কত অবিচার লেখাঝোকা নাই ॥
কত লেংটা করে মেয়েদেরে রাস্তা ঘাটে নিয়া,
পিতার সামনে পুত্র কত ফেলিছে মারিয়া ॥
কভু বোমা ফেলে ২ যায় চলে বিমানে চড়িয়া,
বড় বড় গ্রাম বন্দরের ছিন্ন রাখে নাই ॥
এমন কত শত ২ অবিরত করহে অবিচার,
মেয়েদের উপরে চালায় পশুর ব্যবহার ॥
খবর পাওয়া যায় ২ সিলেট জেলা বন্দরের উপর,
বহু মানুষ মারছে তারা শুণ্যে করে ভর ॥
মানুষ শহর ছেড়ে ২ এক কিনারে আসিল সবাই,
কৃষক চাষী ভদ্র কত আমাদের মা ভাই ॥
মরছে অনাহারে ২ শিশু কোলে দৃশ্য যে ভীষণ,
গাছের পত্র ঝড়ে পরে শুনিলে ক্রন্দন ॥
আবার সুনামগঞ্জে ফেঞ্চুগঞ্জে ২ বাজার ও বন্দর,
করছে কত অত্যাচার পশ্চিমা বর্বর ॥
আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২ বোমা মারিয়া বহু মানুষ মারে,
একছত্র রাজাকার ঢাকার উপরে ॥
কবিতা বলব কত ২ আছে যত তাদের বিবরণ,
চিটাগাঙ্গে করছে কত কাণ্ড যে ভীষণ ॥
বিশাল গণ্ডগোল ২ কান্নার রোল বাঙালির ঘরে,
মায়ের সামনে কত ছেলে ২ ফেলছে তারা মেরে ॥
কত কূলবধু ২ কান্দে শুধু নীরবে বসিয়া,
চোখের সামনে স্বামী মারে বুকে গুলি দিয়া ॥
কয়টি মিলিটারী ২ ঢাকার বাড়ি কি কাণ্ড ঘটায়,
হঠাৎ একটি দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে যায় ॥
ঘরে একটি ছাত্রী ছিল কী করিল শোনেন তার কাহিনি,
কহিতে মোর প্রাণ ফেটে যায় চোখে আসে পানি ॥
মেয়েটি কেঁদে বলে ২ ভাই বলে বলি গো তোমারে,
আমার ধনরত্ন সব নিয়ে যাও গো ছুঁইও না আমারে ॥
এত কথার পরে ২ মেয়েটিরে জুড়েতে ধরিয়া,
অত্যাচার চালাইছে বেঈমান বেহুশ অইয়া ॥
মেয়ে মারা গেল ২ চেয়ে রইল চোখ দুইটি,

www.pathagar.com

তার মরণকালে বলে গেল জয় হোক বাংলার ॥
কলম নাহিহি চলে ২ কী বলে লিখিব কবিতা,
বিন্দুমাত্র মিথ্যা নহে সবই সত্য কথা ॥
ঢাকায় মানুষ নাই ২ পুড়ে ছাই শ্মশানেরই প্রায়,
আশে পাশে ছিল যারা ভয়েতে পালায় ॥
সঙ্গে পয়সা নাই ২ লাইন নাই যাইবে কোথায়,
হেঁটে হেঁটে চলছে তারা যেদিকে চোখ যায় ॥
কত বিদ্ধান মেয়ে ২ এম.এ, বি.এ অফিসারে স্ত্রী,
মানুষ দেখবে দুড়ের কথা সূর্যেও দেখেনি ॥
চলছে অনাহারে ২ শিশু কোলে দৃশ্য যে ভীষণ,
গাছের পত্র ঝরে পড়ে শুনিলে ক্রন্দন ॥
বেঈমান ইয়াহিয়া ২ শুনেন যাইয়া কী দিয়েছে ভাষণ,
বলে বাংলাদেশে গোলমাল নেই মেনেছে শাসন ॥
ইন্ডিয়ায় মিথ্যা কয় ২ মহাশয় প্রাণে কী আর সয়,
টিক্কা ভুট্টোর যে সব কথা আধাও সত্য নয় ॥
বাঙালির জানে প্রাণে ২ শত্রুগণে করিছে দমন,
মারে যত দায় তত বাংলার সেনাগণ ॥
শুধু একই বাণী ২ জয় জানি বাংলার হবেই হবে,
বিশ্বের বুকে বাঙালির নাম রেকর্ড হয়ে রবে ॥
আরেকটি আজব কথা ২ শুনেন শ্রোতা আশ্চর্য ব্যাপার,
এমন মহামানুষি সাহসী হয় না জগতে কেহ আর ॥
নামটি রওশন আরা ২ বি.এস.সি পড়া কলেজের ছাত্রী,
দেশ রক্ষা করিতে সাজলেন মরণ পথযাত্রী ॥
বয়স ১৭ কি ১৮ ভাই সবে মাত্র হলো,
দেশ রক্ষা করিবার তরে কী প্রকারে মইল ॥
একটি টেঙ্ক মারিল ২ নিজে মইল বোমা বেঁধে বুকে,
রওশন আরার নামটি রাখুন স্বর্ণাক্ষরে লিখে ॥
দেখ কী প্রকারে ২ দেশের তরে নারী জাতি হইয়া,
বহু মানুষ বাঁচাইল নিজের জীবন দিয়া ॥
ছিল বীরঙ্গনা ২ বীর রওশানা বীর ভূমি বাংলায়,
রওশন আরার স্থান যেন হয় বেহেস্তের এক কোণায় ॥
আরেকটি বীর বাঙালি যাচ্ছি বলি জলসুখা নিবাসী,
শ্রীহট্ট জেলাতে ছিল অসীম ও সাহসী ॥
বাবু জগৎ জ্যোতি ২ কি শক্তি ছিল তার বাহুতে,
১৭টি পাঞ্জাবী সেনা মরছে তার গুলিতে ॥
হয়ে নিরূপায় ২ বলছে হায় গুলি সব ফুরাইল,
সুযোগ পেয়ে বেঈমানেরা গুলি আরম্ভিল ॥

www.pathagar.com

জ্যোতি বিদায় নিল ২ সবে বলো হোক তার শদ্‌গতি,
স্বর্গে যেন জ্যোতির নামে জ্বলে ঘৃতের বাতি ॥
আরেকজন চেয়ারম্যান ২ সবাই শুনে কাকাইলছেও নিবাসী,
বহু লোকে আশ্রয় পাইলাম এই গ্রামেতে আসি ॥
নাম তার নুরুল হক ২ ভদ্র লোক হিংসা নিন্দা নাই,
বহু টাকা বিলাইল গরীবদেরে ভাই ॥
তাই বলে যাই ২ ওরে ভাই বাংলার জনগণ,
খোদায় যেন দেয় তারে ভাই বহু রত্ন ধন ॥
তাই সুখী হলাম ২ ধন্য দিলা চেয়ারম্যান ও ভাই,
এমন লোক বাংলায় হউকত স্বার্থ যাদের নাই ॥
গেল দ্বিতীয় খণ্ড ২ তৃতীয় খণ্ডে অনেক শুনা যাবে,
লিখিতে তাদের বার্তা কবি প্রস্তুত হবে ॥
আমি ভরত বাংলার ছেলে ২ যাচ্ছি বলে বাঙালির সন্তান,
মোদের দরদ কী বুঝিবে বিদেশী বেঈমান ॥
দেখ কী প্রকারে ২ মানুষ মারে দয়ামায়া নাই,
ব্যাংক ডাকাতি চুরির কথা অনেক শুনতে পাই ॥
গেলে বুড়িগঙ্গায় ২ দেখা যায় মরা ভেসে যায়,
গনবেন কত শত শত শেয়াল শকুনে খায় ॥
বাঙালির আছে যারা ২ নিরক তারা থাকিতে কী পারে,
হাতে টেনে মাথা চিরে একটা যদি ধরে ॥
যুদ্ধের রব উঠিল দুশমন এল হউরে সাবধান,
হাতে হাতে লও হাতিয়ার, সাড়ে সাত কোটি সন্তান ॥
তোরা রোকে দাড়া ২ টাউন পাড়া পল্লিবাসী সব,
বাংলাদেশে উঠে গেছে যুদ্ধের কলরব ॥
বাঙালি জেগেছে ২ জিতা আছে দূরে বহুদূর,
সবে মুখে স্বাধীন বাংলা এই শুভ ভাই সুর ॥
সবাই এই বলিয়া ২ বুক ফুলাইয়া রনে আগুয়ান,
ভয় করো না বাংলার ছেলে বাংলার জোয়ান ॥
যেমন ময়নামতি ২ বাংলার জাতি রেখেছে ঘেরিয়া,
তেমনি রকম সব জায়গাতে আছে ওৎ পাতিয়া ॥
মুজিবের আসল সেনা ২ দেনি হানা আরো বাকি আছে,
একদিন হিসাব নিকাশ দিতে হবে বাঙালির কাছে ॥
তুমি যা খেয়েছো ২ যা নিয়েছো বাংলাদেশের ধন,
তোমার মতো বেঈমান বিশ্বে নাই অন্যজন ॥
ওরে দেশ ভক্ত ২ তোদের রক্ত হবে না বিফল,
তোদের পক্ষে নেমে আসবে প্রভুর সৈন্যদল,
গেল বৈশাখ মাস ২ দুঃখের শ্বাস বাঙালিরা পেলে,

www.pathagar.com

আষাঢ় মাসে যা করছে ভাই কী বলব আল খোলে ॥
কত মেয়ে নিল ২ দেশ পুড়িল সীমা সংখ্যা নাই,
বড় বড় পুঁজিপতি দালাল হলো ভাই ॥
পেয়ে ঘুষের বস্তা ২ বিকায় সস্তা বাঙালির রমণী,
পুষ্যি পুত্র হইল একদল রাজাকার বাহিনী ॥
তাদের কৃত্বি কলাপ ২ বাক্য লাভ অতি চমৎকার,
বান্দররা করেছে নষ্ট সোনার সংসার ॥
তারা বাপ পেতেছে ২ মা দিয়েছে ইয়াহিয়া ডাকি,
ভগ্নিপতি পাঞ্জাবীর জাতি রাজাকার দল ডাকি ॥
দেখায় বাঙালিরে ২ যথা যারে পায় ঘরে বাইরে,
ইচ্ছামতে লাইন করে গুলি করে মারে ॥
পরে লুট করে ২ পেট ভরে এই সব চোরের দল,
টিক্কা বেচারীর পুত্রের হলো বহু রত্ন ধন ॥
বাঙালি দালাল ছাড়া ২ সবাই তারা প্রাণ নিয়া পালায়,
কী করিবে ঠিকতে নারে রাজাকারের জ্বালায় ॥
ছিল গোলা ভরা ২ গোয়াইল ভরা ধান গরু ভাই কত,
ভাদ্র মাসে রাজাকার এসে পুড়ে ভস্মিভূত ॥
গেছলাম ইন্ডিয়ায় ২ হায়রে হায় বাউয়াল মেঘালয়,
বালাটের দক্ষিণধারে মইলাম বাজার কয় ॥
মানুষ অত্যাধিক ২ গণা দিক কার খবর কে লয়,
আমি আট নাম্বারে পশ্চিম দিকে নিলাম এক আশ্রয় ॥
একটি উড়াবাধি ২ পুড়ে রোগে মেঘে ভিজি ভাই,
ইন্ডিয়া সরকারের কৃপায় রেশন পাইয়া খাই ॥
দেখি কী করে ২ সরকারে সেই আশাতে আছি,
ভারত নেতাদের কৃপায় যদি এবার প্রাণে বাঁচি ॥
শ্রীমতি ইন্দিরা ২ বাঙালি যারা ভারতে শরনার্থী,
রেশন দিচ্ছে বহু বিস্তর কত দিবারাত্রি ॥
বাঙালির নিজ সম্বল ২ দিচ্ছে কম্বল শীতের বস্ত্র কত,
হায়ার অফিসার, মন্ত্রী মিনিস্টার আসে অবিরত ॥
দিয়েছে শিশুর খাদ্য ২ রোগীর পথ্য ঔষুধ ডাক্তার কত,
চিকিৎসালয় রোগীর আশ্রয় নার্স শত শত ॥
বাঙালির দুঃখ তরে ২ কত রাষ্ট্র ঘুরে দিয়েছে স্বীকৃতি,
সেই মহান দেবীকে আমরা জানাই শ্রদ্ধা প্রীতি ॥
বাঙালির ভাঙা বুকে ২ ম্লান মুখে যে আনিল আশার সঞ্চার,
অন্ধ ভরত বলে প্রাণকুলে করি নমস্কার ॥
গেল দুঃখের দিন ২ বাংলা স্বাধীন এত দিনে হলো,
যারা প্রাণ দিয়েছে জয় এনেছে তাদের জয় বলো ॥

www.pathagar.com

বাঙালির সংগ্রাম ২ অবিরাম চলবে আরো চলবে,
যতদিন না দেশ দরদী দেশে ফিরে আসবে ॥
আমরা লড়ব ২ মরব চাই যে মোদের নেতা,
শান্ত হব যেদিন শুনব নেতার মুখের কথা ॥
খোদার দয়া হলো ২ মুক্তি পেল মুজিবুর রহমান,
আনন্দে আজ বাংলাদেশে জমিনও আসমান ॥
এই খুশির দিনে ২ কবির মনে দুঃখের পড়ল সারা,
রাগ হবেন না উচিত কথায় হেথায় আছেন যারা ॥
বড় দুঃখের বিষয় ২ আফসোস হয় রেশনের বেলায়,
বাঙালি বাবুরা দেখছি বাঙালি ঠকায় ॥
এটা গণ্ডগোল মহাভুল যে বাবুরায় করে,
মধ্যে মধ্যে উত্তম মধ্যম পিঠেও কিছু পড়ে ॥
মোদের কাণ্ড দেখে ২ আড়াল থেকে খাইসারায় হাসে,
কত লোকে কত কাজে এদিক ওদিক বসে ॥
দেখে হাসি পায় ২ মেয়েরা যায় হেটিং ফেটিং করি,
তাদের দেখে পুরুষ লোকে রাস্তা দিচ্ছে ছাড়ি ॥
পড়লে টিশো শাড়ি ২ হাতে ঘড়ি নকশা জুতা পায়,
চোখ দুটি তার অন্ধ বুঝায় কাজলের ঠেলায় ॥
একটি রুমে ভাই ২ শুনতে পাই ঝগড়া শুনা যায়,
স্বামী স্ত্রীতে করছে ঝগড়া কে কারে খাওয়ায় ॥
আমি রেশন পাচ্ছি রেশন খাচ্ছি তুমি আমার কী,
বুঝে শুনে উত্তর দিও বলে দিয়েছি ॥
মেয়েটি বিদ্যান বুঝি ২ ভাবে বুঝি কথায় যা বাকনি,
বলে তুমি No objection No connection খাওয়াউনি ॥
আরেকটি ঘটনা ২ বন্ধু জনা জরুরি খবর,
মইলাম কেম্পেতে দেখতে পেলাম আগুনের ডর ॥
এথায় রাজাকার আসে ২ ছদ্ম বেশে সবাই শুনতে পাই,
আগুন থেকে রক্ষা পেতে হুশ থেকো সবাই ॥
বধূর ডাল সম্বাসে ২ ক্যাম্পনাশে রান্নার বেলায় রাগ,
সাবধানে জ্বালাইও সবাই শিবিরে আছে বাঘ ॥
আমি কবি ভাই ২ শুনেন ভাই শ্রোতা বন্ধুগণ,
ভুল ত্রুটি হইলে আমায় করিবেন মার্জন ॥
বলছে ভরত দাস ২ করল প্রকাশ কবিতায় লাহিরি,
সুনামগঞ্জে জেলা আমার বিষ্ণুপুরে বাড়ি ॥
থানা শাল্লা ২ এই ঠিকানা শ্রোতাবন্ধু ভাই,
ডাকঘর আমার কাদিরগঞ্জে সবাইকে জানাই ॥

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে নিরক্ষণ গ্রামীণ মানুষ বংশ পরম্পরায় কারিগরি শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নানা ধরনের সামগ্রী নির্মাণ করে আসছেন। নিত্যব্যবহার্য জিনিস থেকে শুরু করে কৃষিকাজে এসব সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। গ্রামীণ মানুষের নির্মাণ করা এসব সামগ্রীই বস্তুগত লোকসংস্কৃতি হিসেবে বহুল পরিচিত। বস্তুগত লোকসংস্কৃতির কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. নকশিকাঁথা

সবচেয়ে বহুলপরিচিত লোকশিল্পকর্ম হচ্ছে নকশিকাঁথা। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামীণ নারীরা নকশি কাঁথা তৈরি করে আসছেন। এটি এখন অনেকটা ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। নকশি কাঁথাবিষয়ক বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ করেই পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *নকশী কাঁথার মাঠ*। সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা নকশি কাঁথার ব্যবহার অনেকটাই বেড়ে গেছে। নকশি কাঁথার মধ্যে ছোট-বড় নানা ধরনের লেপ কাঁথা, শুজনি কাঁথা, রুমাল কাঁথা, আর্শিলতা, গিলাফ, জায়নামাজ, আসন কাঁথা উল্লেখযোগ্য। এসব কাঁথা সুনামগঞ্জে 'খ্যাতা' নামেও বহুল পরিচিত।

শহরে নতুন কাপড় ব্যবহার করে কাঁথা তৈরির রেওয়াজ প্রচলিত হলেও সুনামগঞ্জে এখনো সেই পুরোনো রীতিতেই নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়। মহিলাদের পুরোনো শাড়ি কাপড়, পুরুষদের লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি দিয়ে কাঁথা বানানো হয়। রঙিন সুতা দিয়ে সেলাই করে নানা ধরনের নকশা করে কাঁথাগুলোর আলাদা বিশেষত্ব দেওয়া হয়।

কাঁথায় নানা ধরনের আল্পনা এঁকে থাকেন প্রান্তিক এসব নারীরা। নিরক্ষর মানুষ হওয়ায় ভুল বানানে 'ভুলো না আমায়', 'মায়ের দোয়া, 'ভালোবাসি তোমায়', 'আল্লাহু', 'বিসমিল্লাহ', 'জয় দুর্গা' এ জাতীয় অনেক কথা কাঁথায় সূচের ফোঁড়ে লেখা হয়ে থাকে। এসব কথা লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও ফুল, পাখি, পশু, গাছসহ প্রকৃতির নানা বিষয় কাঁথায় সূচ-সুতার সাহায্যে তুলে ধরা হয়। এসব কাজে কোনো কোনো সময় সূচশিল্পীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা-বিরহের অনুভূতিও স্থান পায়।

২. মৃৎশিল্প

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে মৃৎ-শিল্পের কারিগরেরা মাটি দিয়ে লক্ষ্মী প্রতিমা, হাঁড়ি, পাতিল, ডেকচি, সরা, কলসি, সান্‌কি, টুপা, মালসা, কড়াই, থালা, চাড়ি, টব, পুতুল, ব্যাংক, পাখি, ময়ূর, হাতি, টিয়া, ষাঁড়, মহিষ, হাঁস, মোরগ, খরগোশ, বাঘ, সিংহ, খেলনাসহ নানা ধরনের সামগ্রী তৈরি করে থাকেন।

www.pathagar.com

কুমারদের তৈরি করা মূর্তি

www.pathagar.com

এসব সামগ্রী প্রস্তুতের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের 'কুমার' কিংবা 'পাল' নামেও অভিহিত করা হয়। সাধারণত এসব সামগ্রী নির্মাণে লাল এঁটেল, কালো এঁটেল জাতীয় মাটি কুমারেরা ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষ ও নারী উভয়ই মৃৎশিল্প প্রস্তুতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। নির্মিত এসব সামগ্রী পাইকারি ও খুচরা দরে পুরুষেরা বিভিন্ন হাটবাজারে বিক্রি করে থাকেন। এর বাইরে জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ মেলা-উৎসবে এসব সামগ্রী বিক্রি হতে দেখা যায়। প্লাস্টিক, মেলামাইন ও অ্যালুমিনিয়ামের দাপটে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের পসার আর রমরমা ব্যবসা হারিয়ে গেলেও কোনো কোনো গ্রামীণ বাড়িতে এসব সামগ্রীর আবেদন ঠিকই রয়েছে।

৩. বাঁশ-বেতশিল্প

বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা সামগ্রীর সুনামগঞ্জে আবেদন রয়েছে। নিজস্ব এলাকায় উৎপাদিত বাঁশ ও বেত দিয়ে প্রস্তুতকৃত মোড়া, লাঠি, ঝুড়ি, পাটি, কুলা, কাণ্ডা, সরপোশ, ডালা, দোলনা, সেলফ, কুছি, পাখা, উছু, টুরর্কি, গরুর টুয়া, কাছা, খলুই, চাঙ্গা, দুছন, ঢালা, খালুই, মাছ ধরার পলো, চাঁই, টেবিল, চেয়ার, পাখি পোষার খাঁচা, মাছ রাখার খাঁচা, বাঁশের চাং প্রভৃতির চাহিদা ব্যাপক। নির্মাতারা এলাকার চাহিদা মিটিয়ে এসব সামগ্রী বাইরের উপজেলা ও জেলায়ও বিক্রি করছেন। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার সরমঙ্গল ইউনিয়নের বেতইর নদী তীরবর্তী রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে পেশাদার হস্তশিল্প নির্মাতারা রয়েছেন। প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ এ পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এ ব্যাপারে আলাপ হয় রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের হস্তশিল্প কারিগর মনিন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ :

সংগ্রাহক : আপনার নাম কি?
মনিন্দ্র : মনিন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।
সংগ্রাহক : কতদিন ধরে এ পেশায় জড়িত রয়েছেন?
মনিন্দ্র : প্রায় ৩০ বছর ধইরা এই কাম করতাছি।
সংগ্রাহক : সংসারের খরচ কি এসব বিক্রির আয় দিয়েই চলে?
মনিন্দ্র : হ। বাঁশের তৈরি উরা-কুলা বেইচ্যাই সংসার চালাই। পুলা-মাইয়ার পড়াশোনা সব ই-টাকায়ই চলতাছে।
সংগ্রাহক : সারাদিনে কেমন জিনিস তৈরি করতে পারেন?
মনিন্দ্র : পুরা দিনে ৫-৬ টা আগুল (উরা) বানাইতাম পারি।
সংগ্রাহক : এগুলো বিক্রি করে তাহলে কত টাকা আয় হয়?
মনিন্দ্র : বেছলে ৩৫০ থেইক্যা ৪০০ টেকা পাই।
সংগ্রাহক : আর এগুলো তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়?
মনিন্দ্র : বানানিত খরচ লাগে ১২৫ থেইক্যা ১৩০ টেকা।

৪. পাটশিল্প

পাট দিয়ে তৈরি করে বস্তা, ব্যাগ, মনিব্যাগ, থলে, ঝার, পর্দা, ম্যাট, কার্পেট, পাপোষসহ বিভিন্ন জিনিসের কদর সুনামগঞ্জে রয়েছে। পাটজাত এসব সামগ্রী হাতের নিপুণশৈলীতে তৈরি করে স্থানীয় হাটবাজারের পাশাপাশি দেশের অন্যত্রও বিক্রি করছেন এ কুটিরশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। এ থেকে প্রচুর মুনাফাও অর্জিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

৫. হাতপাখা

কাপড়ে আল্পনা তোলে চিকন বাঁশের ফলি দিয়ে হাতপাখা তৈরি করে থাকেন এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্মাণশিল্পীরা। এর বাইরে তাল পাতা, বাঁশ, রঙিন সুতা দিয়ে হাতপাখা তৈরি করা হয়। বাঁশের বেতি দিয়েও এক ধরনের কাপড়ের পাখাও হাওরাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। এসব পাখা গ্রামীণ মানুষের কাছে 'পাঙ্খা' ও 'বিছুন' নামে সমধিক পরিচিত।

৬. নকশিশিকা

গ্রামাঞ্চলে শিকা একটি ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা রেখে চলেছে। ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি হাঁড়ি-পাতিল, ফুলের টব, বীজধান সাজিয়ে রাখা থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহার্য কাজে শিকা অনন্যতা ব্যাপক। পাট, কাপড় কিংবা রশি দিয়ে শিকা তৈরি করা হয়। গ্রামীণ নারীরা সৌন্দর্যের দিকটি বিবেচনায় রেখে শিকায় নানা নকশা তোলেন। আকার, ব্যবহার ও নির্মাণশৈলীর কারণে একের শিকা একেক রকমের। নানা ধরনের শিকা রয়েছে, যেগুলোর প্রচলন এখনো সমানভাবে সুনামগঞ্জে চলছে।

নকশিকাঁথা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ভৌগলিক দিক বিবেচনায় হাওর অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর সুনামগঞ্জ জেলা। তবে লোকপোশাক-পরিচ্ছদ সেইভাবে এ অঞ্চলে প্রচলন নেই। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে দেশের অপরাপর অঞ্চলের মতোই এখানকার বাসিন্দা পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে থাকেন। গ্রামীণ এলাকা হওয়ায় সাধারণত সাত থেকে আট বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা উলঙ্গই থাকে। আরেকটু বয়স বাড়লে কেবল কাপড় দিয়ে তৈরি হাফ প্যান্ট পরা শুরু করে ছেলেরা এবং জামা ও পায়জামা পরা শুরু করে মেয়েরা। যদিও সাম্প্রতিককালে ছোট বয়সেই অনেক ছেলেমেয়েরা কাপড় পরতে শুরু করেছে, এরপরও সুনামগঞ্জের জনসংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে নেংটা থাকার প্রবণতাই প্রচলিত রয়েছে।

অতীতে একসময় সাধারণ গৃহস্থেরা একটি কাপড়ের টুকরো কিংবা গামছাকে কোমরে পেঁচ দিয়ে নেংটি আকারে পরিধাণ করতেন। এখন অবশ্য এমনটির আর প্রচলন নেই। তবে কাজের সময় সুনামগঞ্জের কৃষক, জেলে কিংবা শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে এখনো লুঙ্গি কিংবা গামছাকে নেংটির মতো করে পরিধান করার রেওয়াজের প্রচলন রয়েই গেছে। এসব নিম্নবিত্তশ্রেণির চেয়ে অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্তশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর ব্যবহার করে থাকেন। আর মুসলিম ধর্মালম্বীরা লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকেন। এর বাইরে চাকুরিজীবী পুরুষ এবং আধুনিক কালের তরুণেরা বিভিন্ন ধরনের শার্ট, প্যান্ট, টি-শার্ট, কোট, স্যুাট, সাফারি, ফতুয়া, সুয়েটার, জাম্পার, জ্যাকেট, মাফলার, জাইঙ্গা, মোজা, টুপি, পাজামা পরিধান করেন; মেয়েরা সালোয়ার কামিজ, থ্রি-পিস, ম্যাক্সি, প্যান্টি, ব্রা, ওড়না, বোরকা এবং মহিলারা শাড়ি, পেটিকোট/সায়া, ব্লাউজ পরিধান করে থাকেন। নানা রং-বেরংয়ের এসব পোশাক বাজার থেকে ভোক্তারা কিনেন।

গত এক যুগ আগেও বাজার থেকে কাপড় কিনে গ্রামীণ নারীরা নিজের হাতে স্বামী কিংবা সন্তানের জন্য পরিধেয় বস্ত্র সেলাই করে তৈরি করতেন। সূচের ফোঁড়ে নানা নকশা এসব কাপড়ে তুলতেন। এ সংস্কৃতি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনো কোনো কোনো গ্রামের গৃহবধূরা অবসরে নিজ হাতে কাপড় সেলাই করেন। বিশেষ করে সদ্যজাত শিশুদের জন্য কাঁথা থেকে শুরু করে কাপড়-চোপড় সেলাই এখনো প্রচুর পরিমাণে গ্রামাঞ্চলে হয়ে থাকে। এর বাইরে সুনামগঞ্জের গ্রামগুলোতে বর্ষায় যখন নারীরা অবসর সময় কাটান, তখন নকশি কাঁথা সেলাই করে থাকেন। নানা নকশায় তৈরি করা এসব নকশি কাঁথা লোকপোশাক-পরিচ্ছেদের একটা অন্যতম উর্বর জনসংস্কৃতি হিসেবে এখনো গ্রামীণধারায় টিকে রয়েছে। নকশি কাঁথা ছাড়াও গ্রামীণ

www.pathagar.com

নারীরা ঘর সাজাতে কাপড়ে সূচের ফোঁড়ে নানা ধরনের নকশা তৈরি করে ঘরের দেয়ালে সাঁটিয়ে থাকেন। বিছানা চাদর, বালিশের কভার, চেয়ারের ঢাকনাসহ বিভিন্ন কাপড়ের উপকরণে সেলাই করে সুন্দর করে তুলতেন। কাপড় ও ছোট্ট বাঁশ দিয়ে তৈরি কাঠি ব্যবহার করে হাতপাখাও গ্রামীণ নারীরা এখনো তৈরি করে থাকেন।

আগে পুরুষেরা নিত্য ব্যবহার্য জিনিস হিসেবে খড়ম ব্যবহার করতেন। জুতা বিশেষ এই খড়ম ছিল কাঠের তৈরি। সম্প্রতি খড়মের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। এর স্থলে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রস্তুতকৃত জুতা মানুষ দেদারছে ব্যবহার করছেন। তবে কোনো কোনো গ্রামে এখনো প্রবীণ ব্যক্তিরা দীর্ঘদিনের পরম্পরার অভ্যাসবশত খড়ম ব্যবহার করে আসছেন। কৃষকেরা খেতে কাজ করার সময় রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে তালপাতা এবং বাঁশে তৈরি ছাতা ব্যবহার করে থাকেন। নারীরা উৎসব-পার্বণসহ নিত্যব্যবহার্য জিনিস হিসেবে কাঁচের চুড়ি, ফিতে, নাকফুল, বাজু, বাজুবন্ধ, বালা, শঙ্খ, নূপুর, মল বাঁক খাড়ু, স্বর্ণ/রূপার আংটি, স্বর্ণ/রূপার চেইন ব্যবহার করে থাকেন।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

গত কয়েক দশক আগেও সুনামগঞ্জ জেলার হাতেগোনা কয়েকটি অবস্থাসম্পন্ন টিনশেড ও কাঠের খুঁটির দুচালা বাড়িঘর ছিল। আধাপাকা ঘর কিংবা দালানকোঠা ছিল কেবল জমিদার, তালুকদারসহ উচ্চবিত্তদের বাড়িতে। এর বাইরে বাদবাকিদের ঘর ছিল ছন কিংবা খড় অথবা মাটির। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটেছে। এখন অধিকাংশ বাড়িই টিন দিয়ে তৈরি। আধাপাকা কিংবা কংক্রিটের ঢালাইয়ে ছাদযুক্ত পূর্ণাঙ্গ দালানেরও অভাব নেই। একেবারেই নিঃস্বশ্রেণির মানুষেরা এখনো ছন কিংবা মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করছেন, তবে সেটা নেহাতই কম। অনেক সময় নদীর পাশে আগত বেদে-বেদনীরাও সাময়িক সময়ের জন্য তাবুর মতো বিশেষ এক ধরনের ঘর নির্মাণ করে থাকেন। এটা লোকস্থাপত্যের অন্যতম আকর্ষণ। লোকস্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে এসব ঘরের নির্মাণশৈলীর আবেদন কিন্তু নিছক কম নয়। ঘর ছাড়াও খড়ম, নকশিকাঁথাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষ এখনো লোকস্থাপত্য-নির্মাণের বিষয়টি ধরে রেখেছেন। এসব স্থাপত্যের কিছু নিম্নরূপ :

১. ছনের ঘর

সুনামগঞ্জ অঞ্চল দেশের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল। এখানে অনেক দরিদ্র পরিবারের বসবাস। এরফলে ইচ্ছে সত্ত্বেও এখানকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই ভালোভাবে বসতি ঘর নির্মাণ করতে পারেন না। তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে অনেকেই ধানের বিচালি, নাড়া, খড় কিংবা ছন দিয়ে ঘর তৈরি করে থাকেন। অনেক সৌখিন গৃহস্থদের টিনশেডের ঘর থাকা সত্ত্বেও তারা ছন/উলুছন দিয়ে বৈঠকখানা, লাখরি ঘর, কুঁড়েঘর, বাহিরঘর, গোয়াল ঘর কিংবা গ্রাম্য বিচারের জন্য মজলিস ঘর তৈরি করে থাকেন। নির্মিতব্য ঘরে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস লাগে সেজন্য এসব ঘর সাধারণত পূর্ব ও দক্ষিণমুখী করে নির্মাণ করা হতো। বৈশাখ মাসে যখন ধান ওঠা শেষ হয় তখন প্রায় গ্রামেই ছনের ঘর তৈরির ধুম পড়ে। আগে একে অন্যের বাড়িতে স্বেচ্ছাশ্রমে ঘর নির্মাণ করে দিতেন। এর বিনিময়ে যে বাড়িতে ঘর ওঠানো হতো, ওই বাড়ির গৃহস্থ মাংস-মাছের আয়োজন করে ভালোমন্দ রান্না করে ঘর তৈরির মানুষদের খাওয়াতেন। এভাবে স্বেচ্ছাশ্রমে ঘর তৈরির বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রয়াত বাউলসাধক শাহ আবদুল করিম একটা গান রচনা করেছিলেন। এটি নিম্নরূপ :

চাল ছানিত্ কামলা চাচা দিলায় না
মাইয়ে করলা মুরুগ জবো
আইয়া তুমি খাইলায় না ॥
চাইচ্চে হিদিন মুরুগ লইয়া
মাইর লগে ঝগড়া করিয়া
গোসা করি গেছইন কইয়া

www.pathagar.com

তোমরার বাড়িত্ যাইতাম না।
বন্দেপাত্রে থাকি আমরা
ঝগড়া করলা তারা তারা
এই বিষয়ে ভালাবুরা
আমি কুন্তা জানি না ॥
আরিপরি মিইল্যা খাওন
ভালা-বুরায় খবর লওন
বেহুদ্দা ঝগড়াকরণ
ইতা আমি ভালা পাই না।
পারি না মাইরে বুঝাইয়া
তাইন কিছু বেনারাইয়া
যেছা একটা কথা লইয়া
ধরলে কথা ছাড়ইন না ॥
আমি ইতা কানো লই না
আনাকামে মাত্ বেশাই না
পরের কথায় ফাল মারি না
ঝগড়া ফসাদ ভালা না।
মন থাকি ইতা ছাড়ি দিও
করিমরে মন্দ কইও
বিয়ালে চাচা বেড়ানিত্ যাইও
দুইন্যাই বেটা কুন্তা না ॥

মাটির ঘর

www.pathagar.com

এখন অবশ্য গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাশ্রমে কেউ কাউকে ঘর তুলে দেয় না বললেই চলে। টাকার বিনিময়ে কামলা নিয়ে ঘর তৈরি করতে হয়। কিংবা যারা টাকা দিতে অক্ষম তারা নিজেরাই ঘর-সংস্কারের কাজ করে থাকেন। যারা এসব ঘর নির্মাণের সঙ্গে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তাদের 'ঘরামি' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

২. মাটির ঘর

ছনের ঘর নির্মাণেরও ক্ষমতা যাদের নেই তারাই কেবল মাটির ঘর নির্মাণ করে থাকেন। চালা হিসেবে খড় দিলেও ঘরের বেষ্টনীতে তারা বাঁশের কঞ্চি আর চাটাইয়ের বেড়ার সঙ্গে মাটির প্রলেপ ব্যবহার করেন। তবে গরমের দিনে মাটির ঘরে শীতলতা খুবই আরামপ্রদ। মাটি দিয়ে ঘর নির্মিত হলেও সেসব ঘরের নির্মাণশৈলী খুবই চমকপ্রদ। বাড়ির নারীরা চালের গুঁড়ি দিয়ে পানির সঙ্গে মিশিয়ে এক ধরনের রং প্রস্তুত করে সেসব দিয়ে নির্মিত ঘরটির দেয়ালে ফুল-পাখি-গাছসহ নানা ধরনের আলপনা অঙ্কন করেন। এতে ঘরটির ভেতরের সৌন্দর্য যে-কাউকেই আকর্ষণ করে।

৩. লাছ

বৈশাখ মাসে হাওরাঞ্চলের একমাত্র বোরো ধান ওঠানো শেষে ধানের নেড়া/খড় বাড়িতে জড়ো করে থাকেন কৃষকেরা। অনেক সময় বৈশাখ মাসের শেষ দিকে কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু থেকে মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ধান কাটা, মাড়াই ও রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণের পরই খড়ের গাদায় হাত দিয়ে থাকেন গৃহস্থেরা। রোজবন্দী কামলা কিংবা স্বেচ্ছাশ্রমে নিয়োজিত মানুষদের নিয়ে এসে খড়গুলোকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে উঁচু করে স্তূপাকৃতি করা হয়। অঞ্চলভেদে স্তূপাকৃতি এই খড়ের দলাকে 'লাছ' এবং 'খড়ের পুঞ্জি' বলা হয়ে থাকে। অল্প পরিমাণ একটু জায়গাতে লম্বা বাঁশের খুঁটি গেড়ে এর চারপাশে খড় ফেলে লাছ তৈরি করা হয়।

এটি দেখতে গোলাকার পাহাড়ি ঢালুকৃতির। এটির নির্মাণশৈলী এতই মজবুত ও শক্ত যে, পরবর্তীতে তীব্র বৃষ্টি হলে খড়ের গাদাটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় না। খড়ের পরিমাণ অনুযায়ী পাঁত থেকে ছয় ঘণ্টা লাগে 'লাছ' নির্মাণ করতে। যেদিন 'লাছ' তৈরি করা হয় ওই দিনটিতে অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থেরা সাধ্য অনুযায়ী গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী এবং ভিন গ্রামের পরিচিত স্বজনদে মাছ-মাংস দিয়ে আহার করিয়ে থাকেন। এটাকে বলা হয় 'খেড়ের লাছের নিমন্ত্রণ'। সাধারণত 'লাছ' তৈরি করা হয় বাড়ির গরুগুলোর খাবার হিসেবে খড়কে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। যুগের পর যুগ ধরে চলা আসা এ সংস্কৃতি এখনো হাওরাঞ্চলে সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকমুখে প্রচলিত গানগুলোকে সাধারণত লোকগান বলা হয়। এসব গানের গীতিকারদের নাম-পরিচয় প্রায়ক্ষেত্রেই অজানা। তবে অধিকাংশ গীতিকার রয়েছেন, যাঁরা নিরক্ষর হওয়ার কারণে তাঁদের রচিত গান কোনো পাণ্ডুলিপি আকারে রেখে যেতে পারেননি। গানপ্রিয় হাওরবাসীর মুখে মুখে এসব গান সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। এসব গীতিকারদের রচিত গান সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই সংকলিত ও গ্রন্থিত করছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে এসব লোকগানের সুর ও কথার আদলে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই গান রচনা করছেন। গবেষকদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে সেসব গানও লোকগানের মর্যাদা পাচ্ছে।

লোকগানে নিপীড়িত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আনন্দ-বেদনা-সুখ-দুঃখের কাহিনি ঠাঁই পেয়েছে। সমাজে নিম্নবর্গীয় হিসেবে পরিচিত এসব মানুষের প্রেম-ভালোবাসা-অনুভূতিকে ধারণ করে রেখেছে লোকগান। সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ভাষায় এসব গানের পঙ্‌ক্তি রচিত হওয়ায় তা সহজেই নিরক্ষর নিম্নবর্গীয় সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর ফলে যুগ যুগ ধরে লোকসংগীতের আবেদন গ্রামীণ মানুষের কাছে অনন্য বিশিষ্টতা পেয়ে আসছে। এ গান গাওয়ার জন্য শিল্পীকে গুরুর কাছে কোনো তালিম নিতে হয় না। অনেকটা ঐতিহ্য-পরম্পরায় মা-বাবা-দাদা-দাদী-নানা-নানী-খালাদের কাছ থেকে এসব গানের সুর, তাল ও লয় শেখেন হাওরের মানুষেরা। অনেকটা দেখে-দেখে শেখা–এমনটাই বলা যেতে পারে। এসব গানের ভাষাগত দুর্বলতা কিংবা ছন্দজ্ঞান কখনোই হাওরবাসীর কাছে প্রতিবন্ধকতা রূপে গণ্য হয় না, কেবল সঠিক সুর এবং বিনোদনপ্রিয় কি না সেটাই হাওরবাসী যাচাই করে নেন। হাওরবাসীর নিজেদের জীবনযাপন ও রীতিনীতিগুলোই এসব লোকগানে প্রাধান্য পাওয়ায় সেসব গানের আলাদা কদর তৈরি হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলার লোকসংগীতের মধ্যে বাউলগান একটি সমৃদ্ধ ধারা ধরে রেখেছে। হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিম, দুর্বিন শাহ, ক্বারী আমিরউদ্দিন, শফিকুন নূর, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, কফিলউদ্দিন সরকার, রোহী ঠাকুরসহ অনেকেই গান রচনা করে এ জেলার বাউলগানকে অনন্য মর্যাদায় উদ্ভাসিত করেছেন। রাধারমণ, প্রতাপরঞ্জন তালুকদার, মধুসুদন দাস, কাশীনাথ দাশতালুকদারসহ প্রখ্যাত গীতিকারেরা কীর্তন ও মেয়েলি গীত রচনা করে লোকগানে সুনামগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তৈরি করে নিয়েছেন। এছাড়া লোকগানের প্রচার ও প্রসারে প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, রামকানাই দাশ, সুষমা দাশ, চন্দ্রাবতী রায়বর্মণদের অবদানও নিছক কম নয়। বাউল গানের বাইরে নানা ধরনের মেয়েলি গীত, বারোমাসি, জারিগান, ধামাইল গান, ভাটিয়ালি, কীর্তন ও বিচ্ছেদ গান সুনামগঞ্জের লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

১. বাউল গান

বাংলা লোকসংগীতের প্রধান ধারা হচ্ছে বাউল গান। সুনামগঞ্জে এ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ইতিমধ্যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বাউলেরা দেশের অপরাপর অঞ্চল যেমন–কুষ্টিয়া, রাজশাহী, মেহেরপুর এসব জেলার বাউল ঘরনার সাধকদের সঙ্গে ব্যাপক বৈশাদৃশ্যতা রয়েছে। তবে সুনামগঞ্জের পার্শ্ববর্তী সিলেট, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গে এ জেলার বাউলদের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বাউলেরা কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলদের মতো ভেক/খিলাফত নেন না। এঁরা সংসারে থেকেও সংসারবিবাগী মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সুনামগঞ্জের বাউলধারার সাধকেরা মুর্শিদ ধরে বাউলসাধনায় প্রবেশ করেন। যদিও কুষ্টিয়া অঞ্চলের লালনপন্থী সাধকদের মতোই এ অঞ্চলেও মানুষ ভজনার দর্শনেই বাউলেরা বিশ্বাস করেন। কেবল আচারণিক কিছু ভিন্নতা ছাড়া মূল দর্শনের কোনো ফারাক এঁদের মধ্যে নেই। কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক সাধকের লেখা গানের সন্ধান পাওয়া গেলেও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বাউলদের গান লেখার প্রবণতা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। এখানকার অধিকাংশ বাউলেরা দেহতত্ত্ব, মুর্শিদ ভজনা, গুরু বন্দনা, আত্মতত্ত্ব, কামতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্বসহ নানা ধরনের বাউল গান রচনা করেছেন। এসব গানে এ অঞ্চলের বাউলদের দর্শন ও চিন্তাচেতনা পরিস্ফুট হয়েছে।

হাসন রাজার গান

১

আইস হাসন রাজা এই তোর ঘরবাড়ি রে।
হাসন জানে ডাকতে আছে, তাড়াতাড়ি রে ॥
তোমার ঘর তোমার বাড়ি, তোমার বাগিচা।
যে দেখিল সত্য দেখছে যে না দেখছে মিছা ॥
বাগিচায় বানাইছ, ফুল টঙ্গি ঘর।
সে ঘরে বসিয়া আমি ডাকি নিরন্তর ॥
খিড়কি দিয়া দেখি আমি বাগিচার মাঝে।
দেখিয়া রঙের ঝলক, মন মোর মজে ॥
হাসন জানে বলে দেখিয়া, রূপের ছটক।
চিরকালের জন্যে মন মোর, হইল আটক ॥

২

আঁখি মুঞ্জিয়া দেখো রূপ রে, আঁখি মুঞ্জিয়া দেখো স্বরূপ রে।
আরে দিলের চক্ষে চাহিয়া দেখো বন্ধুয়ার রূপ রে ॥
কাজলকোঠা ঘরের মাঝে, বসিয়াছে কালিয়া।
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া ॥
কিবা শোভা ধরে ওরে রূপে দেখতে চমৎকার।
আরে বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের বাহার ॥
ঝলমল ঝলমল করে ওর রূপে বিজলীর আকার।
মনুষ্যের কি শক্তি আছে, চক্ষু ধরিবার ॥

www.pathagar.com

হাসন রাজার রূপ দেখিলা, হইয়া ফানাফিল্লা।
হু হু হু হু ইয়াহু, ইয়াহু, বলো আল্লা আল্লা ॥

৩
আপন সাধন আমার হইল না।
আমার পাগলা মনে কি বুঝিল, আপন সাধন কইল না ॥
আমার মাঝে কোন জন, তাঁরে খুঁজল না।
ঠাকুরচাঁন্দ যে ঘরের মাঝে তাঁরে চেয়ে দেখল না ॥
ঘরে থাকতে ধরো তাঁরে, গেলে পাবে না।
গেলে পরে সে যে আর, ফিরিয়া আসবে না ॥
কি বুঝিয়া বসিয়া রইলে, কেন ধরো না।
ঘর থাকিয়া বাহির হইলে খুঁজিয়া পাবে না ॥
বুড়া হইলায় হাসন রাজা, তেও কি বুঝ না।
ঘরে থাকতে ঠাকুর ধরো ছাড়িয়া দিও না ॥

৪
আমি আমার পরিচয় করিয়েছি।
সবই তুই; আমিত্ব ছাড়িয়ে দিয়েছি ॥
আমি তো কিছুই নই, কিছু নহে তুই বই।
তুমি বিনে কিছু নহে আমি বুঝিয়েছি ॥
আমি আমি একটি নাম দিয়া, খেলা খেল ভবে আসিয়া।
কত রঙ্গ ঢঙ্গ করো, দেখি তোমার নাচানাচি ॥
তুমি ঘরে, তুমি বাইরে, তুমিই সবার অন্তরে।
কে বুঝিতে পারে প্রভু, তোমারও যে পেছাপেছি ॥
হাসন রাজার এই উক্তি, সকলই তুই মা শক্তি।
তুমি আমি ভিন্ন নহি, একই হইয়াছি ॥

৫
আমিই মূল নাগর রে,
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে, ভবসাগরে রে ॥
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিবশঙ্করী।
অধরচাঁদ হই আমি, আমি গৌরহরি ॥
খেলা খেলিবারে আইলাম এ ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে ॥
আমিই মূল, আমিই কোল, আমি সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই ॥
নাচো নাচো হাসন রাজা, কারে করো ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া, যাতে হইছ লয় ॥

www.pathagar.com

শাহ্ আবদুল করিমের গান

১

আমি আছি আমার মাঝে
আমি করি আমার খবর
আমি থাকলে সোনার সংসার
আমি গেলে শূন্য বাসর ॥
এ জগতে আমি মূল
এছাড়া মিটে না গোল
আমি বৃক্ষ আমি ফুল
আমি মধু আমি ভ্রমর ॥
আমি আঁধার আমি আলোক
আমি আশেক আমি মাশুক
যে বোঝে না সে বুঝুক
কেবা আপন কেবা রে পর ॥
আমি আছি আমার বেশে
বসত করি মাটির দেশে
আমি আমায় ভালোবেসে
বাতাসে বাঁধিয়াছি ঘর ॥
বসে আছি আপন ঘরে
খুঁজতে যাই না অন্য কারে
করিম বলে মরা মরে
আমি নিত্য আমি অমর ॥

২

ভবের জনম বিফল গেল
মিটল না প্রেমপিপাসা
ভালো-মন্দের ধার ধারি না
লোকে বলে কুলনাশা ॥
মন চলে না ধর্মপথে
পারলাম না স্বভাব নিতে
কাম ক্রোধ লোভ হিংসাতে
মন হয়েছে বেদিশা ॥
মুর্শিদ চান্দের প্রেমবাজারে
যে জনে মাল খরিদ করে
থাকে না সে অন্ধকারে
পূর্ণ হয় মনের আশা ॥
সমাপ্ত হলে জীবনের
উপায় নাই শেষের দিনের

www.pathagar.com

দীনহীন আবদুল করিমের
দয়াল নামটি ভরসা ॥

৩
আগের বাহাদুরি এখন গেল কই
চলিতে চরণ চলে না, দিনে দিনে অবশ হই ॥
মাথায় চুল পাকিতেছে মুখে দাঁত নড়ে গেছে
চোখের জ্যোতি কমেছে, মনে ভাবি চশমা লই।
মন চলে না রঙ-তামাশায় আলস্য এসেছে দেহায়
কথা বলতে ভুল পড়ে যায়, মধ্যে মধ্যে আটক হই ॥
কমিতেছি তিলে তিলে—ছেলেরা মুরব্বি বলে
ভবের জনম গেল বিফলে, এখন সেই ভাবনায় রই।
আগের মতো খাওয়া যায় না বেশি খাইলে হজম হয় না
আগের মতো কথা কয় না, নাচে না রঙের বাড়ই ॥
ছেলেবেলা ভালো ছিলাম বড় হয়ে দায় ঠেকিলাম
সময়ের মূল্য না দিলাম তাই তো জবাবদিহি হই।
যা হবার তা হয়ে গেছে আবদুল করিম ভাবিতেছে
এমন এক দিন সামনে আছে, একেবারে করবে সই ॥

৪
সাধন করো রে অভ্যাসে
সময়ে কর্ম না করিলে হয় না কর্ম বেলাশেষে ॥
এই যে তোমার দেহভাণ্ড বন্ধ করো সকল রন্ধ্র
অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র দেখবে হৃদাকাশে
অনাহত দ্বাদশ দলে নয়ন যদি মেশে
করিবে স্বদেশের চিন্তা রবে না আর এ বিদেশে ॥
মূলাধার হয় গুহ্যমূলে করো জাগ্রত উর্ধ্বকলে
উঠবে ঝঙ্কার দলে দলে নয়ন রেখো হুঁশে
গভীর ধ্যানে বসিলে যে-রূপ চোখে ভাসে
হতে পারে প্রেমালিঙ্গন সূক্ষ্ম জীবের ভাগ্যবশে ॥
কুণ্ডলিনী যদি জাগে দ্বিদলে যাও অনুরাগে
সহস্রার অধোভাগে যাবে রে স্বদেশে
ষড়রিপু বশ হইবে ভক্তি-প্রেম-বিশ্বাসে
ষটচক্র অতীত হয়ে ভাসবে রে চৈতন্যরসে ॥
তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে উপাসনায় রও মজিয়ে
ভবসিন্ধু পাড়ি দিয়ে যাবে অনায়াসে
আসল তত্ত্ব না জানিলে কাজ দেবে কি বেশে
উপাসনা নিস্ফল হবে অল্প একটু অবিশ্বাসে ॥

www.pathagar.com

প্রাণায়াম অভ্যাস করো এ জীবনের আশা ছাড়ো
মুক্ত জীব হইতে পারো গুরুর চরণ পরশে
যে হবে তার প্রেমের প্রেমিক ধরা দেব খোশে
ঠেকল পাগল আবদুল করিম দোষী হয়ে স্বভাবদোষে ॥

৫
আমি তোমার কলের গাড়ি তুমি হও ড্রাইভার
তোমার ইচ্ছায় চলে গাড়ি দোষ কেন পড়ে আমার ॥
চলে গাড়ি হাওয়া ভরে আজব কল গাড়ির ভিতরে
নিচ দিকেতে চাকা ঘোরে সামনে বাতি জ্বলে তার ॥
রত্নমানিক বোঝাই করা প্রহরী সব দেয় পাহারা
বাদি ছয়জন আছে তারা সুযোগে করে সংহার ॥
কলের গাড়ি কুদরতে চলে, চলে না পেট্রোল ফুরাইলে
বাউল আবদুল করিম বলে কুদরতের শান বোঝা ভার ॥

দুর্বিন শাহের গান

১
আগে জানো আহাদের খবর
আলিফ লাম মীম আহাদ নুরী
করছে খেলা তিন অক্ষর ॥
আলিফেতে লাম মিশাইয়া
মীমেতে মায়া লাগাইয়া রে
আহাদে ইছিম হইয়া খেলাইতেছে করে মক্কর ॥
প্রথমে আহাদ ছিল
ইছিমে মিশিয়া গেল রে
ছয় অক্ষরে যোগ ধরিল জানতায় নিরন্তর ॥
আলিফেতে আল্লা ছিলা
'হা' শব্দের নুর সৃজন করলা রে
দালেতে দুনিয়া হলো করিয়া দিল পসর ॥
ইয়াতে ইয়াদ করিয়া
ছিনেতে দিলেন ছাকিয়া রে
মীমেতে মায়া লাগাইয়া সৃজিয়াছেন আদম শহর ॥
আলিফেতে খেলা খেলিয়া
লামেতে গেলা মিশিয়া রে
তার ভিতরে মায়া হলো দুর্বিন শাহ কয় মীম অক্ষর ॥

২
এই যে সংসারে, প্রভু কও তারে
অতি কৌশল করে গড়েছেন মানুষ ॥

www.pathagar.com

মানুষ আছে ব্যাপিয়া, দুনিয়া জুড়িয়া
দেখে তাল্লাশিয়া কার আছে রে হুঁশ
মানুষ চিনো নয়নে ধরো যাইয়া চরণে
না চিনে মরিও না কেউ হইয়া বেহুঁশ ॥
আগে চিনো আপনারে, সুহৃদয় অন্তরে
পাবে সে নিরাকারে মনে হবে হুঁশ
গুরুর পদে ধরো যদি পাবে সে ভেদবিধি
দেহাতে নিরবধি ছুটিবে কার্তুশ ॥
আত্মস্বরূপেতে দেখিবে নিরালাতে
সর্বদায় মনেতে হইবে আক্রোশ
ব্রহ্মজ্ঞানের ধারায় যাইয়া প্রেমতলায়
আনন্দমনে হও সিদ্ধপুরুষ ॥
ফুটিবে প্রেমফুল মনপ্রাণ হইবে আকুল
ভ্রমরা দেখে যদি হইবে বেহুঁশ
দুর্বিন শাহ কয় চিনো তারে সাকারে কি নিরাকারে
না চিনিয়া আগে কেউরে দিও না রে দোষ ॥

৩
প্রেমের প্রতিমা, অপার যার সীমা
কে পারে মহিমা বুঝিবারে ॥
গীতা-বেদ-বাইবেল কি কোরান
দিতেছে প্রমাণ নানা প্রকারে
কেহ বলে সাকার কেহ বলে নিরাকার
কেহ কয় আছে সবার অন্তরে ॥
কেহ বলে আছে প্রভু, কেহ বলে নাই
কেউ বলে সঙ্গে থাকে সর্বদাই পাই
রয়েছে ব্যাপিয়া পাই না খুঁজিয়া
মসজিদ গির্জা কি মন্দিরে ॥
এশিয়া আফ্রিকায়, আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায়
কেহ বলে আছে চীন শহরে
মক্কা বানারশী গয়া গঙ্গা কাশী
হইয়া জঙ্গলবাসী পাই না তারে ॥
হাটে কি মাঠে, ঘটে কি ঘাটে
গ্রামে শ্মশানে কিংবা কবরে
কণ্ঠক ও জঙ্গলে, পত্র-পল্লব-ফুলে
মলয় হিল্লোলে খেলা করে ॥
সাগর সুনীলে ভূধর অনিলে
আলো কি আঁধার অন্ধকারে

www.pathagar.com

ক্ষিতি-অপ-তেজ, মরুতব্যোম মাঝে
দিতেছে ঝংকার নিরাকারে ॥
চন্দ্র সূর্য তারা, গ্রহ সিতারা
রেখেছে গেমন শূন্য ভরে
বৃক্ষলতা আদি পশু পাখি ব্যাধি
সে নামে সদায় নৃত্য করে ॥
ঢাক ডংকায় ঢোলে, বেহালা করতালে
গায়ক গায়িকা গায় কত সুরে
বলে দুর্বিন শাহ খেয়ে প্রেমনেশা
হয়েছি বেদিশা ভবঘুরে ॥

৪
মুর্শিদ ছুরতে খোদা বর্তমান
খোদে খোদা, আদম জাদা, পয়দা ছুরতে ইনসান ॥
মন রে, মুর্শিদকে খোদা জানিলে, শরিয়তে কাফের বলে
খোদা হতে জুদা জানলে হবে মকরুমের সমান
দুই রাস্তার মধ্যের রাস্তা, চিনিয়া করো ব্যবস্থা
তা না হলে দিবে খাস্তা, পাবে না তার সন্ধান ॥
মন রে, লক্ষ কোটি ছুরত লইয়া, কুল্লে সাইন মোহিত হইয়া
ভুলের জালে ঘেরাও দিয়া, রহিয়াছে অন্তর্ধ্যান
মুর্শিদের উছিল্লা করি, করিতেছে লুকোচুরি
ইলাহিল ওয়াছি আল্লা কোরানে আছে প্রমাণ ॥
মন রে, গেলে হাসরের বিচারে, দেখা দিবেন পরোয়ারে
কোন ছুরতে চিনবে তারে, কে তোরে দিবে নিশান
তাই বলি মন কথা ধরো বরজকে নিশানা করো
তাত মাইন্না ক্বলব পড়ো সাক্ষ্য দিতেছে কোরান ॥
মন রে, ভবে থাকতে লও চিনিয়া, নইলে তুই হাশরে গিয়া
যাবে তারে খোদা কইয়া মিছে হবে পেরেশান
যে জনে মুর্শিদ ধরে না, খোদায় কয় আমায় পাবে না
দুর্বিন শাহ কয় তার কাণ্ডারি সর্বদা রবে শয়তান ॥

৫
ভাঙা তরি, নাই কাণ্ডারি রে, কান্দি ঘাটে বইয়া
উজান হাওয়া কেমনে যাব বাইয়া রে ॥
দক্ষিণা বাতাসে নদীর উঠিছে লহর
নিয়াশে পড়িল মারা কত সওদাগর রে ॥
কূল নাই, কিনারা নাই, নাই রে নদীর তলা
সঙ্গী নাই মোর নদীর পাড়ে, কান্দি সন্ধ্যাবেলা রে ॥

www.pathagar.com

সঙ্গী ছয়জন বড়ো কুজন আমায় গেল ছাড়ি
ধন-রত্ন সব লুটে নিল, মদনা চোরায় পাইয়া রে ॥
আকাশে মেঘেরই সাঁঝ, প্রাণ কান্দে ডরে
মাঝ রাইতে ডাকাইতের ভয়, ধরে কালো কুম্ভীরে ॥
দুর্বিন শার নাই ভরসা, দয়াল মুর্শিদ বিনে রে
বিপদে বাঁচাইতে পারে তারো নিজ গুণে রে ॥

২. মেয়েলি গীত

বাংলা লোকসংগীতের চিরায়ত ঐতিহ্যটুকু ব্যাপকভাবে ধারণ করে রয়েছে মেয়েলি গীত। হাওরাঞ্চলের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ধারা সম্ভবত এটিই। রাতের পর রাত নানা উৎসব-পার্বণকে উপলক্ষ করে নারীরা মেয়েলি গীত পরিবেশন করে আচ্ছন্ন করে রাখেন সবাইকে। এখানে পুরুষদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। বিয়ে, ব্রতসহ নানা সামাজিক রীতিনীতি, আচার-উৎসব নিয়ে অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর উপস্থাপনা এই মেয়েলি গীতের উপজীব্য। অনেকে এসব গানকে বৈঠকি গানও বলে থাকেন। গবেষকদের ধারণা, বৈঠকের আবহে এসব গান গীত হয়ে থাকেই বলে 'বৈঠকী গান' নামকরণ করা হয়েছে। মুসলিম ধর্মালম্বীরা যখন মেয়েলি গীত পরিবেশন করেন, তখন কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তবে হিন্দু ধর্মালম্বীরা মেয়েলি গীত পরিবেশনের সময় ঢোল, করতালসহ বিভিন্ন দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। তবে কোনো কোনো গীতের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মালম্বীরাও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন না। মুসলিম সমাজে মেয়েলি গীতের মধ্যে বিয়ের গানই সবচেয়ে বেশি পরিবেশিত হয়। হলদি তোলা, বাটা, বরকনে সাজানো, বর বরণ, বর-কন্যা বিদায়, পাশা খেলা, বাসি গোসল, পানচিনি, মেহেদি তোলা, পান খিলি, পানিভরা, বরণ ডালা, কনে সিংরান, শা-নজরসহ বিয়ের বিভিন্ন পর্বে গীত পরিবেশিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মালম্বী সম্প্রদায়ের নারীদের পরিবেশিত এ ধরনের কিছু মেয়েলি গীত নিম্নরূপ :

১
আরি পরি নগরবাসী দেখো গো আসিয়া
নয়া দামান আইছইন দেখো পালকি চড়িয়া ॥
কন্যারে গোসল করাও হলুদ সাবান দিয়া
মেন্দি হাতে সুরমা চোখে সাজাও শাড়ি দিয়া ॥
জারি আর মাখাইন গায়ে হাতে তালি দিয়া
ঝারবাতি জ্বালাইন কত লাগছে রসের বিয়া ॥
দামান কন্যা বিদায় হইলা সুয়ারী পালকি চড়িয়া
চিকন গলায় কান্দইন কন্যায় মাইজি মাইজি কইয়া ॥

২
ভাইসাব আইছইন বিয়া করি, ভাবিরে আনছইন সাজাইয়া
দেখো গো আসিয়া, কৈন্যা তোমরা তুল জলদি করিয়া ॥
পায়ে নেপুর হাতে ঘড়ি গলায় মতিমালা
খুঞ্জন পাড়া দিয়া হাঁটইন ঝুনুর ঝুনুর বাজাইয়া ॥

বাজারে গেছইন ভাইসাব কন্যার ভাইরে লইয়া
মাছ মিষ্টি দিছেন আর ভাবীর হাতে তুলিয়া ॥
রাঙা ভাবী মাছ কাটইন লজ্জা সরম করিয়া
ভাবীর হাতের রান্ধা খাইতাম আনন্দিত হইয়া ॥

৩
একলা একলা মন মন মিটাই কিলা গো ভাবী খাইলিলে
আইজ কুন্তা খাইতাম নায় আমি খাইমুনে কাইল আইলে ॥
আমার ভাইরে বাজারে দিয়া তুইনগো ভাবী কিতা আনাইলে
শিখাইয়া বুঝাইয়া ভাবী রদির মাঝে পাঠাইলে ॥
ভাবী এত খাওরী মন মিলে না দিলে
সিদা পাইয়া আমার ভাইরে তর ছাল্লায়নু পালাইলে ॥
আল্লায় দিলে কুনোদিন আমরাও, ইলা অইমুনে
দিতাম নায়, দেখাইয়া খাইমু, উগি বাগি বাইবায়নে ॥

৪
দামান্দের ভাগ্য ভালা দেখো গো আসিয়া
বিদ্যান কন্যা আনছইন ঘরে বিয়া করিয়া ॥
কন্যায় করইন বিদ্যাঅর্জন সকলে বুঝাইয়া
লেখাপড়া শিখাইন কন্যা কলম ধরিয়া ॥
শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করইন মনযোগী হইয়া
জামাইর খেদমত করইন কন্যায় নীরবে বইয়া ॥
কন্যার তারিফ করৈন সবে গ্রাম জুড়িয়া
বাপের বাড়ি যাইন কন্যা জামাইরে সাথে নিয়া ॥

৫
সাজিয়া আইলা দামান খাওরে বাটার পান
আরিপরি দেখতা আইলা দামান রাজার মুখখান ॥
যেমন কন্যা তেমন দামান পর করছে আন্ধাইর ঘর
কন্যার দাদায় উইট্যা কইলা তিনদিন রাখমু নাতীন বর ॥
শালাশালী আইলা ঠেলাঠেলি করলা
হাতে ধরি দামান রাজা আন্দর ঘরে নিলা ॥
কন্যার নানী আইয়া নাতীন দিলা সমজাইয়া
চান্দ মুখখান দেখিয়া হাতে দিলা ধরাইয়া ॥

৬
সুনামগঞ্জে কন্যার বাড়ি দামান সিলোটিয়া
বৈরাতীগণ সঙ্গে আইছইন আনন্দ করিয়া ॥
জলদি করি সাজাও কন্যা সাত ভাবি মিলিয়া

www.pathagar.com

ছাতকের নানী আইছইন হুকুম দিছেন কইয়া ॥
শেরওয়ানী বদল করইন নতুন পোশাক পাইয়া
শ্বশুর বাড়ি ছাড়িয়া দামান কন্যারে যাইন লইয়া ॥
আস্তে কন্যার মুখফুটে সকলে দিলা চিনাইয়া
লাল ভাইসাব কালা ভাইসাব ডাকইন আল্লাদ করিয়া ॥
টুকেরবাজার গোবিন্দগঞ্জ জাউয়া পাগলা হইয়া
ওয়ালিমার দাওয়াত দিও সকলে বুঝাইয়া ॥

৭
কন্যার লাগি আনছইন দামান রঙিলা শাড়ি
কানের আনছইন কান পাশা হাতের লাগি চুড়ি ॥
নাকের নোলক গলার হার আনছইন আঙ্গুরী
মনের মতো সাজাও কন্যা পরিস্থানের পরী ॥
কন্যার লাগি মাটির কলসি বসিবার আনছইন পিড়ি
বিরুইন ভাতর লাগি আনছইন ঘাইয়াড়ী ॥
কাঁথা বালিশ দিছইন আর নলের একখান চাটি
হাঁস মুরগি দিছইন আর বাড়াইবার লাগি ॥

৮
সাজাও গো সজনী, গিরিরাজ নন্দিনী
বান্ধ গো বিনোদ বেণী।
এগো সিঁথির উপরে, ঝলকে সিন্দুরে
কাজল পরাও গো ধ্বনি ॥
কর্ণের কুণ্ডলে, কি সুন্দর দোলে
গলায় মোহন মালা, হাতে স্বর্ণ চুড়ি, আহা মরি মরি
শঙ্খ পরাইয়া দিলা ॥
সেমিজ আনিয়া, যতনে পরাইয়া
তাহার উপরে শাড়ি আলতা চরণে, দিলা সখিগণে
মধু কয় কি শোভে হেরি ॥

৯
স্নানে বসিলা বাছা রে হরষিত হইয়া
আনিয়া কুরশী পিড়ি দিলা যে পাতিয়া ॥
তার উপর বসিলা রে পূর্বমুখী হইয়া
কুলবধূ আইলা, ধান্য দুর্বা লইয়া ॥
অর্ঘন করিলা সবেরে ভঙিমা করিয়া
ধান্য দুর্বা দিলা বাছার মস্তকে তুলিয়া ॥
হরিদ্রা বাটিয়া তাতে রে সুগন্ধি মিশায়
আলসে মার্জন করে সোনাধনের গায় ॥

www.pathagar.com

কারণ্য গঙ্গার জলরে তুলি লইলা হাতে
মধু বলে ঢালি দিলা সোনাধনের মাথে ॥

১০
আজি পাশা খেলে রাই শ্যাম সনে
চারিদিকে ঘুরিয়াছে সব সখিগণে ॥
পাতিয়া রঙিন পাটী, নানা ফুলে পরিপাটি
রঙের পাশা খেলে আজি হরিষিত মনে ॥
রাই বলে বংশীধারী পাশা খেলাইতে পারি
হারিলে কি ধন দিবায় বলো আমার স্থানে ॥
শ্যাম বলে রাইকিশোরী, যদি পাশায় আমি হারি
দিব আমার মোহন বাঁশি বলি তোমার স্থানে ॥
জয় জয় রব করি, পাশা ঢালে রাই
কিশোরীর খেলাতে হারিলা হরি হাসে সখিগণে ॥

১১
বড়ো ভাবি কই গো মেজ ভাবি আনো গো।
ছোটো ভাবিএ পিষইন মেন্দি মিহিন করিয়া গো ॥
মাস্টার ভাবি কই গো বাহির হইয়া আসো গো।
দাদা দাদিরে সালাম আগে তোমরা করাও গো ॥
মা আর বাবারে গো সালাম করাইও গো।
মেন্দি হাতে দিও তোমরা আল্লার নামটি লইয়া গো ॥
আরি আর পরিরে গো আনিয়া বসাইও গো।
সকলে মিলিয়া তোরা বিয়ার গান গাইও গো ॥

১২
হাতে মেন্দি সাজাই চলগো সখি সকলে মিলিয়া।
কাইল দুফুরে দিমু আমরা কন্যারে তুলিয়া ॥
ভিডিও করিবে কন্যা গায়ে হলুদ দিয়া।
চলো সবাই জলদি করি সাজিয়া গুজিয়া ॥
হাতে মেন্দি সাজাই চলগো সখি সকলে মিলিয়া।
কাইল দুফুরে দিমু আমরা কন্যারে তুলিয়া ॥
সাজাও কন্যা সন্দুর করি ঝিলমিল ছিটাইয়া।
দামান মিয়া দেখে যেন পাগল যায় হইয়া ॥
সুখে থেকে ওগো সখি শ্বশুর বাড়ি গিয়া
দামান পাইয়া আমরার কথা না যাইয়ো ভুলিয়া ॥

১৩
ইশান কুনাবায় মেঘে করে কালুটি।

www.pathagar.com

অগ্নি কোনাবায় সাজে অবুঝ নউশা ॥
কাইল যেন গেছলায়
বালির লাগি রইছলায় ॥
বাবাজিরে বন্দি করিয়া
মাথার টিকলি লইছলায় ॥
মাথার টিকলি পুরানা।
বালির মনে শোভে না ॥
না নু কইছলায় পিনতায় না
কালা জামাই গছতায় না ॥
সাব্বাশ আইগনা কইন্যা
নতুন বয়সর তরুনা ॥

১৪
কুসুম ফুলের বালিশ সখি
চিরলে তালিয়া।
কত নিদ্রায় যাও গো ভেলুয়া
দুই নয়ন ভরিয়া ॥
চেয়ার দিলাম টেবিল দিলাম
মেস্তইর দিলাম লাগাইয়া।
লও লও কাঙালের দুলাল
কাগইজে লেখিয়া ॥
পালং দিলাম দরাজ দিলাম
মেস্তইর দিলাম লাগাইয়া।
লও লও কাঙালের দুলাল
কাগইজ লেখিয়া ॥
মিসরিফ দিলাম আলনা দিলাম
বিবি দিলাম লাগাইয়া।
লও লও কাঙালের দুলাল
কাগইজ লেখিয়া ॥

১৫
আইছ মিয়াইন চান লাল, বইছ মিয়াইন চান চাল।
কোন কোন বিবি লাগি কোন কোন বেশর আইনছ না রে ॥
বড়ো বিবি লাগি জারমুনির বেশর
মাইজম বিবি লাগি রূপার বেশর
শুকুর বিবি লাগি সোনার বেশর আইনছই না রে ॥
পড়িয়া মরইন শুকুর বিবি সোনার বেশর দেখিয়া না রে
পড়িয়া মরইন সলুক বিবি শুকুর বিবির সোনর বেশর দেখিয়া না রে ॥

www.pathagar.com

আইছ মিয়াইন চান লাল, বইছ মিয়াইন চান লাল
কোন কোন বিবি লাগি কোন কোন শাড়ি আইনছ না রে ॥

১৬
মাইজিয়ে ফুল পাড়ইন কুছ ভরি
বইনে ফুল পাড়ইন মুইঠ ভরি
লীলাবালিয়ে ফুল পাড়ইন জরিরও রুমালে না রে ॥
মাইজিয়ে চিঠি লেখইন পন্‌রঅ দিনে
বইনে চিঠি লেখইন সাপ্তা দিনে
লীলাবালিয়ে চিঠি লেখইন মাসঅ পনরঅ দিনে ॥
মাইজিয়ে চিঠি পাইয়া টেখা পাঠাইলা
বইনের চিঠি পাইয়া শাড়ি পাঠাইলা
লীলাবালিয়ে চিঠি পাইয়া বাড়ি চলিলা ॥
মাইজি রইলা আদি লইয়া বইন রইলা পানি লইয়া।
লীলাবাড়ি রইলা আবের পাঙ্কি লইয়া ॥
মাইজি আদিত বইলে কী অনব।
ভনির আদিত বইলে কী অনব ॥
মাইজিয়ে ফুল পাড়ইন কুছ ভরি
বইনে ফুল পাড়ইন মুইঠ ভরি
লীলাবালিয়ে ফুল পাড়ইন জরিরও রুমালে না রে ॥

১৭
কইও কইও উকুল ভাই আমার সংবাদ বিয়াইন টাইন।
ঝিয়াই আমার ঘুমে কাতর মায়ের জিরাধন রে ॥
বিয়ান অইলে ঝিয়াই খাওয়ইছি, মাধান অইলে ঝিয়াই নাওয়াইছি।
সন্ধ্যা অইলে ঝিয়াই পালংয়ে ঢলাইছি, মায়ের জিরাধন রে ॥
মাইজির মনে অছিল কি বাড়ির কাছে বিয়া দিতাম ঝি।
রাইত পোয়াইলে দেখতাম ঝিয়াইর মুখ, মায়ের জিরাধন রে ॥

১৮
কোন পথেদি আইট্টা যাইন বেয়াই।
কোন পথেদি আইট্টা যাইন দামান্দের ভাই ॥
আইলে দিয়া আইট্টা যাইন বেয়াই।
রাস্তা দিয়া আইট্টা যাইন দামান্দের ভাই ॥
বাড়ি মুকা আইট্টা যাইন সোনার আউসের দুলাভাই।
কী দিয়া খাওয়াইমু বেয়াই
কী দিয়া খাওয়াইমু দামান্দের ভাই
কী দিয়া খাওয়াইমু সোনার আউসের দুলাভাই ॥
কুত্তা দিয়া খাওয়াইমু বেয়াই

www.pathagar.com

বিলাই দিয়া খাওয়াইমু দামান্দের ভাই
গরু দিয়া খাওয়াইমু সোনার আউসের দুলাভাই ॥
কী দিয়া বিদায় করমু বেয়াই
কী দিয়া বিদায় করমু দামান্দের ভাই
কী দিয়া বিদায় করমু সোনার আউসের দুলাভাই ॥
ডেগ দিয়া বিদায় করমু বেয়াই
ডেকসি দিয়া বিদায় করমু দামান্দের ভাই
আপা দিয়া বিদায় করমু সোনার আউসের দুলাভাই ॥

৩. বারোমাসি

হাওরাঞ্চলে প্রচলিত লোকগানের মধ্যে বারোমাসির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বছরের প্রতিটি মাসের নামোল্লেখপূর্বক ঋতু বৈচিত্র্যের মাহাত্মের সঙ্গে প্রিয়তমের গুণকীর্তন এবং বন্দনাসূচক গানগুলোই 'বারোমাসি' গান হিসেবে সুপরিচিত। তবে নারী হৃদয়ের আর্তিই এ গানের মূল বিষয়বস্তু। সেই মধ্যযুগে যেমনভাবে বারমাসী গানের প্রচলন ছিল, তেমনি বর্তমান সময়ে এসেও এ গানের জনপ্রিয়তা মোটেই হ্রাস পায়নি। লিখিত ও মৌখিক উভয় সাহিত্যেই বারোমাসী গান জনপ্রিয়। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার নোয়ারাই গ্রামের বাসিন্দা দুর্বিন শাহ ও শিবনগর গ্রামের বাসিন্দা গিয়াস উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০০৫) বারোমাসি গানের রচয়িতা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁদের লেখা কয়েকটি বারোমাসি গান নিম্নরূপ :

১

কুল গেল কলঙ্ক রইল ওলো সহচরী
যৌবন সময় প্রাণের বন্ধু হলো দেশান্তরী রে
কলঙ্কিনী যার লাগি ॥
যৌবন সময় প্রাণের বন্ধু যদি গেল ছাড়ি
আমারই যৌবন সাগরে কে দিবে আর পাড়ি
কালবৈশাখে ফুটল গাছে নানান জাতের ফুল
নতুন মাসে বন্ধুর আশে মন হইল আকুল ॥
আইল জ্যৈষ্ঠ কত কষ্ট বন্ধুহারা হইয়া
নতুন ফুলের টাটকা মধু কারে দেই সঁপিয়া
ভ্রমর হইয়া আসত যদি বন্ধু কালাচান
আদরে ফুলেরই মধু সদায় করত পান ॥
আষাঢ় মাসে নদী ভাসে নির্ঝরের জলে
কূল ভাসিয়া নদীর স্রোত অতি বেগে চলে
আমারই যৌবনের স্রোত চলছে অবিশ্রাম
কে আসি খেলিবে সাঁতার ঘরে নাই মোর শ্যাম ॥
আইল শ্রাবণ নতুন যৌবন বারিষা চঞ্চল
যৌবন নদী হলো বাদী করে টলমল

www.pathagar.com

আমারই যৌবনসাগরে দিল না কেউ পারি
বন্ধু বিনে কে হবে মোর যৌবনের বেপারি ॥
ভাদ্র মাসে ছড়া আসে বাড়ির গুয়া গাছে
স্বামী হারা হইয়া নারী আর কতদিন বাঁচে
পন্থপানে চাইয়া রইলাম নারী অভাগিনী
যাইতে নারী তার উদ্দেশ্যে বাদী ননদিনী ॥
ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল বারিষা হলো শেষ
আমি রইলাম আসার আশে শ্যাম রইল বিদেশ
যৌবন নিশি প্রভাত হইল বন্ধু না আসিল
অভাগিনীর মনের দুঃখ মনেতে রহিল ॥
আশ্বিন গেল কার্তিক আইল নদী গেল শুকাইয়া
আর কি শ্যাম আসিবে দেশে ভরা নদী বাইয়া
আমি অবলা নারীর আশায় পড়ল ছাই
এ নব যৌবন আমি আর কারে বিলাই ॥
অগ্রহায়ণ মাসে সবে হাসে মাঠে পাকে ধান
গৃহস্থ ভাই ধানের গুলা করতেছে নির্মাণ
আমি অবলা নারী রইলাম আসার আশে
কার জন্যে সাজাইলাম শয্যা বন্ধু নাই মোর দেশে ॥
পৌষ মাসে দারুণ উষে করল অন্ধকার
দুঃখেরই উপরে দুঃখ কত সইব আর
গাছেতে কমলা পাকে কত লোক খায়
আমারই যৌবন কমলা ডালেতে শুকায় ॥
পৌষ গেল মাঘ আসিল শীতের বড়ো ভয়
সহায় সম্বল তার পতি যার সদয়
আমি অবলা নারীর অসার জীবন
প্রাণবন্ধু পাইলে তারে করতাম আলিঙ্গন ॥
ফাল্গুন মাসে ডালে বসে কোকিল করে রাও
ডাকিও না রে প্রাণের কোকিল আমার মাথা খাও
যায় বসন্ত প্রাণকান্ত নাই রে আমার দেশে
দায় হইল মোর প্রাণী রাখা শীতল বাতাসে ॥
আইল চৈত্র কালবসন্ত যাবে রে ফুরাইয়া
যৌবন লীলা সাঙ্গ হলো বন্ধু রে না পাইয়া
কয় দুর্বিন শাহ কেন্দে কেন্দে গেল বারমাস
যাইতে হলো ছেড়ে দিয়া, দিয়া বিদেশের প্রবাস ॥

২

প্রাণ কান্দে মানো কান্দেরে, কান্দে আমার হিয়া
দেশের বন্ধু বিদেশ গেল, আমায় পাশরিয়ারে ॥

www.pathagar.com

প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
অভাগিনীর কপাল দোষে, আইল বৈশাখ মাস
অভাগিয়ার শাক-নালিতা, দিতাম কারো মুখেরে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আইল, গাছে পাকা আম
কারো মুখে রস লাগাইতাম, ঘরে নাই মোর শ্যামরে
প্রাণ কান্দে মন কান্দেরে ॥
জ্যৈষ্ঠ গেল আষাঢ় আইল, ভরা নদী নালা
যৌবন তরঙ্গ ভারী, সয় না প্রেম জ্বালারে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
আষাঢ় গেল শাওন আইল, না পুরিল আশা
না আসিল প্রাণবন্ধু গেল বারো মাসরে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
মইরা গেলে বন্ধু আইলে, কেন্দে কয় গিয়াস
তার চরণে রাইখা দিও, আমার মরা লাশরে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥

৩
এই বৈশাখে মনে পড়ে, সেই দিনেরই কথা
কেমনে পরাণ বাইন্দা রাখি, মনে লাগে ব্যথা ॥
গ্রীষ্মের গরমের দিনে, পাখার বাতাস পড়ে মনে
ভুলে যাব কোন পরাণে, নাই গো সে ক্ষমতা ॥
বর্ষায় নদীর ভরা জলে, লাই খেলিতাম হেসে খেলে
কত খুশি শরৎ এলে, কি স্নেহ মমতা ॥
হেমন্তে মুখ হাসিমাখা, শীতে এক সঙ্গে থাকা
বসন্তে কোকিলের ডাকা, আর পাবো গো কোথা ॥
ছেড়ে যাবে তুই পাষাণে, কখনো ছিল না মনে
ধারা গিয়াসের নয়নে, বসাইলে অযথা ॥

৪
বসন্ত আসিল, গাছে ফুল ফুটিল
পরাণের বন্ধু আমার আইল না ॥
বৈশাখের দুঃখের কথা, রাখিলাম শাক নালিতা
পরানের বন্ধু আইসা খাইল না
জ্যৈষ্ঠে পাকিল আম, না আসিল বন্ধু শ্যাম
অভাগীর মনের দুঃখ গেল না ॥
আষাঢ়ে গাঙে পানি, না আসিল গুণমণি
ভরা নদীতে নাও বাইল না

www.pathagar.com

শ্রাবণে রাখিলাম শশা, ভাদ্রমাসে তালের রসা
আশ্বিন মাসেও আশা পুরল না ॥
কার্তিকে জোয়ার ভাটা, আগনে ধান্য কাটা
বিরুনের চিরা খৈ এসে খাইল না
পৌষ ও মাঘের শীতে, ধরিল কলিজাতে
একেলা শুইলে নিদ্রা আসে না ॥
আসিল বসন্ত ফাল্গুন, ভ্রমরায় করে গুনগুন
বাগানে ফুটিল ফুল কি নমুনা
চৈত্রে বসন্তের শেষ, গিয়াসের বন্ধু বিদেশ
ঝরিয়া পড়িল ফুল, গাছে থাকল না ॥

৪. ধামাইল গান

ধামাইল গান হিন্দু ধর্মালম্বীদের বিয়ের অনুষ্ঠানের নানা পর্বে গীত হয়ে থাকে। 'ধামাইল' শব্দটির উৎস আজ পর্যন্ত কোনো গবেষক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারেননি। তবে অনেকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে 'ধামালি', 'ধামান', 'দামান', 'ধামালী', 'ধামন' শব্দ থেকে ধামাইল গানের উৎপত্তি হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিয়ের আগের রাতে অধিবাস চলাকালীন কিংবা বর-কনেকে স্নান করানোর সময় ধামাইল গান বেশি পরিমাণে গীত হয়। ধামাইল গানের মধ্যে আবার বিভিন্ন পর্ব রয়েছে। যেমন–বন্দনা, আসর, বাঁশি, জলভরা, গৌররূপ, শ্যামরূপ, বিচ্ছেদ, কোকিল সংবাদ, কুঞ্জ সাজানো, স্বপন, চন্দ্রার কুঞ্জ, মান ভাঙানো, মিলন, সাক্ষাৎ খেদ, বিদায়, আউট গান প্রভৃতি।

সংগৃহীত ধামাইল গান

১
বন্দি যশোদা নন্দন
গোলক হতে গোলকের নাথ ধরায় আগমন
ও বন্দি গিরিধারী রামবিহারী
তুমি ভক্তের প্রাণধন ॥
হায় কেহ বলে নন্দের ছেলে
হায় গো যোগী চোরা কেহ গো বলে
ও সে ভক্তের বন্ধু কৃপাসিন্ধু
সে তো সত্য নারায়ণ ॥
হায় শান্ত ভাবে যত গোপিগণ
বাঁধল শ্যামের গোপাল গুণমণি
ও হায়গো সাক্ষ্য ভাবে বাউল তারে
ব্রজের যত রাখালগণ ॥
শান্তভাবে যত গোপিচান
বাঁধল শ্যামের রাঙা চরণ

www.pathagar.com

এগো দস্যু ভেবে
বাঁধল তারে বীর হনুমান ॥
হায় মধুরভাবে বাঁধল শ্রীরাধা
যার প্রেমেতে আছে বাঁধা গো
ও দীন সুনীল বলে অন্তিমকালে দিও যুগল চরণ
গোলক হতে গোলকের নাথ ধরায় আগমন ॥

২
বন্দি গুরু পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণের চরণ
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদে লইনু শরণ ॥
বন্দি গুরু পিতামাতা জন্মদাতা মূলদেবতা
ও তার ধার শোধিতে নাই ক্ষমতা থাকিতে জীবন ॥
বন্দি গুরু নিত্যানন্দ গদাধর আর রামানন্দ
শ্রীনিবাস অদ্বৈতচন্দ্র রূপ সনাতন ॥
বন্দি গুরু কাত্যায়নী, গনেশ, সূর্য, শূলপাণি
এগো গীত সুধা নারায়ণী করো বরিষণ ॥
দীন শরতের এই মিনতি, দয়া করো দাসের প্রতি
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাধন ॥

৩
গৌররূপ হেরিলাম গো ও যেমন স্বর্ণমণি
কুক্ষণে গো গিয়াছিলাম জলে সুরধ্বনি ॥
স্বর্ণ কি কাঞ্চনও দিয়া গো, ও গড়িয়াছে কি না জানি
কি দিব রূপের তুলনা, যেমন উদয় দিনমণি ॥
স্বর্ণবর্ণ রূপ হেরিলাম গো, হইলাম পাগলিনী
জগন্নাথ কয় দেহ থইয়া, লইয়া যায় পরানী গো ॥

৪
ক্ষণিক সময় দাঁড়াও তুমি দেখি রে বন্ধু
ও বন্ধু তোমার মুখের হাসি দেখতে
অভিলাষী রূপ দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখিরে বন্ধু ॥
সিন্দুরে কাজলে শাড়ির আঁচলে শ্যামরূপ আঁখিয়া রাখি
তরুণ দেখিব নিরালায় যখন আমার মনে চায়
তুমি আমার হৃদয় রাজার পাখি রে বন্ধু ॥
রূপ কি জ্যোতির্ময়, অন্ধকার আলো হয় আঁধারের জলন্ত জোনাকী
ও এগো প্রতাপে কয় রূপ ছায়ার দেখিলে নয়ন জুড়ায় মন জুড়ায়
তার মন হরা রূপ দেখি রে বন্ধু ॥

৫
আমায় পাগল করলো গো শ্যামকালিয়া

www.pathagar.com

রূপে আমায় পাগল করলো গো ॥
কুক্ষণে জল ভরতে গো গেলাম
বিজলি চটকে সেই রূপ নয়নে হেরলাম গো ॥
ও এগো বিধি যদি দিত গো পাখা
উইড়া গিয়া সদায় সেইরূপ করতাম দেখা গো ॥
ও এগো পাখা দিতে দারুণ বিধি
ও বিধি বাদি হইল গো ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
এগো অঙ্গুলি হেলাইয়া শ্যামে, ও শ্যামের রূপ হেরিলাম গো ॥

৬
আমায় কলংকিনী কইয়ে সাধ পুরলেরে শ্যামের বাঁশি
ও যেমন তুষের অনল জ্বালাই দিলে জ্বলছে ঘষি ঘষি রে ॥
হায় রে তোর সনে যে সাধ ছিল সেই সাধ কি আর পূরণ হইল গো
এগো মান কুলমান হইরা নিয়া করলে দোষের দোষী রে ॥
হায় রে ভাবিয়া কয় প্রতাপরঞ্জন বাঁধছো এখন কিসের জনারে
ওরে বাজাইয়া বাঁশের বাঁশি নন্দের কালো শশী রে ॥

৭
তরুমূলে বাঁশি কে বাজায় গো সখি জাইনে আয়
বাঁশির রব শুনিয়া গৃহে থাকা দায় ॥
তুমি বৃক্ষ আমি লতা, বাঁশি এখন কেন কও না কথা
বাঁশির ধ্বনি শুইনে প্রাণটি রাখা দায় ॥
বাঁশি হইল বিরজার রাধার গুণ গায়
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যামে বাঁশি বাজায় কদমতলায়
বাইশে কূলবধূর কূল মজাইতে চায় ॥

৮
আমি কৃষ্ণ কোথায় পাই গো বল
সখি কোন দেশেতে যাই
ও আমি প্রেমের কাঙালিনী
ও আমি নগরে বেড়াই ॥
বিচিত্র পালঙ্কের মাঝে শুয়ে নিদ্রা যাই
এগো শুইলে স্বপনে দেখি
আমি শ্যাম লইয়া বেড়াই গো
আপন জেনে প্রাণবন্ধুরে হৃদয়ে দিলাম ঠাঁই ॥
ও আমার ছিল আশা দিল দাগা
আমার প্রেমের কাজ নাই গো
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো ধনি রাই
ও আমি পাইলে শ্যামকে ধরতাম গলে ছাড়াছাড়ি নাই ॥

www.pathagar.com

৯
যত দুঃখ তোমার লাগিয়ারে শ্যামকালিয়া
তুমি আসবে আসবে বলে সদায় থাকি পথ চাইয়া ॥
তোমার কথা মনে হলে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
আমিতো নিশি পোহাই কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
ভেবে এবার দেখে মনে কি বলছিলায় কানে কানে
তুমি এখন কেন যাও ছাড়িয়া বুকে ছুরি দিয়া ॥
ভাবিয়া যতিনে বলে কেন রাই অধৈর্য হলে
তোমার প্রেমে বান্ধা কানাই জনমের লাগিয়া ॥

১০
বিদায় দিলায় রে রসময় চান যাও না কেনে
কি ভাব ছিল তোমার মনে রে ॥
রজনী প্রভাতকালে উদয় হইল ভানু
রাধিকার হস্তে ধরি বিদায় মাগো ভানু রে ॥
মন্দির বাহিরিয়া কৃষ্ণ বাঁশি দিল টান
ব্রজের যত গোপিগণে ঝইরাছে পরান রে ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে শোনো গো সকলে
এ মন বুঝি রাখা দায় বন্ধুয়ায় গো ছাড়িয়া রে ॥

১১
স্বপনে দেখিলামরে পথিক, পথিক ঘুমেতে হয় মিলন।
তোমায় আমি কথা দিলাম, জানিয়া আপনরে পথিক ॥
মায়াতে পড়িল মন, করিব যতন।
নিশিযোগের ভালোবাসা, হইল গোপনরে পথিক ॥
হাতের উপর হাত রাখিয়া, নয়নে নয়ন।
বুকে বুক মিশাইয়া, করিলাম শয়নরে পথিক ॥
হাসিতে খুশিতে আমার, স্বপনের জীবন।
আবদুস সাত্তার ঘুম ভাঙিয়া, করিতে ক্রন্দনরে পথিক ॥

১২
শয়নে স্বপনরে বন্ধু, বন্ধু আমার হইবে বিয়া।
দরজার সামনে খাড়া, পালকী রয় সাজাইয়ারে বন্ধু ॥
গোসল করাইবে বলে, বরই পাতা দিয়া।
সাদা কাপড় সেলাই করে, গায়ে দিবে পরাইয়ারে বন্ধু ॥
গায়ে লাগাইবে ভেষণ-ভূষণ, আদরে রাখিয়া।
আতর গোলাব ছিটাইবে, সারা গা জুড়িয়ারে বন্ধু ॥
জিজ্ঞাসা করিবে বলে, বাসর ঘরে নিয়া।
আবদুস সাত্তার স্বপন হইতে, উঠিল জাগিয়ারে বন্ধু ॥

www.pathagar.com

১৩
শ্যামরূপ হেরিলাম সজনী গো
অয়গো যেন স্বর্ণমণি।
আমি কুক্ষণে গো গিয়াছিলাম
জলে সুরধ্বনি গো ॥
স্বর্ণ কি কাঞ্চন দিয়া গো
গড়িয়াছে না জানি
কি দিব রূপের তুলনা
উদয় দিনমণি গো ॥
স্বর্ণ বর্ণ রূপ হেরিয়ে গো
হইলাম পাগলিনী
জগন্নাথ কয় দেহ থইয়া
লই গেল পরাণি ॥

১৪
হেইরে আইলাম গো
সুরধ্বনির ঘাটে আজ গৌরা রায়।
আমি কুক্ষণে গো গিয়াছিলাম
সুরধ্বনির জলের দায় ॥
নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা
কপালে তিলক রেখা গো
তারে দেখছি অনে
লাগছে মনে
গৃহে থাকা হইল দায় ॥
মন বিলাসে কয় কৈলাসে
মন গিয়াছে চরণ পাশে গো
গোসাই রাস বেহারী না আসিলে
সাধের জনম বৃথায় যায়।

১৫
গৌররূপে নিল নয়ন
উপায় কি করি ॥
এগো নিল নয়ন মনপ্রাণ
তার সঙ্গে করি ॥
গৌরায় কি ভঙ্গিমায় চায়,
আস্তে আস্তে যায়,
ভুলাইলো নারী সমুদায়।
ও তার মনের ভাব বুঝতে নারি
কে আনিলো নৈদাপুরী ॥

www.pathagar.com

কাঁচা সোনা মেখে গায়
গৌরা আস্তে আস্তে যায়
কি কথা কহিল ইশারায়।
ও তার নাম জানি না গ্রাম জানি না
কেন্দে কয় শ্যামলা সুন্দরী ॥

১৬
লাবণ্য গৌরাঙ্গ রূপে মন নিলো হরিয়া।
এগো সকলি হারাইলাম আমি
সুরধনি গিয়া ॥
লাবণ্য হেরিয়া আমি
গৌরাঙ্গ হেরিয়া।
এগো মাঝে মাঝে ঢাকে রূপ
নামাবলী দিয়া ॥
বাহু তুলে নাচে গৌরায়
ভঙ্গিমা করিয়া
ভুলিতে না পারি মনে
উঠে রইয়া রইয়া ॥
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম
কুলমান ত্যজিয়া।
মধু বলে রূপের ছটা
লাগলো জলে গিয়া ॥

১৭
সুরধনির কুলে গো নাগরি
সুরধনির কুলে।
সে যে নাচিয়া নাচিয়া
হাসিয়া হাসিয়া
ডাক দিল দু'বাহু তুলে গো ॥
কলসি লইয়া জলে নামিয়া
চাইয়া রইলাম ভুলে।
জল তরঙ্গে ভাসিল কলসি
কুল ভাঙিয়া পড়িল জলে গো ॥
জলের ছায়াতে ঢেউয়ের কায়াতে
হেরিলাম ধুরন্দ ফুলে
সে যে জগত দুর্লভ
কহে রাধা বল্লভ
থাকে সে গোকুলের কুলে গো ॥

www.pathagar.com

১৮

আর জ্বালা দিও না বাঁশিরে
বাঁশি আর জ্বালা দিও না।
জনম দুঃখিনী রাধা
জাইনে কি জানো না বাঁশিরে ॥
মধুর সুরে বাজে বাঁশিরে
আমার চিত্ত দগ্ধ করে।
শিমুল গাছের কাঁটার মতো
বিন্ধিল অন্তরে বাঁশিরে ॥
ফুকারি কাঁদিতে নারি রে বাঁশি
আমার অন্তরেতে দহে
বসনে বদন ঢাকি
চক্ষে জল ধারা বহে রে ॥
অধীন ঈশ্বরে বলেরে বাঁশি
কেন লও মনে।
কুলবধূর কুল মজাইবার বাসনা কেমনে রে বাঁশি ॥

১৯

তুই আমারে দোষী যে বানাইলেরে
শ্যামের বাঁশি।
এগো সরলে নিরলে বসি
কাঁদি দিবানিশি রে ॥
কদম্ব ডালেতে বসি
কোন সন্ধানে বাজায় বাঁশি
এগো গোকুলে কি আর লোক ছিল না
আমায় করলি দোষী রে ॥
ঘরে বাহিরে হইলাম দোষী
মুই অবলা কেমনে বাঁচিরে
হীন লবচরণ কয় সঙ্গে গিয়ে
গলে দিব রশি রে ॥

২০

কালার পিরিতে কুলমান হারাইলাম গো সই
আর যাবো কই।
এগো যার লাগি কলঙ্কের ভাগি
সেবা কই আর আমি কই ॥
আমার মন হইলো না মনের মতো
মনোবাঞ্ছা পুরাইতো
ছায়ার মতো কায়া হয়ে রই।

www.pathagar.com

সাধ কইরে কলঙ্কের ঢালা
হস্তে তুইলে মাথে লই ॥
মহেশ চন্দ্র দাসে কয়
জীবন রাখা হইলো সংশয়
বলো গৃহে কেমন করে রই।
এগো চুন খাইয়া প্রাণে মইলাম
আমার মনে শুকনো দই ॥

৫. সূর্যব্রত সংগীত

ধর্মীয় শাস্ত্রাচারের অংশ হিসেবেই হিন্দুধর্মালম্বী নারীরা লোকসংগীতের উর্বর একটি ধারা সূর্যব্রত সংগীতকে এখানো পরম মমতায় জিইয়ে রেখেছেন। সূর্যব্রত সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে সুনামগঞ্জের প্রতাপরঞ্জন তালুকদার, কাশীনাথ দাশতালুকদার, মধুসূদন দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। গবেষক সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত *কাশীনাথ দাশতালুকদার-প্রণীত সূর্যব্রত সংগীত ও অন্যান্য* গ্রন্থে সম্পাদক সূর্যব্রত সংগীত সম্পর্কে বলেন, 'গ্রামীণ হিন্দু নারীদের কাছে সূর্যব্রত সংগীত ধর্মীয় শাস্ত্রাচারের অনুষঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতি মাঘ মাসে অনেকটা ঘটা করেই বর্ণিল আয়োজনে সূর্যব্রত উৎসব করে থাকেন নারীরা। পূজাচলাকালীন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে স্নান সেরে পূজার রীতিনীতি পালন করার বিধান রয়েছে। সে-সময়েই বাড়ির আঙিনায় সূর্যব্রত সংগীত পরিবেশিত হয়। গানের এ বিচিত্র ধারাটি এখনো গ্রামাঞ্চলে পরম যত্নে জিইয়ে রেখেছেন নারীরা। গোলাকারভাবে দলবদ্ধ হয়ে বড়-বড় করতাল-সহযোগে নারীরা গান পরিবেশন করে থাকেন।' সুনামগঞ্জ জেলায় বহু গীতিকার রয়েছেন, যাঁরা সূর্যব্রত সংগীত রচনা করেছেন। এরমধ্যে দুইজন প্রয়াত গীতিকারের নির্বাচিত সূর্যব্রত সংগীত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

কাশীনাথ দাশতালুকদারের গান

১
প্রথমে বন্দিনু আমি শ্রীগুরু চরণ।
ভবপারের কাণ্ডারি করি যে স্মরণ ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, গুরু ত্রিলোচন।
গুরু তো মনুষ্য নয় কৃষ্ণে প্রকাশন ॥
গুরু সর্বদেবময় শাস্ত্র নিরূপণ।
গীতা ভাগবতে আছে তাহার বর্ণন।
অজ্ঞান তিমির দূর করে গুরুধন ॥
জ্ঞানালোকে দীপ্ত করে কলুষ নাশন।
গুরু বিনে গতি নাই শ্রীগুরুর সেবন।
সেবা করো কায়মনে গুরু সর্ব ধন ॥
বিপদে আপদে গুরু করবে স্মরণ।
অন্তর্যামীরূপে তিনি দিবেন শান্তন।
ধর্ম অর্থ মোক্ষ বাঞ্ছা যে করে যেমন ॥

www.pathagar.com

শ্রীগুরু পারের কাণ্ডার ভজো অনুক্ষণ।
শ্রীগুরুকে না ভজিলে নরকে গমন।
বন্দি রাসবিহারী ও অদ্বৈত চরণ।
কাশীনাথ দাশ গায় লীলার কীর্তন।

২
দয়া করে এই আসরে গোলকের হরি।
এসো করো অধমের জ্ঞানের সঞ্চারী ॥
সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ মুকুন্দ মুরারী।
রামানন্দ শিবানন্দ আর নরহরি ॥
দামোদর হরিদাস আর ব্রহ্মচারী।
রূপ-সনাতন জীব ভক্তি অধিকারী ॥
ভট্টদাস দাস রঘুনাথ যারা নেয় তরি।
শ্রীবাস গোপালভট্ট, গদাধর পুরী ॥
সব ভক্তের নাম মুই কইতে না পারি।
সঙ্গে নিয়া আসো তুমি সংকীর্তন করি ॥
সংকীর্তন মাঝে নাচো প্রেমে ঘুরি ঘুরি।
পদরজঃ শিরে নিয়া গায়িকেরা তরি ॥
কাশীনাথ বলে ওহে প্রাণ গৌর হরি।
অন্তিমেতে পাই যেন তব পদতরি ॥

৩
ভক্ত কাঁদে, সময় গয়ে যায়।
পাইয়া দুর্লভ জনম না-ভজিলাম হরির চরণ
বৃথা কাজে সময় গত প্রায়।
পড়েছি চৌরাশির ফেরে আমার আমার আমার করে
বদ্ধ হয়ে রহিলাম মায়ায় ॥
জীবকৃষ্ণ নিত্য দাস ভুলিয়া সংসারের ত্রাস
ভুলে গেলাম না-পাইলাম মধু।
ত্রিতাপের জ্বালা নিয়ে অমৃত ভরে বিষ পিয়ে
সংসার কূপে রহিলাম শুধু ॥
আত্মজ্ঞান না হইল কাম ক্রোধ মন রহিল
ষড়রিপু পঞ্চরাগে মন।
না-ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ প্রেমে না হই সতৃষ্ণ
না-বুঝিলাম নাম প্রেমধন ॥
হায়রে জীবন বৃথা গেল গুরুর নাম না স্মরিল
বেলা গেল ঘাটে বান্ধা তরি।
কাশীনাথের এই বাসনা হইবে অনন্য মনা
সময় থাকিতে বল হরি হরি ॥

www.pathagar.com

৪
জয় দাও রে হরিনামের বল কৃষ্ণ হরে।
বাজে দুন্দুভি ধ্বনি মথুরা নগরে ॥
ঢোল করতাল বাজে মৃদঙ্গ ঢাক রে।
শিঙা বাঁশরী বাজে ডুমুর এস্‌রাজের ॥
নর্তক নর্তকী নাচে ভাট গান করে রে।
আকাশ হতে দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করে রে ॥
মিঠাই মুণ্ডা ক্ষীর দধি খায় পুরবাসী রে।
আনন্দে হাসে নাচে নব বস্ত্র পরি রে ॥
বসুদেব বসিলেন আসন উপররে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ হলো কুঞ্জের ভিতরে ॥
দেবক রাজা দান করে সুতা দেবকীরে।
উগ্রসেন ভ্রাতা তিনি কংসের কাকারে ॥
শত শত গাভী অশ্ব হাতি দাস দাসীরে।
ধন রত্ন কত দিলা হেম অলঙ্কার রে ॥
দেবকী বিয়া হইল আনন্দ অপার রে।
নারীগণে উলুধ্বনি দেয় উচ্চ স্বরে রে ॥
কাশীনাথ কহে শোনো গায়িকা রমণীরে।
উলুধ্বনি দাও সবে হইয়া সমস্বরে রে ॥

৫
স্নান করায় রে মায়ে গোপাল নীলমণি।
শ্রীদামাদির কথা শুনে হর্ষে নন্দরানি ॥
সোনার কলসিসহ পঞ্চঘট আনি।
জল ভরিতে গেলা যত ব্রজের রমনী ॥
গীত বাদ্য করে সব ব্রজ নিবাসিনী।
যমুনার নীল জল ভরি সবে আনি ॥
কাষ্ঠের পাটেতে রানি দিয়া আলিপনী।
বসালেন যাদুমনি হর্ষেতে জননী ॥
উলুধ্বনি দেয় সবে যশোদা রোহিনী।
ধান্য দুর্বায় অর্ঘ দিলেন শিরেতে তখনি ॥
সুগন্ধি সাবান দিলেন গায়েতে মাখানি।
শীতল জলে স্নান করান মাত নন্দরানি ॥
কস্তুরী মিশ্রিত তৈল গায়ে দিলা রানি।
সাজাবার তরে পুত্র কোলে করে আনি ॥
স্নানের পরেতে মায়ে আনি ক্ষীর ননী।
মুখে দিলা সর যত মধু, মিছরি, চিনি ॥
উদর ভরিয়া হাসে পুত্র যাদুমনি।

www.pathagar.com

সাজাতে লাগিলা মায়ে হয়ে আনন্দিনী ॥
কাশীনাথ দেখে যেন লীলারস খানি।
ব্রজধামে নিয়া আশা পুর নন্দরানি ॥

৬

দেখো রাধার প্রাণের হরি নানা ভঙ্গিমা করি
মনোরঙ্গে গোষ্ঠেতে যায় রে।
যাবট নিকটে গিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙিমা হইয়া
চলিতে লাগিলা রাধা প্রাণ।
হেরিয়া ওই চাঁদ বদন উথলিল রাধার মন
কামবাণে হইলা মগন
পড়িলা হর্ম্যের উপর অঙ্গ কাঁপে থর থর
ললিতায় ডাকে ঘন ঘন ॥
ওগো মাতা জটিলা আজি কি অপূর্ব লীলা
বিষ জ্বালায় রাধা অচেতন।
শীঘ্র আনো ওহে আই জলধরের ছোটো ভাই
ভালো ওঝা জানে সর্বজন ॥
জটিলা ধাইয়া যায় ধরে গিয়া শ্যাম পায়
কহে বাঁচাও বধূর জীবন।
হাসিয়া বলে শ্যাম তোমার বধূর কী নাম
বুড়ি কহে হয় রাধা নাম ॥
রাধানাথ ফিরিয়া আসি হম্মোর উপরে বসি
কৃষ্ণ নাম শ্রবণে শুনান ॥
কৃষ্ণ গন্ধ নামে পশি রাধা তখন উঠে বসি
কৃষ্ণ বলি করে আলিঙ্গন ॥
দুহুঁকার কি বা শোভা কি মাধুরী মনলোভা
রাধাকৃষ্ণের হইল মিলন।
কাশীনাথের এই বাসনা পুরাও ওহে কেলে সোনা
মাথে অন্তে দিও যুগল চরণ ॥

৭

স্তব করে কৃষ্ণের সদন, ওহে প্রাণধন ॥
ব্রহ্মা গাভী রাখাল হেরি বলে হাত জোড় করি
তুমি হও কারণের কারণ।
'নার' অর্থে জীবগণ অয়নে আশ্রয় হন
তাই তুমি মূল নারায়ণ ॥
তোমার নাভি পদ্ম হতে আসিলাম এ জগতে
তুমি হও বিশ্বের জীবন।

www.pathagar.com

অনাদির আদি তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী
তুমি বিনা নাই উদ্ধারণ ॥
তোমার মায়ায় চন্দ্র সূর্য নারদাদি মুণি আর্য
জগতের সব জীবগণ।
সৃজিলায় সকলই তুমি নিমিত্ত হই মাত্র আমি
তোমা বই প্রাণহীন জীবন ॥
নীরদবরণ শ্যাম তুমি সর্বগুণ ধাম
সর্বশ্রী সর্ব যশঃগুণ।
আকাশের তারাগণ তাহাও হয় গণন
তোমার মহিমা অগনন ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বেত্র শৃঙ্গ রেণু যত
তাহা তুমি করিছ ধারণ।
পরিয়াছ পীতাম্বর কর্ণ ভূষণ গুঞ্জর
ময়ূর পুচ্ছ শিরের ভূষণ ॥
মণিময় নূপুর পায়ে সদা তাহা বিরাজয়ে
তুমিই নিত্য ব্রজের ধন।
ক্ষমো মোরে পুত্র জেনে জ্ঞানহীন অভাজনে
আমি আর কি করি স্তবন ॥
গো বৎস আনিলেন গিয়া কৃষ্ণ পদে নিবেদিয়া
স্বস্থানে করিলা গমন।
কহে দাশ কাশীনাথ ওহে প্রভু জগন্নাথ
তব পদে থাকে যেন মন ॥

৮

কেহ ভেক, কেহ কুকুর কেহ ময়ূর হইলা।
বানরের মতো কেহ বায় গাছপালা ॥
কান্দে চড়াচড়ি ভাবে করে তারা খেলা।
যারা হারে তারা অন্যে কান্ধে নিবার পালা ॥
দুই পক্ষে থাকে তারা রাম আর কালা।
শ্রীদাম চড়িলা কান্ধে কৃষ্ণ হারিলা ॥
অনাদির আদি কৃষ্ণ কেহ না ভাবিলা।
এইভাবে পরস্পর খেলিতে লাগিলা ॥
বলরাম হারিলে কৃষ্ণ কান্ধেতে চড়িলা।
গোচারণে বন মাঝে কত করে লীলা ॥
সখ্য প্রেমে এত মধুর জগতের আলা।
আত্মসুখ নাই তাদের কৃষ্ণ প্রেমে ভুলা ॥
কাশীনাথ বলে শোনো নরনারী বালা।
জগতে এমন মধুর আর নাহি লীলা ॥

www.pathagar.com

৯
পতিরূপে পাইবারে কুমারিকাগণ।
কাত্যায়নী পূজার তারা করে আয়োজন ॥
একমাস করে তারা দুর্গার পূজন।
ক্রমে আসি উপজিল পূর্ণিমার ক্ষণ ॥
যমুনার তীরে রাখি তাদের বসন
বিবস্ত্র হইয়া জল খেলিতে মগন ॥
জানিয়া মনোভাব তাদের দেখে কৃষ্ণগণ।
পরীক্ষার তরে বস্ত্র করিলা হরণ ॥
চিরঘাটে কদম গাছে করি আরোহণ।
আসি নেও বস্ত্র তোমরা ডাকে ঘন ঘন ॥
শীতল জলে বাল্যগণের থরথরে কম্পন।
কাতরভাবে কহিলেন কৃষ্ণের স্তবন ॥
ওহে কৃষ্ণ জগতের পতি জনার্দন।
তোমাকে পাইতে পতি দুর্গার পূজন ॥
কৃষ্ণ কহিলেন ওহে ব্রজবালাগণ।
অপরাধ করিয়াছ দেবের সদন ॥
জোড়হাতে স্তব করো সব দেবগণ।
বস্ত্র নিয়া করো তোমরা স্বগৃহে গমন ॥
কাশীনাথ বলে শোনো ব্রজবালাগণ।
লজ্জা ছেড়ে লও তোমরা কৃষ্ণের স্মরণ ॥

১০
বস্ত্রদান করিয়া রাম-কৃষ্ণ সখাগণ।
গাভীগণ নিয়া বনে করিলা গমন ॥
যমুনার জল তারা করি দরশন।
নিজেরাও স্নান করে সহ রাখালগণ ॥
ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাখালের গণ।
তারা বলে দাও কৃষ্ণ অন্ন ও ব্যঞ্জন ॥
কৃষ্ণ বলে চাও গিয়া ব্রাহ্মণ সদন।
ব্রাহ্মণীরা পূজা করে যজ্ঞে দেবগণ ॥
যাচন করিল তারা না দিল ব্রাহ্মণ।
ফিরিয়া আসিল তারা কৃষ্ণের সদন ॥
ব্রাহ্মণীদের কাছে যাও বলে কৃষ্ণধন।
রামকানাই নাম ধরে করিবে মাগন ॥
ব্রাহ্মণীরা ব্যগ্র কৃষ্ণ করিতে দর্শন।
নানাবিধ খাদ্য নিয়া করিলা গমন ॥
রামকানাই খাইলা সব নিয়া সখাগণ।

www.pathagar.com

যজ্ঞস্থলে যাও তোমরা বলে জনার্দন ॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে গেলা নারীগণ।
এক স্বামী স্ত্রীকে আসতে করিলা বারণ ॥
সেই নারী ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ।
ভূমে পড়ে দেহত্যাগ করিলা তখন।
এইভাবে ব্রাহ্মণীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ।
কাশীনাথ কৃপা করো ওহে নারায়ণ ॥

মধুসূদন দাসের গান

১

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ প্রভু শচীর নন্দন।
নদীয়াতে অবতীর্ণ পতিত পাবন।
জয় জয় গৌরাঙ্গ, জয় নিত্যানন্দ
জয় অদ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
প্রথমে বন্দনা করি অনাদির চরণ।
দ্বিতীয় বন্দিনু ব্রহ্মা, পরম কারণ।
তৃতীয়ে বন্দিনু বিষ্ণু জগতের পতি।
তাহার দুই ভার্য্যা বন্দি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
সরস্বতী মা বন্দি বিষ্ণুর বণিতা।
কণ্ঠে বসি যোগায় গীত, সুরস কবিতা।
এসো মাগো সরস্বতী কণ্ঠে করো ভর।
গায়কের দেও মাগো কোকিলের স্বর ॥
চতুর্থ বন্দিনু শিব গণেশ সহিতে।
অর্ধ অঙ্গে দুর্গা শোভে গঙ্গা শোভে মাথে।
পুষ্প মধ্যে বন্দিলাম আদ্যের তুলসী।
ব্রত মধ্যে বন্দি মুই ভৈমী একাদশী ॥
পিতামাতা আদি গুরু বন্দি দুই জন।
শিক্ষাগুরু বন্দি যেই শিখাইল গায়ন ॥

২

কান্দে গো তুলসী অঝোর নয়নে।
না যাবো না আর আমি মর্ত্য ভুবনে।
মর্ত্যের নরলোকে আমায় না মানিবে।
কদাচার করি মোরে বহু কষ্ট দিবে।
অজ্ঞান মনুষ্য ডাল মঞ্জরি ভাঙিবে।
কালাকাল না গনিয়া পত্র তুলে নিবে ॥
গৃহস্থ ঘরের বধূ বস্ত্র বাও দিবে।
গোবরের ছিটা মোর উপরে ফেলিবে ॥

www.pathagar.com

আমার শরীরে ইহা কেমনে সহিবে।
মধু বলে তোমায় পাইয়া সংসার ত্বরিবে ॥

৩
নবীন কোকিলায় গুঞ্জরে, তমালের ডালে।
বিরহিনীর অঙ্গ দহে, বিচ্ছেদ অনলে।
ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ গেল দূরে।
ভ্রমর বিহনে রেনু ঝরি ঝরি পড়ে।
একদিন কংস রাজা, বসি সিংহাসনে।
অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ে দেবকীর পানে ॥
নবীন যৌবন তার বাড়ে দিনে দিনে।
কার কাছে দিব বিয়া ভাবে মনে মনে।
দরবার ভাঙিয়া গেলা ভোজন করিতে ॥
জননী জিজ্ঞাসা করে, কংসের সাক্ষাতে।
সম্পূর্ণ যুবতী তোমার দেবকী ভগিনী।
বিয়া কেন নাহি দেও কংস চূড়ামণি ॥
মায়ের বচনে কংস নোয়াইয়া মাথা।
ডাক দিয়া দূত আনি, কহে মর্ম কথা ॥

৪
মায়ে কত আরাধনা করে গোবিন্দের লাগিয়া।
দিবানিশি অশ্রু পড়ে ধারা বুক বাইয়া।
শুভক্ষণে দৈবকী যে ঋতুবতী হইলা।
তিন দিনে শুভযোগে গঙ্গাস্নান করিলা ॥
গোবিন্দ পাইবার আসে ভাবে সর্বক্ষণ।
গর্ভেতে সঞ্চিত হইলা দেব নারায়ণ ॥
স্নান করি দেবদেবী করিলা অর্চনা।
পুত্র মুখ দেখিবার মনেতে বাসনা।
পাকশালে গিয়া দেবী করিলা রন্ধন।
স্নান সন্ধ্যা করি বসু করিলা ভোজন ॥
ভোজন করি বসুদেব করিলা আচমন।
সেই খাটে সেই খালে দৈবকী ভোজন।
আচমন করি দেবী মুখে দিলা পান।
হেনকাল চাইয়া দেখে বেলা অবসান ॥

৫
উঠিয়া দেখো চান্দ মুখ, হে নন্দঘোষ
উঠিয়া দেখো চান্দমুখ ॥
নিদ্রাতে জন্মিল শিশু, আমি তো না জানি কিছু
চেতন হলো ক্রন্দন শুনিয়া ॥

www.pathagar.com

শুনিয়া যশোদার কথা, নন্দঘোষ আইলা তথা
হরষিত ছাওয়ালে দেখিয়া ॥
গোকুলে পড়িল সাড়া জানিল গোপের পাড়া
নারীগণে দিলা উলুধ্বনি ॥
শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলা শুনি আসিলা নারদমুনি
বীণা ধরে করে হরি ধ্বনি ॥
ব্রহ্মা আইলা হংস রথে, আসিলা শিব শঙ্করী
গঙ্গা আসিলা মকরেতে।
শুভ বার্তা কর্ণে শুনি, আসিলা যে গর্গ মুনি
পাঞ্জি পুথি লইয়া নিজ হাতে।
হরষিত নন্দরাজা, সকলে করিলা পূজা
আসনে বসাইয়া বিধিমতে।

৬
আমরা গোকুল ছাড়িয়া যাই
যশোদা গো সুখে থাকো লইয়া কানাই।
ঘটল বিষম যাতনা দধি দুগ্ধ মাখন রাখিতে পারি না
ভাণ্ড ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে তব কানাই ॥
রানী! ধিক ধিক ধিক
পান খাইয়া তোর ছাওয়ালে বসনে দেয় পিক
ছায়া দেখি ফিরাই আঁখি চাইতে মাত্র নাই
আসি আর এক গোপী কয়–
তোমার কানাইর দুঃখ শরীরে না সই
ডাল ভাঙিল, ফল খাইল, গাছে ফুল নাই।
বলে আর এক গোপী আসি–
গোপাল ভাঙিল আমার জলের কলসী।
আবার দেখি ঘরে আসি, দুধের সর নাই
ভাবিয়া দীন মধু গায়–
কার রসে খেলে প্রভু, বুঝা হইল দায়
কারে হাসায় কারে কাঁদায় নিলয় না পাই ॥

৭
দিদি রোহিনী গোপাল নাচে সর ননী খাইয়া
গোপাল নাচে সর ননী খাইয়া।
মায়ের আদেশ পাইয়া, গোপাল নাচে ধাইয়া ধাইয়া
গোপীগণে দেয় করতালি।
পুরাইতে গোপীর আশ, নৃত্য করে শ্রীনিবাস
ভঙ্গি করে পড়ে হালি ঢলি ॥

www.pathagar.com

গোপী বলে বনমালী, নাচ দেখি বাহু তুলি
কি সুন্দর নাচন তোমার।
অন্য গোপী বলে শ্যাম আঁখি নাহি দেখিলাম
নাচো যদি দিব গলার হার।
গোপী মন রাখিবারে কৃষ্ণ নাচে বারে বারে
হরষিত যশোদার মন।
মধু বলে দয়াময় মোর যেন দয়া হয়
অন্তে দিও এ রাঙা চরণে ॥

৮
বলরাম ফিরে যা তোর গৃহেতে।
নীলমণিকে দিব না আজ গোষ্ঠেতে ॥
শুনো রে বলাই, আমার একেলা কানাই
মায়ের আর লক্ষ্য নাই।
গোপাল যদি নেওরে গোষ্ঠে
পাষাণ দেও মোর বুকেতে।
শুনো বলরাম অঙ্গে চুয়াইলে ঘাম
আমার নব ঘনশ্যাম;
ওরে রবি বড় তাপ দিছেরে।
শুন যত সখাগণ আজি দেখি
কানাই হারালো জীবন।
ওহে কালীদহের কালো জলেরে
কানাই ঝাঁপ দিয়াছে তাহাতে।
তুমি শুনো হলধর কানাই রাখিয়া যাও ঘর
বাছা এ নিবেদন মোর।
প্রাণের কানাই, বনে গেলেরে।
আমি বাঁচিব না প্রাণেতে।

৯
কান্দে সুবল সখা রাধা দুনয়নে।
কুটিলার কুটিল বাক্য শুনিয়া শ্রবণে
সুবল কহিছে ভালোবাসা বলি জানি।
সে কারণে আসিলাম খাইয়া যাব পানি
ভালো হইল পুরাইলে মোর মনের আশা।
যে গালি দিয়াছে মোরে মিটিল পিপাসা।
বাছুরী হারাইয়া আমি শ্রমমুক্ত হইয়া।
মনে ছিল খাব জল রাধারে খুঁজিয়া ॥
এত বলি যা সুবল কান্দিয়া কান্দিয়া
দেখিয়া জটিলা মনে উপজিল দয়া ॥

www.pathagar.com

১০
নবীন বেশে কে তুমি নবীন বেশে কে
চন্দ্র সূর্য পায় লাজ দেখিয়া তোমাকে
সুবলের বেশ ধরি হাটে ধীরে ধীরে।
উপনীত হইল আদি রাধাকুণ্ড তীরে
ফেলিয়া ঘরের ধেনু পড়িয়া ধুলায়।
রাধা রাধা বলি কানু গড়াগড়ি যায়।
হেট মুখে ছিল মাথা তুলি চায়।
সুবল আসিল ফিরি ঐ যে দেখা যায় ॥
আনো রে সুবল ভাই কোথায় আছে রাই।
সুবল কহিছে তার দেখা নাহি পাই ॥

১১
হরিতে রাধার দর্প করিয়া বিচার
কৃষ্ণ হেলা মায়ের কাছে মুক্তা আনিবার ॥
মায়ের সাক্ষাতে গিয়া বন্দিলা চরণ।
চাঁদমুখ নন্দরানী করিলা চুম্বন ॥
রানী বলে একা আইলে কিসের কারণ।
কোথায় আছে হলধর লইয়া শিশুগণ ॥
কৃষ্ণ বলে কুশলে আছেরে সর্বজন।
আসিয়াছি তব কাছে মুক্তার কারণ ॥
এক মুক্তা দেও মাগো লাগাবে কানন।
মুক্তায় করিব আমি গোধন ভূষণ ॥
ইহা শুনি নন্দরানী লাগিলা হাসিতে।
কভু নাহি শুনি মুক্তা বলে বৃক্ষ হতে।
মারিবে অভাগীর যাদু এক কোল খেলা
গরুর গলায় দিবে মুক্তার মালা।

১২
প্রেমময়ী রাই প্রেমের বাজারে চলো যাই
ওগো সারি সারি চলিলা সবাই।
হেনকালে রাজ পথে কানু আসি অকস্মাতে
হাসি হাসি বলে দান চাই।
রাই বলে রাস্তা ছাড়ো লাজ ভয় নাহি করো
রাস্তা ছেড়ে মোরা চলে যাই।
কানু বলে কটু কথা কহিয়া দিও না ব্যাথা
তোমার পরাণে সদা চায়।
যত ইচ্ছা বলো মন্দ তাতে আমার হয় আনন্দ
এত বলি হস্ত দিলা গায়।

www.pathagar.com

রাই বলে কি করিলে কেন আমারে পরশিলে
লজ্জা বিধি না দিলা তোমায়।
শুনো ওহে বনমালী নন্দরাজের বেটা বলি
অহংকার করছ সদায়।
কৃষ্ণ বলে পুরাও আশ হইব তোমার দাস
দান করো প্রেমময়ী রাই।
রাই বলে থাকো দূরে ছুঁইও না ছুঁইও না মোরে
পাছে মোর জাতিকুল হারাই।
অন্তরেতে ভালোবাসা মুখে বলে কটু ভাষা
ভ্রুভঙ্গি করিয়া ধনি চায়।
কৃষ্ণ প্রেমের এই রীতি বাম হইয়া থাকি নীতি
মধু বলে ভাব বুঝা দায়।

১৩
জুড়াই তাপিত প্রাণ নতুন যৌবন করো দান।
এমন যৌবন হেরি পরান বান্ধিতে নারী
প্রাণেশ্বরী রক্ষা করো প্রাণ।
দেখি তব চাঁদ মুখ, মদনে দহিল বুক
পরোধর দেখি সুনির্মাণ।
ভঙ্গিমা দেখিয়া তোর মদনে পঞ্চ শর
অলক্ষিরত বিন্ধে প্রাণ ॥
দেখি তব ভোজলতা পাশরি লাজের কথা
মোর গায়ে দেও হস্তখান।
সুমধুর কণ্ঠস্বর পরান বাড়িল মোর
নয়নে নয়ন নিল হরি।
দাস মধু বলে প্যারী এ যৌবন দান করি
তুষ্ট করো রসময় হরি ॥

১৪
গৃহে আইল আইল রে নন্দের সুন্দর
গৃহে আইল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যে গোকুলে উদয় হইল
গোকুলে উদয় হইল।
ভৃঙ্গারের জলে মায় পাওখানি ধুয়াইলা
পাওখানি ধুয়াইলা।
নেতির আঁচলে বাছার অঙ্গ মুছাইল
অঙ্গ মুছাইল।
রাম কানাই দুটি ভাই কোলে তুলি নিল
কোলে তুলি নিল।

www.pathagar.com

সর ননী লইয়া রানী মুখে তুলি দিল
মুখে তুলি দিল।
মধু বলে রাম কানু ভোজন করিল
ভোজন করিল ॥

৬. ভাটিয়ালি

হাওরাঞ্চলের সাধারণ কৃষক, মাঝি, জেলের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা নিয়ে রচিত প্রেম ও বিচ্ছেদমূলক কিছু লোকসংগীত ভাটিয়ালি গান হিসেবে পরিচিত। সাধারণত নৌকা বাইতে, ধান রোপন করতে কিংবা অবসরে এসব গান সাধারণ মানুষের মুখে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে অবসরকালীন এসব গান গীত হওয়ার সময় অনেকে সারিন্দা ও বেহালার ব্যবহারও করে থাকেন। সুনামগঞ্জ অঞ্চলে লোকসংগীতের একটি জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ ধারা হচ্ছে ভাটিয়ালি পর্যায়ের গান। এ ধরনের কিছু সংগৃহীত গান নিম্নরূপ :

১
ওরে দূর বিদেশি নাইয়া যাওরে তরী বাইয়া
বুক ভরা দুঃখ রইল আমার অন্তরায় গাঁথিয়া ॥
বাবারে কইও মাঝি নাইওর নিতা আইয়া
আর কতদিন থাকতাম আমার মনরে বুঝাইয়া ॥
আসবে বাবা নিবে নাইওর থাকি আশায় চাইয়া
কলসি নিয়া নদীর ঘাটে কাঁদি আমি বইয়া ॥
পাখি যদি হইতাম আমি যাইতাম উড়িয়া
জনম মাটি দেইখা আমার কলিজা ঠাণ্ডা হইত গিয়া ॥
আমার কথা রাইখ স্মরণ যাইও না ভুলিয়া
আবদুল আজিজে কয় বাবা আইলে দিব তোরে সাজাইয়া ॥

২
সুরমা নদীর জলে নৌকা বাওরে মাঝি ভাই
অভাগিনীর খবর কইও ঘাটে নাও লাগাই ॥
সুরমা নদীর তীরে আমি ঘরবাড়ি বানাই
বাবারে কইও খবর নাইওর নিতা ভাই ॥
বাবার বাড়ির আম কাঁঠাল দুধের সীমা নাই
গুয়া নারিকেল সারি সারি তোমাকে জানাই ॥
হেমন্ত গেল বর্ষা আইল পথপানে চাই
আবদুল আজিজ কয় চোখের জলে কেঁদে বুক ভাসাই ॥

৩
আষাঢ় মাসে ভরা জল নদী করে টলমল
আইল নাগো প্রাণের বন্ধুয়া ফিরি ॥
নিঝুম রাতে বৃষ্টি ঐ ঝম ঝমাইয়া পড়ে সই

www.pathagar.com

মনের কথা কইতে আমি নারি ॥
সেই আষাঢ়ে চইলা গেল বর্ষা আবার ফিরে এল
বউ মানুষ নাইওর যায় চড়ে ময়ূর পানসী নায়
আমি শুধু চোখের জলে ঝুরি ॥
চারিদিকে বানের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়
আকাশ ভরা মেঘের খেলা বিজলী চমকায় ॥
বাদল ঝরা রাতে রইল বন্ধু কোন দেশেতে
বান্ধিয়া পাষাণে হিয়া আমারে গেল ভুলিয়া
আবদুল আজিজ একা ঘরে কান্দিয়া কান্দিয়া মরি ॥

৭. হোলি গান

বসন্ত ঋতুতে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব উপলক্ষে এক ধরনের গান পরিবেশিত হয়। দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত এসব গানই হোলি গান। অনেকে এ গানকে 'হোরি গান'ও বলে থাকেন। বিশেষ করে সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব গানকে আঞ্চলিকভাষায় 'উরি গান' হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। বাড়ির উঠোনে কিংবা মাঠে সুবিশাল চত্বরে আসর বসিয়ে হোলি গানের মঞ্চ তৈরি করা হয়। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি দলেই একজন করে দলপতি থাকেন। তাকে 'সরকার' অভিধায় ভূষিত করা হয়। বন্দনা, ঋতু বন্দনা এবং টপ্পা এই তিনটি ভাগে হোলি গানের পর্ববিন্যাস করা হয়ে থাকে। টপ্পা ভাগের 'চাপান' ও 'উতোর' নামে দুইটি বিভাগ থাকে। এটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। ঢোল ও কাঁসর বাজিয়ে গানের মাধ্যমে এক দল অপরদলকে প্রশ্ন করেন এবং অপর দল উত্তর দিয়ে পাল্টা উত্তর দেন। যে দল উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, সে দলকেই পরাজিত ঘোষণা করা হয়। সাধারণত পুরুষেরা এ ধরনের হোলি গানে অংশ নিয়ে থাকেন। তবে এ ধরনের হোলি গান ছাড়াও আরেক ধরনের হোলি গান রয়েছে, যেগুলো পুরুষ ও নারী উভয়েই অংশ নিতে পারেন। সেগুলো হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের দোল লীলা বিষয়ক গান। উঠোনে জলকাদায় একাকার করে সেখানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গান পরিবেশন করাকেও হোলি গান হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিম্নে নারীদের পরিবেশিত সংগৃহীত কিছু হোলি গান নিম্নরূপ :

১
হায় আগে বন্দি করজোড়ে শ্রীগুরুর চরণ
ওহে শ্রীগুরুর চরণ বন্দি শচীর নন্দন ॥
বন্দি শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ
রাধাকৃষ্ণ যুগল বন্দি লাল বৃন্দাবন ॥
বন্দি দেব গণপতি, লক্ষ্মী আর সরস্বতী
ব্রহ্মা বিষ্ণু যত ইতি দেব দেবীগণ
আগে বন্দি করজোড়ে শ্রীগুরুর চরণ ॥

২
আইল ঋতু বসন্ত প্রিয় বনে, চিত্তে দহে ধৈর্য না মানে
তমালের ডালে, কোকিলায় বোলে, কুহু কুহু রবে বিন্ধে প্রাণে ॥

www.pathagar.com

ফুটিল মালতী ফুল, গন্ধেতে করে আকুল
ঝরি ঝরি পড়ে রেণু ভ্রমর বিনে ॥

৩
বসন্তকালে পতি নাই যার ঘরে
নারী কেমনে কি করে, কেমনে কি করে
কেমনে কি করে, চলিতে না পারে নারী যৌবনের ভারে।
নারী কেমনে কী করে ॥
আইলরে বসন্তকাল, দুঃখিনীর দুঃখের কপাল
সুখের বসন্তকালে পতি দেশান্তরে, নারী কেমনে কী করে ॥

৪
লাল সরোবর লাল হয়েছে আবিরে
ছি ছি লাজে মরি রে।
নন্দঘোষ তোর পিতা বটে আয়ান তোর মামারে
আমি তোর মামী বটে ভাগিনা কানাইরে।
তুমি যে লম্পট বটে তোমার লজ্জা নাইরে
কোন সম্বন্ধে ঠাট্টা নির্ণয় না পাইরে
লাল সরোবর লাল হয়েছে আবিরে
ছি ছি লাজে মরি রে।

৫
লাল লাল কানাইয়া লাল, লাল রসবৃন্দাবনে
চারিদিকে লাল দেখি লাল যত সখীগণ ॥
লাল রত্ন দেবী লাল, লাল যত আবরণ
লাল ব্রজের ধুলা লাল, লাল তরুলতাগণ ॥
মধু বলে লালে লাল হইয়াছে সর্বজন
লাল লাল কানাইয়া লাল, লাল যত সখীগণ ॥

৬
ঘরে আওরে কানাইয়া
হোলী খেলাইয়া বংশী বাজাইয়া চাঁদবদন
ওরে বংশী বাজাইয়া চাঁদ বদনে ॥
বৃন্দাবনে যত পুষ্প বিকশিত
ঝরি ঝরি পড়ে রাঙা চরণে ॥
ও গুরু চন্দন, মইয়া সখিগণ
দিলা সবে শ্যাম রাঙা চরণে
ঘরে আওরে কানাইয়া ॥

www.pathagar.com

৮. মাজারের গান

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে হজরত শাহজালাল ও হজরত শাহপরাণসহ ৩৬০ আউলিয়ার মাজার রয়েছে। এর বাইরে অনেক পির-ফকিরের আস্তানা/কবর ঘিরেও রয়েছে অসংখ্য মাজার। এসব মাজারে প্রায় নিয়মিতভাবে বিশেষ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে এ অঞ্চলের সাধু-সন্ত-বাউল-ফকিরেরা গানের চর্চা করে আসছেন। মাজারকেন্দ্রিক রচিত হচ্ছে অসংখ্য গান। এসব গানে পির-নবী-আউলিয়া-মুর্শিদের বন্দনার পাশাপাশি বিচ্ছেদ, নিগূঢ়তত্ত্ব ও দেহতত্ত্বেরও নানা গান পরিবেশিত হয়। মাজারকেন্দ্রিক সুনামগঞ্জ অঞ্চলের গীতিকারদের লেখা প্রচলিত কিছু গান নিম্নরূপ :

১

আমি নবীর প্রেমে দেওয়ানা আমায় লইয়া যাওরে সোনার মদিনা
মদিনারই সুগন্ধ বাতাস যার অঙ্গে লাগিল সইগো
পুরল মনের আশা।
আমি দোষী কুলবিনাশী আমার অঙ্গে লাগল না ॥
মদিনারই মূল অধিকারী মুহাম্মদ মোস্তফা নবী
ভবের কাণ্ডারী
তান ঐ যুগলচরণ দু নয়নে লাগল না ॥
মদিনারই রওজা গো শরিফ, শিয়রে বসিয়া কান্দে যতেক মোমিন।
মনিরের দিন গেল বিফলে পুরল না মনের আশা ॥

২

উম্মতের নিস্তারী নবী আল্লার ও মকবুল
নবী পিয়ারা রাসুল ॥
হাসরের হয় বত দেখি পেরেশান হইবা নবী
কেবল গুনাগার উম্মতের কারণ ॥
আমলনামায় আবু বক্কর, মিজানেতে হজরত উমর।
আবু খয়ছরে কইবা উসমানগনী নবী ॥
দোযখের দরজাতে হজরত আলী খারা রবে।
আমার নবীজির মানিয়া হুকুম ॥
হজরত ও ফাতেমা বিবি আরশের কাংকুরায় ধরি।
কইবা মওলা মাফ করো বাবাজির উম্মত ॥
সওর নবীর ও নেকী, করইন যদি কোন রাবী।
তবু পুল দেখিবা হইবা হয়রান।
মোকাম মাহমুদায় আসি, সজিদায় পড়িবায় নবী
হায়রে তরাই লইবা তামামী উম্মত ॥
আগে যাইবে নুর ও নবী, পাশে যাইবা হজরত আলী
মধ্যে উম্মত রাখি লইবা উদ্ধার ॥
এমন ও দয়াল নবী না চিনিলায় মনির তুমি
ভেজ পাক জুনাবে হাজারও দুরুদ ॥

www.pathagar.com

৩
থাকেন নবী মদিনাতে আমি কেমন করে যাইগো
অন্তিম কালে চরণ যেন পাই।
যে যাইবায় মদিনার স্বরে, নবীজির পাক রওজায় যাইয়ে
কইও গুনাগার মনিরের সালাম গো।
চারই খলিফা তান বিবিগনা সহিদান
আমার সালাম কইও হাসন হুসাইন বিবি ফাতেমায় গো।
তাবেইন তবে তাবিন আর যত আছেন মোমিন
আমার সালাম কইও যত মদিনার নিবাসী গো।
মদিনার নিবাসীগণ সদায় আনন্দ মন
যে জায়গায় মৌলার রহমতেরই হয় বরিশন গো।
মনিরের মন বেছইন হাউসে রঙ্গে গেল দিন
নবীর পাইলে চরণ দিবা মুক্তি দান গো ॥

৪
আচ্ছালামু অলাইকুম
মোমিন পড় হে কালাম
রাসুল্লার পাক জুনাবে আমার হাজার সালাম ॥
হাসন, হোসেন, হজরত আলী, মা ফাতেমা যার
ওই সবার জুনাবে আমার হাজারো সালাম ॥
চিশতিয়া, কাদারিয়া, নশবন, মজদ্দছিয়া আর
ওই চারি তরিকার পিরের, আমার হাজারো সালাম ॥
সালাম করা সুন্নত ভাইরে, আলেক দেওয়া ফরজ
বয়ান করিয়া কইছেন নবীজি, হাদিসে খবর ॥
আল্লাতালার পাক জাতে, যত আশিকগণ
সবাকারে জানাইন সালাম মনিরও অধম ॥

৫
জালালের জালালি শানে, জালালের জালালি শানে।
সোনার কৈ মাগুর মাছে ডাকিলে শোনে ॥
ভেদাভেদ নাই জাতি-জ্ঞাতি, যে যে নিয়তে জানায় ভক্তি।
নিশ্চয় তাহার হয় উন্নতি, মিলে প্রমাণে ॥
জালাল বাবার কেরামত, বুঝিবার নাই কারো তাক্কত।
হাজারে হাজারে ভক্ত বসে রয় ধ্যানে ॥
কানা খোঁড়া, লেংরা লুলা, লইয়া মাজারের উছিল্লা।
শিরনি খাইয়া সারা বেলা, শান্তি পায় মনে ॥
পুকুরেতে গজার মাছে, ডাকিলে আসে কাছে।
জালালি গান গাছে গাছে গায় পাখিগণে ॥
ঝরনার পানি করিয়া পান, কত রোগী পাইল আছান।
ফকির সমছুলে কয় দূরে যায় নিদান, চাইতে যে জানে ॥

www.pathagar.com

৬
দয়া করো দয়াল বাবা হজরত শারপিন।
তোমার কাছে খাড়া আছি আমি দীনহীন ॥
দেখে তোমার কেরামতি, বুঝিবার কারো নাই শক্তি।
আসে দেশ-বিদেশী যাত্রী করিয়া একিন ॥
তোমার দোহাই বাঘে মানে, জীব জানোয়ার পশুগণে।
তুমি আসন দিলায় যে যে স্থানে, আজো আছে চিন্ ॥
পাথরের কুয়াতে পানি, জমা হয় দিন-রজনী।
খাইলে শীতল হয় পরানি, না জানি কত নীন ॥
বলে ফকির সমছুলে, তোমার দিদার পাব বলে।
ভরসা রেখেছি দীলে ভাসিও না ভিন ॥

৭
খাজা তোমার প্রেমষভাণ্ডারে আমি কাঙাল ভিক্ষা চাই।
ইহকাল আর পরকালে, দুই কূলে তোমার বাদশাই ॥
ডাকিতেছি করজোড়ে, আসো এই ভক্তের আসরে।
দেখে তোমায় নয়ন ভরে, হৃদমন্দিরে দিব ঠাঁই ॥
সঙ্গে নিয়া পাক পাঞ্জাতন, নবি আলী হাসন হুসন।
মা ফাতেমার যুগল চরণ, দেখে আমার প্রাণ জুড়াই ॥
গলে দিয়া তোমার নামের মালা, দূর করিব মনের জ্বালা।
ফকির সমছুলে কয় তোমার লীলা, বুঝিবার কারো সাধ্য নাই ॥

৯. আঞ্চলিক গান

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলেই উপভাষা রয়েছে। আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রায় সব জায়গার মানুষেরা কথা বলে থাকেন। এমনকি নানা সাহিত্যও রচিত হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক ভাষায়। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের নাম না-জানা অনেক গীতিকারেরা আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করেছেন। হালেও অনেক গীতিকারেরা লোকগানের আদলে আঞ্চলিক গান রচনা করেছেন।

সেসব কিছু গান নিম্নরূপ :

১
আমার ধানে হয় না খৈ
এক ছটাক ধান ভাজিয়া সাত টাইল ভইরা থৈ।
লাউড়ের পাড়ে হাল জুড়িলাম
সাগরে দিলাম মই
সংসার জুইরা বীজ বুনিলাম নিকাশ পাইতাম কই।
খলই দিয়া গাই খিরাইলাম বস্তা ভইরা দই
জীবন ভরা মাটা পাক দিয়া ঘি পাইলাম না সই।
সংসার জুইড়া হাল জুরিলাম আওজ লইলাম কই।
পাগা ছিইড়া দামা গেল বাদে আওজ লই

www.pathagar.com

গাছ বড় না বীজ বড় বিচার করো সই
গাছে বীজে বীজে গাছ কালা শায় কই।

২
ওগো দিলবর আলীর মামী
কার লাগি ছিরা কুটো তুমি।
হিদিন কইলায় আমার গেছে বাড়িত নায় তোমার স্বামী।
মনের ঘাইল পবনের ছিয়া আসলে খুব দামী
বখাইর মায় চিরা কুটইন ডাকাইয়া ধুমধুমি
আমির উদ্দিন কয় গো মামী হইয়াছি বদনামী।
ছিয়া ঘাইল ধান তইয়া কুটার শেষ পাইলাম না আমি।

৩
দেউড়ির মাঝে লাঙল তইলাম অনে পাই না কেনে
কওচাই কিতা কয় মোর মনে।
গত মঙ্গলবারে ঔলা নিছিল গি কোদাল
আইজ নিছেগি লাঙল আমার কাইল নিবগি জোয়াল
আনা জিকাইয়া লইয়া যায়গি মানেনি পরাণে ॥
লাঙল যদি না পাই আমি কিলা বাইমু আল
হুনিয়াও চুরে মাতে না অইগেছেগি কাল
রাইত থাকিতে গরু লইয়া পুয়া গেছে জমিনে ॥
পরতি বইচ্ছর ক্ষেত করি ইতা আমি জানি
দুইদিন বাদে পুকাইজিবগি জমিনর হকল পানি
দরকার আছিল নিত পারত কইয়া নেয় না কেনে
বলে আমির উদ্দিনে ॥

৪
কাজলী তোর বাপরে কইছ আমরার বাড়িত যাইতা,
গরু দুইটা জব অইব কইছ গিয়া খাইতা।
কইছ লগে কুত্তা নিতা না, না খাইয়া আইতা না
পুবর ঘর বৈঠকখানা ওখান গিয়া বইতা ॥
পুরুত্বাইতর আকিকা করমু
মুখ চাইয়া দাওত দিমু
মালছামানা বাক্কা পাইমু আইজ দিলে কাইল পাইতা ॥
আর মানুষ খাইতা আইছইন
কিছু কুত্তা লগে আইনছইন
খালি হাতে খাইতা আইছইন মাইনসে কেনে কইতা।
আরও কইছ আমির উদ্দিনর কেছেট রাখছি
উঠান এক আলং বানছি
ভালা দুইজন গায়ক আনছি মারফতি গান গাইতা ॥

www.pathagar.com

৫
হুরু ঠাকুর আমারে লইয়া সিলট যাইবায় নি।
একদিন গিয়া যেতা দেখছি, কইলে বিশ্বাস করবায় নি।
ইবার বিদেশ যাইবার আগে, একদিন গেছলাম তাইনর লগে
এবো আমার চখুত লাগে রং বিরঙ্গের নিশানী।
শাহজালাল বাবার মাজার, কি সুন্দর কৈ মাগুর গজার
কৈতর উড়ে হাজার হাজার শুইনা আজানের ধ্বনি।
চৌক বন্দরর মিঠা পান, তিন দিন মুখে থাকে গেরান
সুন্দর সুন্দর ভাতের দোকান খাইতে মজাদার বিরানী।
বেড়ার মাঝে টিপা দিলে, কি আচানক বাতি জ্বলে
ঘরর ভিতর গোসল গেলে উপরেদি পড়ে পানি।
এক আন্দাইর ঘরে দেখলামরে ভাই, ছবির মানুষ করে লড়াই
লেম জ্বালাইলে কুনতাঔ নাই হায়রে মজার কাহিনি।
ইবার যেবলা টেকা পাইমু, দুই তিন হাজার লুকাইলিমু
তালাবীর দায় সবরে কইমু গিয়াসে কয় বুঝছনি।

৬
তোমাকে এতই আদর করি ল সুন্দরী
কার কথায় মন কইরাছ ভারী।
স্নো পাউডার চিরণী তোমারে দিমু কিনি,
আর দিমু বেলওয়ারই শাড়ি।
বন্দরের বাজারে লইয়া যাইমু তোমারে
কিনিয়া দিমু হাতের ঘড়ি।
এবার বিদেশ যাব তোমারে সঙ্গে নিব
কথাটা কইলাম সত্য করি।
ফুলের বিছানায় রাখিব তোমায়
দেখিব দুটি নয়ন ভরি।
তোমার লাগিয়া দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া
সাজাবো আমার ঘরবাড়ি।
শফিকুন্নুরে কয় তুমি যদি হও সদয়
তোমারে লইয়া দিমু পাড়ি।

৭
শুনরে পুত গোপাল
বেহুদা মানুষের লগে বাড়াইছ না ভেজাল।
তর বাপ হইয়াছে বুড়া এখন তর পুড়া কপাল ॥
আগে তর বাপ ছিলরে বাবা এই দেশর মড়ল
বিনা খাজনায় খাইত কত জমিনর ফসল।
এখন নাই আর গায়েতে বল নাই আগের তাল ॥

www.pathagar.com

খাইতা আর ঘুমাইতা করতা মাতব্বরী
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া হাতে লইয়া ছড়ি।
দেখাইতা বেটাগিরী চোখ করিয়া লাল ॥
এখন গায়ের বল কমিয়া গেল পড়ল ছাপার দাঁত
মাতাইলে মাতইন্যা কুন্তা হজম হয় না ভাত।
সারাদিন থাকিয়া বিছনাত করইন আতাল-বিতাল ॥
তর বাপ মরিয়া গেলে আমি হইমু লাড়ী
কারে তুই আর বাপ ডাকিবে এই চিন্তায় মরি।
তর নাই আর আরিপরি কে রাখবে খিয়াল ॥
ফকির সমছুলে কয় থাকতে সময় শিখলে লেখাপড়া
মানুষ হইয়া শিখ আগে মানুষের কাজ করা।
এই দুনিয়া ভাঙাগড়া জ্বালা আর জঞ্জাল ॥

৮
এবোতরি স্বভাবখান তোর ভালা কর
তওবা তিল্লা কইরা এবো ভালা মাইনসর সঙ্গ ধর ॥
বুইঝ্যা হুইন্যা চিন্তা করি ছাড়ি দে তোর তকব্বরী
ভালা নায় অহংকারী মনটারে পরিষ্কার কর ॥
ধান্ধাবাজি মিছা কথা বকাবকি সব অযথা
যার মাঝে নাই মমতা শয়তান লইয়া দেয় চক্কর ॥
কয় উদাসী মকদ্দসে সুশিক্ষা শ্রীগুরুর কাছে
ভালোমানুষ যারা আছে চিন্তা করে নিরুত্তর ॥

৯
লন্ডনী স্বামী আমার লন্ডনী স্বামী।
সিলেটেতে লইয়া ওগো যাইবায়নি তুমি ॥
বাক্‌কা কয়েক দিন পরে, দেশের মাটিত আইলায় ফিরে,
মানুষে কইন তোমারে বড়ই নামী ॥
হুনছি সিলেট বাবার মাঝার, পুস্কুনীতে আছে গজার,
মানুষ দৈনিক হাজার হাজার, দেখলাম না আমি ॥
ঝরনার পানি যে জনে খায়, যে কোনো রোগ কমিয়া যায়,
সোনার কই মাগুর দেখা যায় দেখলাম না আমি ॥
চল একদিন মোরে লইয়া, একবারতা আনো দেখাইয়া,
নাইলে ভাইসাবরে লইয়া যাইমুগি আমি ॥

১০
লন্ডনে যাইতাম তোরে লইয়া গো তামসীর মা
শাড়িগুড়ি পিন্দাইয়া, নিমু প্লেইনে চড়াইয়া,
রাখমু তোরে গলায় তাবিজ দিয়া গো তামসীর মা ॥
গল্প করমু মনের মতো এয়ারকণ্ডিশনে বইয়া

www.pathagar.com

হাতে-হাতে ধরিমু, পার্কে নিয়া বেড়াইমু
সুবাতাসে যাবে মন ভরিয়া গো ॥
রং বেরংগের মানুষ দেখে যাবে মন জুড়াইয়া
তুমি আমি দুজনে, থাকিব মোরা এক সনে
সবি মিটাইব প্রেমের গান শুনিয়া লো ॥
শরীরে রং আমাদের যাবে ফর্সা হইয়া
কয় মকদ্দস উদাসী, মুখেতে ফুটবে হাসি
দুইজন মোরা যাব একজন হইয়া ॥

১১
ও তুই হর-হর-হররে ভেজাল বাড়াইছনা আমার লগে
জাগা মাত্র সাড়ে তিন বিঘে।
নামে ছিটায় জাগা আমার তুই করতে চাছ ভাগ
কাণ্ডকীর্তি দেখিয়া আমার মনে আসে রাগ।
বেটা অইলে সদর থাকি বদর আনিয়া আগলা
সেবাসেবি করিয়া কতয় দয়া ভিক্ষা মাগলা।
ছয় বলদে হাল জুড়িয়া ষোল পাটে মই
দশ নম্বরে বিছ পালাইয়া চৌকিদারিত রই।
সনে সনে রইদে বানে ফসলে দেয় মার
রমিজে কয় নয় খাড়ইলে ভাসিয়া যায়গি সার ॥

১০. কীর্তন গান

কীর্তন পর্যায়ের গানগুলো সন্ধ্যার সময় হিন্দু ধর্মালম্বী পুরুষেরা বাড়ির উঠোনে ঢোল, করতাল, হারমোনিয়ামসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাড়ির উঠোনে পরিবেশন করে থাকেন। একেক সন্ধ্যায় গ্রামের একেকজনের বাড়িতে কীর্তন পরিবেশনের রেওয়াজ রয়েছে। যে বাড়িতে কীর্তন পরিবেশিত হয়, সেদিন সন্ধ্যায় কীর্তন শেষে ওই বাড়ির মহাজন লোট প্রদানের আয়োজন করে থাকেন। সাধ্য অনুযায়ী বাড়ির মহাজন কীর্তন-পরিবেশনকারীদের প্রসাদ হিসেবে খিচুড়ি-সবজি ও পায়েস আহারের ব্যবস্থা করে থাকেন।

সুনামগঞ্জের হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে রোববার কিংবা বৃহস্পতিবারে ব্যাপকভাবে কীর্তন গানের আসরের আয়োজন করা হয়। অথবা গৃহস্থের সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো বারেই এ গানের আয়োজন করা যায়। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে রাত আটটা-নয়টা পর্যন্ত আবার কখনো সারা রাত ধরে কীর্তন গানের আসর চলতে থাকে। কীর্তনীয়ারা ঢোল, ঢোলক, করতালসহযোগে একের পর এক কীর্তন গান পরিবেশন করেন। নারী ও পুরুষ পৃথকভাবে এ গান পরিবেশনায় অংশ নেন। সংগৃহীত কিছু কীর্তন গান নিম্নরূপ :

১
প্রথমে বন্দনা করি গুরুপদ স্মরি।
গুরু তো মনুষ্য নয় গো প্রকাশ গোলক হরি ॥

www.pathagar.com

অখণ্ড মণ্ডলাকার যিনি জগৎ ভরি।
তাঁহার পদ দেখান গুরু তাঁকে প্রণাম করি ॥
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু ত্রিপুরারী।
গুরু বিনা নাই গো গতি, কে নিবে গো তরি ॥
ভাইবে কাশীনাথ বলে ওহে গুরু হরি।
যুগল চরণ ভেবে যেন অন্তিমেতে মরি ॥

২
দয়া করে এই আসরে আসো গৌর হরি।
এসো করো অধমেরে জ্ঞানের সঞ্চারি ॥
সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ মুরারী।
রামানন্দ, শিবানন্দ আর নরহরি ॥
রূপ-সনাতন জীব, সীতানাথ হরি।
ভট্টদাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট পুরী ॥
শ্রীবাসাদি গদাধর ভক্তি অধিকারী।
সব ভক্তের নাম আমি কহিতে না পারি ॥
কাশীনাথ বলে সঙ্গে সব ভক্ত করি।
সংকীর্তন মাঝে নাচো প্রেমে ঘুরি ঘুরি ॥

৩
কৃষ্ণ নাম এমন মধুর শুনিলে কানে।
আহার নিদ্রা দূরে যায় গো টানে পঞ্চবাণে ॥
নাম মাধুরী, প্রাণ যে হরি শয়নে স্বপনে।
দিবানিশি চোখের জল মোর পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
আইনে দেখাও প্রাণ ললিতে থাকি গো কেমনে।
নামই যার এত মধুর দেখলে বাঁচি কি পরাণে ॥
ভাইবে কাশীনাথ বলে রাই শুনো গো শ্রবণে।
ভবসাগর পার হওয়া যায় ওই নামেরই গুণে ॥

৪
আর শুনব না কৃষ্ণ নাম ওই নামেরই গুণে।
বাহ্যজ্ঞান হরে নামে, (ওই নাম) শুনিলে শ্রবণে ॥
কৃষ্ণ নামের এত গুণ চিত্ত আকর্ষণে।
নাম শুনিয়া পাগল হইলাম, প্রাণে ধৈর্য না মানে ॥
কালার প্রেমে এত জ্বালা নামেরই কারণে।
যতই জপি ততই টান বাড়ে দিনে দিনে ॥
ভাইবে কাশীনাথ বলে ওই নাম জপো মনে মনে।
শ্বাশুড়ি ননদী শুনলে রাখবে কি পরাণে ॥

www.pathagar.com

৫
নাম বলিয়া নাচিতেছে আমার বদনখানি।
লক্ষ লক্ষ বদন হইয়া কেন, করে না বাখানি ॥
কোটি কোটি কর্ণ কেন হয় না গো মোর এখনি।
নাম শুনিয়া শীতল হয় গো, আমার এই পরাণি ॥
হস্ত পদ ইন্দ্রিয়াদি কৃষ্ণ নাম শুনি।
শিথিল হইয়া যায় গো তারা শুনি নামের ধ্বনি ॥
কৃষ্ণ নাম দুই অক্ষর কত মধুর না জানি।
কাশীনাথ হবে কি পার এই ভবসাগরখানি ॥

৬
কলির যুগের রাজা হরি
নদিয়াপুরে রাজমহল
বল বল বল রে, ও মন হরি হরি বল ॥
কলিতে কল করিয়া
মন মজাইল নাম বিলাইয়া
করিয়া নানান ছল ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে
যে জন মনরে হরি বলে
অনায়াসে পার হইল পাইয়া কলির কল ॥

৭
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম
জপ সে নাম অবিরাম
স্বর্গ থাকি দেবগণ জপে সে নাম ঘন ঘন
মুনিষ্য জনমও লইয়া ধন্য করো ধরাধাম ॥
কালে কালে নামের গুণ
শুন রে মন আরো শুন
নিজে গৌরা হরি বলে
নেচে বেড়ায় ব্রজধাম ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে
তরো রে মন নামের বলে
মুখে বল হরি হরি
হাতে করো হাতের কাম ॥

৮
হরি গুণ গাও রে ও মন, কৃষ্ণ গুণ গাও
নামের গুণ দেহতরি
মনের সুখে বাইয়া যাও ॥
নামেরও মহিমা জানি

www.pathagar.com

হও রে ও মন কৃষ্ণধনী
এমনও অমূল্য ধন আর কোথায় পাও ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যারে
পঞ্চমুখে নাম করে
অনাথের নাথ যিনি তার গুণ গাও ॥
ভাইবে রাধারমণ বলে
বেলার দিকে চাও
হরি নাম সম্বলে চিন্তা বিনা তরি বাও ॥

৯
তোমার শ্রীচরণে নিবেদন, কৃপা করো প্রভু নারায়ণ।
তুমি নিজ গুণে কৃপা করে দাও হে প্রভু দরশন।
আমি হীনজন অতি, তোমার পদে নাই মতি
এ কারণে ঘটল ভবে এত দুর্গতি।
আমি জন্মাবধি অপরাধী না জানি সাধন ভজন।
প্রভু তুমি কৃপাময়, প্রভু তুমি সর্বময়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয় তবে হতে হয়।
তোমার আজ্ঞা বিনে এ জগতে বৃক্ষপত্র না হয় ক্ষয়।
তুমি আদি নিরঞ্জন, তোমায় চেনেবা কয়জন ॥
সর্বদায় খুঁজিয়া মরি বিষয় আশায় ধন।
অজ্ঞান সন্ধ্যায় বলে মরণকালে পাই যে প্রভুর শ্রীচরণ ॥

১০
ডাকইন নন্দরানী মায়, কে নিবে কে নিবে লুটে
আয়রে তোরা আয়।
ওহে রাখাল রাজা সুবলসখা শ্রীদাম নটরায় ॥
ব্রজবাসী ছিলেন যত সবই হলেন সমবেত
বালক বৃদ্ধ আতুর অন্ধ কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
চিনির বরপি জোড়া পেড়া, নকুলদানা রসগোল্লা
দুইহাত ভরিয়া লুট আনন্দে বিলায়।
আম কাঁঠাল নারিকেল কলা কমলা বেল
নন্দরানী হাসি হাসি, আনন্দে বিলায় ॥
সন্ধ্যায় বলে ভুলের তরে জন্ম গেল অবহেলে
পাইলাম নাগো নামের লুট কর্মফলের দায়।

১১
জয় ধ্বনি প্রেম ধ্বনি জোকার ধ্বনি দিয়া।
স্থুলি অঙ্গ করইন সব ব্রতিগণ মিলিয়া।
আগে পাছে ব্রতিগণ সকলে মিলিয়া।
সূর্য পূজার ফুল বেল পাতা জলে দেইন ভাসাইয়া ॥

www.pathagar.com

ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য দেব প্রণাম করিয়া।
সূর্য পূজার ঘট লইন বিসর্জন করিয়া ॥
দ্বাদশ গোপাল চরণে প্রণাম করিয়া।
উপাস ভাঙে ব্রতীসব চরণামৃত পান করিয়া ॥
লক্ষ্মী সরাই নারায়ণ প্রণাম করিয়া।
ব্রতীগণ ঘরে যাইন তাল যন্ত্র লইয়া ॥
সকল দেবদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া।
ব্রত সমাপন করইন জোকার ধ্বনি দিয়া।
সকল শ্রোতাকে বলি কর জোড় করিয়া।
ভুল ত্রুটি মাফ করিবেন অজ্ঞান জানিয়া।
সন্ধ্যা রানী বলে আমি বড় অভাজন।
নিজ গুণে কৃপা করো প্রভু নারায়ণ ॥

১২
ভজ মন, শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দরে
ওরে শচীর নন্দন গৌরা পতিত পবনরে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু বন্দি পতিত পাবন।
বন্দি প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমের মহাজনরে ॥
শ্রী অদ্বৈত্য প্রভু বন্দি অজ্ঞান নাশন।
কলি ঘোর অন্ধকার করিলা মোচনরে ॥
শ্রীনিবাস গদাধর বন্দি দুইজন।
পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চমুত্তি এই পঞ্চ জনরে ॥
শ্রীরূপ সনাতন লইনু স্মরণ।
ভট রঘুনাথ প্রভু চরণ বন্দন ॥
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অতিষ্ঠ পুরণ।
এই ছয় গোঁসাই বাস করে বৃন্দাবন।
দীন মধু বলে মোরে দেও শ্রীচরণরে ॥

১৩
আমায় কৃপা করে চরণতরী দেও গো জননী।
এগো সংগীত সাগর মাঝে সাঁতার নাহি জানি ॥
সংগীত রূপিনী তুমি দেবী বীণাপানি।
এগো শ্রীচরণ তরণী দিয়া তার গো তারিণী ॥
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কোলে বিরাজ আপনি।
এগো শ্বেতবর্ণা শুভ-কান্তি মরাল বাহিনী ॥
শ্বেত পদ্মসনে মাগো শ্বেত বস্ত্রখানি।
বিদ্যা স্বরূপিনী তুমি বাক্য প্রদায়িনী ॥
সাধন না জানি আমি ভজন না জানি।
নিজগুণে কৃপা করো পতিত পাবনী ॥

www.pathagar.com

মোর কণ্ঠ বীণাযন্ত্র বাজায়ে আপনি।
তার মাঝে গাও মাগো ছত্রিশ রাগিণী ॥
এসো মা ভারতী তব ভারতী না জানি।
মধুসুদন মাগে তব চরণ দুখানি ॥

১১. বিচ্ছেদ গান

বিচ্ছেদ গান বাংলা লোকগানের বিশাল অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। হাওরাঞ্চলের কর্মক্লান্ত মানুষ দিনমান পরিশ্রম শেষে যখন বাড়িতে ফেরেন, তখন অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন গানের আসরের আয়োজন করে থাকেন। এ আসরের মধ্যে বিচ্ছেদ গানের আয়োজনও থাকে। এসব গান শুনতে শুনতে হাওরের মানুষের অনেকেই ফেলে আসা প্রেমের স্মৃতি কিংবা সামান্য সময়ের জন্য প্রেমে পড়া মুহূর্তের স্মৃতিচারণা করে আকণ্ঠ বিচ্ছেদে নিমজ্জিত থাকেন। আসরে গায়কদের বিরহী সুর বিচ্ছেদপ্রিয় মানুষের বুকে তোলপাড় করা ঝড় ওঠে। হাওরে প্রচলিত এ ধরনের কিছু বিচ্ছেদ গান নিম্নরূপ :

১

কোনদিন পোহাইবেরে আমার দুঃখের রজনী
ফুলেতে সাজাইয়া শয্যা, ধারে বয় চোখের পানি ॥
রাত্রের প্রথম প্রহরে
দাঁড়াইয়া রহিলাম আমি, ঘরের দুয়ারে
প্রাণবন্ধু রইলে বাহিরে, কেউ দেখে ফেলে কি জানি ॥
দ্বিতীয় প্রহর যায়
তমালের ডালে বইয়া, ডাকে কোকিলায়
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বালায়, নিদারুন কুহু ধ্বনি ॥
রাত্রের তৃতীয় প্রহরে
হয়তো আসবে প্রাণবন্ধু, আমার বাসরে
ফুল চন্দন ছিটাইলাম ঘরে, হয়তো আসবে এখনি ॥
রাত্রের শেষ প্রহরে
আইসা ছিল প্রাণবন্ধু, আমার দুয়ারে
গিয়াস রইলে ঘুমো ঘোরে, হারাইলে পরশমণি ॥

২

তুমি কই যাও পরানের বন্ধু আমায় ছাড়িয়া
তুমি গেলে অভাগিনী যাব মরিয়া ॥
যেথায় যাবে মোরে নিবে সঙ্গে করিয়া
নইলে আমি প্রাণ ত্যাজিব গরল বিষ খাইয়া ॥
আমার নবযৌবন রাখছি তোমার সেবার লাগিয়া
মধুতে বিষ ঢেলে দিল কে বাদী হইয়া ॥
সোনার যৌবন রূপের কিরণ, যায় ভাটা দিয়া
কফিলউদ্দিন থাকবে সেবার দাসী হইয়া ॥

www.pathagar.com

৩

প্রাণসখিরে প্রেম জ্বালায় আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
বন্ধু বিনে বৃন্দাবনে কেমনে রই বাঁচিয়ারে ॥
আষাঢ় বরিষার পানিরে যায় বাড়ির পাছন দিয়া
আইল না আইল না রে আমার রসিক সুজন নাইয়ারে ॥
সাথী হারা পাখির মতোরে সখি ফিরতেছি উড়িয়া
আমার জোড়া নাইরে দেশে, দুঃখে ফাটে হিয়ারে ॥
কফিলউদ্দিন আর কত দিনেরে সখি থাকবে জ্বালা সইয়া
মনে লয় মোর প্রাণ ত্যাজিব বুকে ছুরি দিয়ারে ॥

৪

একবার কুঞ্জে আওরে বন্ধু একবার কুঞ্জে আও
তোমারে না দেখলে আমার জ্বলে পোড়া গাও ॥
আমায় ছেড়ে নিত্য নিত্য পরার ঘরে যাও
আমার চেয়ে কেবা শুনি কারবা বুক জুড়াও ॥
যার বাসরে ছিলে তুমি তার বাসরে যাও
বিরহীনি দীনদুঃখিনী আমায় না কাঁদাও ॥
কফিলউদ্দিন কয় শ্যামরসময় পরার মন জুড়াও
যে তোমারে ভালোবাসে তার আশা ফুরাও ॥

৫

প্রেমাগুণে জ্বলে পুড়ে গো সখি হইলাম ছাই
আমি করি বন্ধের আশা বন্ধের মনে নাই গো ॥
শ্যামকে পাইলে চিরশান্তি গো সখি আর কিছুই না চাই
দেখি এই বসন্তে প্রাণকান্তে পদে দেয়নি ঠাঁই গো ॥
প্রেমের আগুন জ্বলে দ্বিগুন গো সখি নিভাইবার সাধ্য নাই
এতদিনে বুঝলাম বন্ধের পিরিতের জ্বালা গো ॥
কফিলউদ্দিন এই চিরদিন গো সখি বন্ধের গুণ গাই
লিটনের পরশে আমি স্বর্গশান্তি পাই গো ॥

৬

নিশি গত হইল বন্ধু আইল না।
অভাগী রাই কার কাছে যাই, কেউ নাই আপনা গো ॥
বসি বসি পোহাই নিশি খুলিয়া জানালা,
বন্ধের গলে দিব বলে বিনা সুতার মালা গো সখি বিনা সুতার মালা।
কী সুখে শ্যাম চিকন কালা আইল না ॥
ছিল আশা খেলব পাশা, বসিয়া নিরলে,
পবিত্র চরণ ধুয়াইব নয়নের জলে গো সখি নয়নের জলে।
দুঃখিনীর পোড়া কপালে জুটল না ॥
ফকির সমছুল ছাড়িল কুল, কোল পাইবার আশে,

www.pathagar.com

ফুলের মধু গেল শুধু শুকাইয়া বাতাসে গো সখি শুকাইয়া বাতাসে।
ঘরে বসে দিন যায় না রাত পোহায় না ॥

৭
আমি যারে ভালোবাসি তারে যদি নাহি পাই
কারে দেখি তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥
প্রাণনাথ বন্ধুয়ার সনে, প্রেম করেছিলাম গোপনে
আমি জানি বন্ধে জানে, কী কইয়া কী করল তাই ॥
পিরিতকালে বলেছিলে, ভুলবে না জীবনে
কী দোষে ছাড়িয়া গেল, কুল মানে দিল ছাই ॥
বলে ফকির সমছুলে, কুল ছেড়ে ভাসলাম অকূলে
মরণকালে চরণতলে আমারেনি দিবে ঠাঁই ॥

৮
আমার মনের দুঃখ গো বুঝিব কে বন্ধু বিহনে।
দুঃখে গড়া জীবন আমার বুকভরা প্রেম আগুনে ॥
চিন্তারোগে হইয়া রোগী, দিন-রজনী কষ্টে ভোগী গো।
হইয়াছি কলংকের ভাগী ছাই দিয়া কুলও মানে ॥
পথের সম্বল যাহা ছিল, পরে পরে সবই নিল গো।
সখি আমার উপায় বলো কী করিব কেমনে ॥
কয় উদাসী মকদ্দসে, ইন্দ্রিয় ময়লিন হইয়াছে গো।
পরম আয়ু ফুরাইয়াছে পাখি যাবে কোন বনে ॥

৯
মায়া লাগাইয়া রে
যাইও নারে প্রাণের বন্ধু বুকে ছেল মারি ॥
অল্প বয়সে ভালোবেসেরে হাতে হাতে ধরি।
নয়নের বানে চাইতে লাগল প্রেমের ডুরি ॥
ঘৃণা যদি লাগেরে বন্ধু দাওরে প্রেমের ছুরি।
বুকেতে লাগাইয়া মোর কলিজা বাহির করি ॥
দুঃখের বিনিময়রে বন্ধু দাওরে বিষের বড়ি।
তোমার হাতের বিষ খাইয়া, এ মকদ্দস মরি ॥

১০
কথা দিয়া আইলে নারে
ওরে বন্ধু কালার চান
হলো আমার নিশি অবসান ॥
জ্বালাইয়া মোমের বাতি
ধুপ আর লোবান
কার লাগিয়া ফুলের বাসর

www.pathagar.com

গোলাপ আতরের ঘ্রাণ ॥
যৌবন রসে টলমল
কারে করি দান
আর কত সহিব বেদন
বাঁচে না মোর প্রাণ ॥
পতিবিনা সতী নারীর
কিসের শান আর মান
মকদ্দস উদাসী হইয়া
গাই দুঃখের গান ॥

১১
আমারে কান্দাইয়া বন্ধুরে
কী সুখ পাইলায় মনে
হাতে ধরি প্রেম শিখাইলায়
বসিয়া গোপনে বন্ধুরে ॥
সরলে গরল মিশাইয়ারে বন্ধু
থাকো অভিমানে
ডাকিলে কথা শোনো না
মন বানলে পাষাণে বন্ধুরে ॥
প্রেম না-করে ছিলাম ভালারে বন্ধু
থাকিতাম সুমনে
তোর সনে পিরিত করিয়া
ধরল আমায় ঘুণে বন্ধুরে ॥
কী করিয়া কী করিলেরে বন্ধু
এই ছিল তোর মনে
মকদ্দস উদাসী হইয়া
চলে যাবে বনে বন্ধুরে ॥

১২
আমি শ্যামের কলঙ্কিনী রাই গো
কই গেলে বন্ধুরে আমি পাই ॥
পাইতাম যদি শ্যামকালারে বুকে দিতাম ঠাঁই
বুকেতে বুক মিশাইয়া পোড়া প্রাণ জুড়াই গো ॥
বন্ধুর তাল্লাসে বল কোনবা দেশে যাই
মনে লয় যোগিনী হইয়া নগর বেড়াই গো ॥
পাইলে তার রাঙা চরণ কোলে দিতাম ছাই
মাথার চুলে পা মুছিব যদি দেখা পাই গো ॥
মকদ্দস উদাসী হইয়া আমিত্ব বিলাই
গেল কইয়া আর এল না নাগর কানাই গো ॥

www.pathagar.com

১৩
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে
কার কুঞ্জে রইল বন্ধু না জানি কোন দেশে ॥
সুখে কিংবা দুঃখে থাকো ধরো কোন বা বেশ
সুখে থাকো এই কামনা চাই না সুখের লেশ
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে ॥
তুমি আমার জীবন যৌবন তুমি মাথার কেশ
শূন্যে গৃহে থাকার চেয়েও মরণ আমার বেশ
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে ॥
নির্দয়া হইয়া প্রাণবন্ধুর মারলাম সাপের ন্যাছ
আলম শাহরে প্রেমের বিষে সর্ব অঙ্গ শেষ
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে ॥

১৪
কলিজায় আমায় তীর মাইরাছে
বিষে ভরা ভূজঙ্গ তীরের মুখে রইয়াছে ॥
দেহ আমার ঝর ঝর বিষে অঙ্গ ভইরাছে
কলিজা হইল আমার পানি ঔষুধে না ধইরাছে
কলিজায় আমার তীর মাইরাছে
ডাক্তার কবিরাজ ধরতে পারে না কি রোগ হইয়াছে
যেমন ইটের ভাটায় দিয়া কয়লা আগুন লাগাইছে ॥
এই তীর পিরিতে তীর নয়ন বান দিয়াছে
পিরিতের ঔষুধ বন্ধুর কাছে পাইলে আলম শাহ প্রাণে বাঁচে
কলিজায় আমার তীর ধইরাছে ॥

১২. মালসি গান

মালসি গান পূজার সময় নারীরা গেয়ে থাকেন। দুর্গা পূজার সময় দুর্গা দেবীকে বন্দনা করে, কালী পূজার সময় কালী দেবীকে বন্দনা করে এসব গান পরিবেশন করা হয়। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে এখনও বর্ণিল আয়োজনে মালসি গান গ্রামীণ নারীরা পরিবেশন করে থাকেন। এ-রকম কিছু মালসি গান নিম্নরূপ :

১
মাগো আমার এই বাসনা বাউল
হৃদ কমলে রেখে তোমা করি যেন উপাসনা।
দাও কত ধন, যার যে মনন,
করো কত তুমি দুর্গতি নাশন,
অভয় করো দান, যশ, জয়, মান
কত দাও কিন্তু আমি চাহি না ॥
বিপদে পড়িলে, তোমাকে ডাকিলে

www.pathagar.com

বিপদ দূর করো তুমি অবহেলে।
তারে তুমি রক্ষ, তাতে তুমি দক্ষ।
তোমার কাছে এসব করি না প্রার্থনা ॥
কাশীনাথ চাহে, শ্যামা মাগো ওহে।
যেন কোন সন্দেহে তোমাকে।
চাহি আমি বর, মোরে কৃপা করো।
পাইতে যশোদার কেলে সোনা ॥

২
মা, মা, তোমার নাই সীমানা।
তুমি কত লীলা করো, জিহ্বাতে কামড়
হাতে অসি ধরো দিক বাসনা ॥
স্বামীকে পদেতে, অসুর নাশিতে।
কত যে করো নাই ধারণা ॥
কত অভাজনে, তাদের ভজনে।
তাদের কথা শুনে পর ভাবনা ॥
তুমি মা তারিণী জগত জননী।
বিপদ নাশিনী কারও বিপদ রাখো না ॥
মেঘারকান্দিবাসী, কহে দাশ কাশী।
দয়া করে আসি, পুরাও বাসনা।
সারা জীবন ভরা, তোমাকে মা তারা।
সদা পূজিব আর ভুলব না ॥

৩
আজি মা গিরি নন্দিনী ॥
বহুরূপে লীলা করো, তব নাম করি বাখানি ॥
হরের ঘরনী, জগত জননী।
অসুর নাশিনী, মহিষ দলনী ॥
ভদ্রা কালী শ্যামা তারিণী।
তুমি মা পতিত পাবনী ॥
তুমি ভবানী, দুর্গতি নাশিনী।
চণ্ডী, দুর্গা আর শিবানী।
রণ বিজয়িনী, প্রসন্ন দায়িনী।
আছে কোন প্রাণি বলিবে না মানি।
দেবদেবীর শিরোমণি ॥
কাশীনাথের বাণী, শোনো মা জননী।
তুমি মা বিশ্ব পালিনী।
দিক বাসনা ধন দায়িনী,
কৃপা করো মা মুণ্ডু মালিনী।

www.pathagar.com

৪
কৃপা করো মা শংকরী।
লক্ষ লক্ষ জবা দিব অঞ্জলি ভরি ॥
কৃপা না করিলে তারা, আমি হবো লক্ষ্মী ছাড়া।
তব মাঝে পড়ে শুধু খাব আমি গড়াগড়ি ॥
তুমি তো সকলের মাতা, পূজে তোমা সব দেবতা।
দীনহীনের নাই অন্যথা, তোমায় ডাকি বদন ভরি ॥
কাশীনাথ বলে ভেবে,
কি দিয়া তোমাকে সেবে,
শুধু অশ্রু বারি দিবে,
ত্বরায়ে দেও ভব বারি ॥

৫
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করো সন্তান তব আর,
আশির্বাদের বর্ণ পড়াও ঘুচায়ে অন্ধকার ॥
তুমি মা জননী, হরের ঘরনী।
তুমি জগতের সার
অসুর নাশিনী, মহিষ দলনী।
তুমিই পরাৎপার ॥
তব পূজা করি, অযোধ্যার হরি,
বধিল রাবণ আর।
কাশীনাথের বাণী, ওহে কাত্যায়নী,
পদ শিরে দাও তার ॥

৬
ওগো মা জননী তারা।
বৃথা কাজে ঘুরে ঘুরে হইলাম জীবন মরা ॥
কাম ক্রোধ মোহ লোভে মজিলাম এই ভবে
আত্মজ্ঞান হইল না মা, হইলাম আত্মহারা
ত্রিতাপ জ্বালা গেল না মা, পড়েছি চৌরাশির ফেরে
অজ্ঞান দূর হলো না মা, দিল না মোর প্রাণে সাড়া ॥
কাশীনাথের এই বাণী দয়া করো মা তারিণী।
হৃদে সদা বিরাজ করো, থাকি না তোমাকে ছাড়া ॥

৭
মা মা বলে আর ডাকব না।
হয়ে উলঙ্গিনী খর্গ ধারিণী
হয়ে পাগলিনী স্বামী মানি নি,
উগ্রমূর্তি ধরো, পশু বধ করো
মা বলে আর তোমা ভাবব না।

www.pathagar.com

তুমি দয়া মায়াহীন, আমা ভাবো ভিন
গত হলো দিন, ডাকিলে শোনো না ॥
হয়েছ মা কালা একি তব লীলা
মা হয়ে সন্তানের দরদ বুঝো না ॥
বলে কাশীনাথ করো দৃষ্টিপাত
কাম ক্রোধাদি করো হে নিপাত
তা হলে ডাকিব মনেতে বুঝিব
পুত্র বলে আর পর ভাবনা।

৮
ওগো তারা মা জননী।
দিবানিশি কাঁদি আমি, কৃপা করো মা এখনি ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে
আছে মা তোর বাখানি,
সত্য দশ ভূজা রূপে
হইলায় মহিষ মর্দ্দিনী ॥
ত্রেতাতে শ্রীরামচন্দ্র
পূজে মা পদ দুখানি,
রাবণ বধি রঘুপতি,
আনিলা জনক নন্দিনী ॥
দ্বাপরেতে গোপীগণে,
কৃপা করো কাত্যায়নী
পতিরূপে কৃষ্ণ পেয়ে
তারা হলো আনন্দিনী ॥
কাশীনাথ হয়েছে মা
মনি ছাড়া যথা ফণি,
কুমাতা হইও না মা
কোলে নেও পুত্র জানি ॥

৯
মাগো আসো এই আসরে ॥
অধীন সন্তান তোমায় ডাকে মা অতি কাতরে ॥
আমি অতি হীনজন,
না জানি সাধন ভজন,
ভক্তি ভরে ডাকি এখন, আসো তুমি দয়া করে ॥
শ্রদ্ধাঞ্জলি পুষ্প দিব,
হৃদ কমলে আসন দিব,
কোটি কোটি ভক্তি দিব, কৃপা করো অধমে রে ॥
নাহি মোর টাকা কড়ি,

www.pathagar.com

আমি অতি দীনভিখারি
শুধু হাতে কি দিব মা, দিব হৃদয় শূন্য করে ॥
দীন কাশীনাথ বলে,
সিক্ত করো অশ্রু জলে,
পাষাণ মন যেন গলে সদা থাকি তোমা স্মরে ॥

১০
বন্দি তোমা মা জননী।
কি দিয়ে পূজিব মাগো তব চরণ দুইখানি ॥
অধীনের নাহি সম্বল,
শুধু আছে অশ্রুজল,
তাহাও শুকাইয়া গেল কি দিব তোমা এখনি ॥
তিল বেল তুলসি পাতা
পদে দিব তোমা মাতা,
কৃপা করে যদি না লও ত্যাজিব জীবনখানি ॥
দিব পুষ্প শতদল,
লক্ষ লক্ষ জবা দল
ধান্য দুর্বা ফল দিব, দীপ, দুগ্ধ আর জ্বালানি ॥
যুগল পদ ধরি শিরে,
বলি মা তোমা কাতরে,
কাশীনাথের ওই বাসনা দয়া করো কাত্যায়নী ॥

১১
বন্দি শ্রীগুরু চরণ
আগে বন্দি গণপতি পার্বতী নন্দন ॥
ব্রহ্মা বন্দি বিষ্ণু বন্দি, বন্দি ত্রিলোচন
গঙ্গা দুর্গার পদ করি মস্তকে ধারণ ॥
চন্দ্র বন্দি সূর্য বন্দি অনল পবন
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি দেব নারীগণ ॥
স্বর্গ মর্ত রসাতল বন্দি ত্রিভুবন
মধু বলে শিরে বন্দি শ্রীগুরুর চরণ ॥

১২
মায়ের শুভ আগমন
রণ ডঙ্কা বাদ্য শুনি কাঁপে দৈত্যগণ ॥
দশ হস্তে নান অস্ত্র করিয়া ধারণ
সিংহ পৃষ্ঠে আরোহন অসুর দলন ॥
রণবেশে মুক্তকেশী দিলা দরশন
কার্তিক গণপতি সঙ্গে দেব পঞ্চানন ॥

www.pathagar.com

মধু বলে রূপ দেখি জুড়াল নয়ন
চারিদিকে জয়ধ্বনি দিলা নারীগণ ॥

১৩
কালীঘাটে কালী তুমি মাগো কৈলাসেতে উমা
কাশীধামে অন্নপূর্ণা, বৈকুণ্ঠেতে রমা গো ব্রহ্মময়ী ॥
বৃন্দাবনে রাধা তুমি মাগো গোকুলে গোপিনী
কৃষ্ণভক্তি দিতে নাম ধরো কাত্যায়নী গো মা ব্রহ্মময়ী ॥
কত লীলা করো তুমি মাগো জগত জননী
মধুসূদন দাসে মাগে রাঙা চরণ দুখানি গো মা ব্রহ্মময়ী ॥

১৪
দুর্গা পূজার সময় হইল, শঙ্খ ঘন্টা বেজে উঠল
বাদ্যধ্বনি করিলা ব্রাহ্মণে গো মা দয়াময়ী।
উজানী নগরে বাড়ি, জবা লাগাই সারি সারি
দিব তোমার ওই রাঙা চরণে গো মা দয়াময়ী ॥
বিল্বদল জবা ফুলে, দুর্বাদল তিলে চাউলে
রক্তচন্দন মিশাইয়া তায় গো মা দয়াময়ী ॥
মধুসূদন মূঢ়মতি, না জানি ভজন স্তুতি
পদছায়া দেও মা আমায় গো মা দয়াময়ী ॥

১৫
চণ্ডীপাঠ শেষ হইল পূজা সমাধান
তার শেষে মায়ের আগে লক্ষ বলিদান ॥
মেষ মহিষ ছাগ বলি হংস কবুতর
নানা জাতি বলি পশু পক্ষী দিলা যে বিস্তর ॥
এই বলি নহে মাগে বলি আছে আরও
যে বলি তোমারে দিলে জীবের উদ্ধার ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এই অসুরগণ
তোমার চরণে বলি দিল যেই জন ॥
সেইজন ভক্ত মাগো তব পদ পায়
মদুসূদন বলে মাগো রাখো রাঙা পায় ॥

১৬
এলোকেশী হাতে অসি অসুর কাটে ধাইয়া
রণবেশে সাজিয়াছে কার মাইয়া ॥
লক্‌লক্ লাল জিহ্বা উলঙ্গিনী হইয়া
দাঁড়ায়াছে পতি বক্ষে রাঙা চরণ থুইয়া ॥
খলখল হাসে, গলে মুণ্ডুমালা দিয়া
ডাকিনী যোগিনী নাচে রুধির পান করিয়া ॥

www.pathagar.com

জগত জননী নাচে উলঙ্গিনী হইয়া
মধু বলে দেও মা চরণ শান্ত মূর্তি হইয়া ॥

১৭
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, আরো বাজে মন্দিরা
স্বর্ণথালে ভোগ সাজে চিনি সন্দেশ শর্করা ॥
আম কাঁঠাল কলা কয়ফল দাড়িম্ব সমতারা
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু তার সাথে খৈ চিড়া ॥
লুচি পুরি পরমান্ন জোড়া বরফি জাম পেড়া
রাজভোগ লাগিছে মায়ের কে দেখিবি আয় তোরা ॥
মধু বলে মায়ের প্রসাদ পাবে যত ভক্তেরা
দীনজনে করো দয়াময়ী জয়তারা ॥

১৩. গাজির গীত

সুনামগঞ্জে লোকসংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে গাজির গীত। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর আগে গাজির গীতের ব্যাপক প্রচলন এ অঞ্চলে ছিল। এখন কালেভদ্রে গাজির গীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নানা পেশায় নিজেদের মনোনিবেশ করে ফেলায় গানের সমৃদ্ধ এ ধারাটা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে ঠেকেছে। নৃত্যসহযোগে এ গান পরিবেশিত হয়। গাজির গান নিয়ে নানা ধরনের পালাও রচিত হয়েছে। গাজির গীত মূলত মুসলমানেরা পরিবেশন করতেন, তবে হিন্দু বাড়িতেও এসব গান পরিবেশনের প্রবেশাধিকার ছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছিল গাজির গানে। এ কারণে অনেকটা অসাম্প্রদায়িক এ ধারাটির একটা আলাদা মূল্যও ছিল সমাজ-সংস্কৃতিতে। কিছু সংগৃহীত গাজির গীত নিম্নরূপ :

১
ও নাতিন কামাই করলে জামাই পাইবায় ভালা
২
ধমধমাইয়া হাটে নারী চউখ পাকাইয়া চায়।
৩
নন্দঘোষে যা, কালু ঘোষের ঝি
কাইন্দা কাইটা ঘর ভাসাইল
গাজি বলবে কি?
৪
আল্লা আল্লা বলো ভাইরে হরি হরি বলো
ভেদ ভাও ছাড়ি ভাইসব একই পথে চল।

১৪. দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব

দেহতত্ত্ব ও নিগূরতত্ত্ব সাধারণত বাউল গানের পর্যায়ভুক্ত হলেও অধিকাংশ গীতিকারেরা রয়েছেন যাঁদের কেবল দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্বকেন্দ্রিক গানই কেবল রচনা করেছেন। এর ফলে এসব গানও বাংলা লোকগানকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এ ধারার গান রচনাকারী

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার সাকিতপুর গ্রামের আবদুন নুর মাস্টার (১৯৩৭-১৯৯৭), জগন্নাথপুর উপজেলার বাসিন্দা আবদুস সাত্তার, দিরাই পৌরসভার মজলিশপুর এলাকার বাসিন্দা বশিরউদ্দিন সরকার (১৯৬৪), সাকিতপুর গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম রানার (১৯৭৫) লেখা কিছু সংগৃহীত দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব গান নিম্নরূপ :

১

আঁধার পথে চলা, কঠিন আলো ছাড়া উপায় নাই
কি দিয়া মোর আঁধার ঘরে জ্ঞান বাতি জ্বালাই ॥
অন্তরে মোর ময়লা জমে আলোর পথ করছে বন্ধ
তালা লাগছে নাকের রাস্তায় পাই না ফুলের সুগন্ধ
তাইতো সদায় মনের দ্বন্দ, চলার পথে খুঁজে না পাই ॥
ঘষামাজা জানি না আমি কেমনে করব পরিষ্কার
কবিরাজ খুঁজে পাই না দূর করতে মনের বিকার
চলার পথে সবই আঁধার কেমন করে রক্ষা পাই ॥
থাকো যদি দরদী মোর বলে দাও সু-রাস্তা
অন্ধকারকে দূর করিতে করব আমি ব্যবস্থা
হারাই ফেলেছি আস্থা কত কষ্টে দিন কাটাই ॥
অগতিয়ার গতি তুমি ওহে প্রভু মালিক সাঁই
পড়িয়াছি ঘোর সংকটে তোমার কাছে পানা চাই
এ নুরের নাই পূণ্যের কামাই দিতেছি তোমার দোহাই ॥

২

ঘরের মানুষ ঘরে থৈয়া বাইরে করো দৌড়াদৌড়ি
ঘর ছাড়িবে ঘরের মানুষ তোমারে দোষী করি ॥
তারে তুই করলে না যতন, কুসঙ্গীর সাথে সদা কাটাইলে জীবন
হারাইলে আমানতের ধন মজিয়া মদন বেপারি ॥
মোহে পড়ে হইলে কানা, বাকি তোর মহাজন সব লেনাদেনা
কেন তুই হইলে দেওয়ানা, হারাইয়া গাইটের কড়ি ॥
রূপগঞ্জের বাজারে সস্তায় বিকাইলে মাল
দেশে যাওয়ার আগে তুই সাজিলে কাঙাল
আর তোমার হবে না সকাল পিন্দেছো মায়ার বেরী ॥
সময়ে তুই চিনলে না রতন, অসময়ে হায় হায় কে বুঝাবে বেদন
এ নুরের লক্ষ্যহীন জীবন, করে ভুতের বেগারী ॥

৩

নাচো কেন মাটির পুতুল
রঙ দেখিয়া পাগল হইয়া চলার পথে করতেছ ভুল ॥
সময় তোমার অতি সামান্য, বাছাই করে করে পণ্য
নীতি বিধান করে মান্য, সাগর সেচে মুক্তা তোল ॥
পাইছো তুমি দুই দিনের জিন্দেগী, করো না কেন তার বন্দেগী

www.pathagar.com

একদিন চোখে লাগবে আন্দি, দিতে হবে ভুলের মাশুল ॥
ছেড়ে দিয়া লোভ লালসা, এক ধিয়ানে করো বন্ধের আশা
মিটবে তোমার মান পিপাসা, গলে বাঁধো নামের ফুল ॥
পরীক্ষাতে হলে পাস, মিলবে তোমার ভালো নিবাস
এ নুরের মনের আশ, দয়ানি করিবেন রাসুল ॥

৪
মন পবনের নাইয়া চলছো তুমি অজানার পথে
কর ছল্লা পাইয়া ॥
অচিনা অজানা জলে সবসময় সাঁতার
অনন্ত অসীম সাগর নাই তার কিনার
সাহস কেমনে হলো তোমার যাবে তরী বাইয়া ॥
তোমায় নিয়া গর্ব করি, আমি সবার কাছে
তুমি সাবধানে চালাইও তরী, যেমনে জীবন বাঁচে
বুঝবার তোমার শক্তি আছে কাজ করিও ভাবিয়া ॥
তুমি কি পাইয়াছো কোন কাণ্ডারীর আশ্বাস
কোন নামেতে বাইছো তরী করিয়া বিশ্বাস
কঠিন জায়গা এই প্রবাস, যাইও না ভুলিয়া ॥
তোমার কর্ম দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার
হয়তো তুমি ভরসা করছো দয়াল বন্ধুয়ার
আবদুন নুর গোনাগারকে নিবায় পার করাইয়া ॥

৫
মাঝিরে প্রাণ কাঁপে তরাশে
এসে পরবাসে ॥
মাঝিরে, ভবসিন্ধুর লম্বা পাড়ি, আর আমার জীর্ণ তরী
দরদী কেউ নাই আমার পাশে।
অচিনা অজানা পথে, পারবো কি মুই পাড়ি দিতে
ঘুরি পাগল বেশে ॥
মাঝিরে, রঙ-বাজারে টগের কারবার, লাভ করাতো দূরের ব্যাপার
গাইটের ধন শেষ হবে নিমিষে।
বাজারের বাও বুঝি না, মাটি দিয়া নেয় সোনা
মিছা ভালোবাসে ॥
মাঝিরে, মহাজনের চালান নাই, কি দিয়া মহাজন বুঝাই
কোথায় যাই এই অচিন দেশে।
দরদী নাই এ সংসারে, ঠেকছি আমি পরপারে
নিজের কর্ম দোষে ॥
মাঝিরে, শুনছি বন্ধু বড় দয়াল, আমি তার দয়ারই কাঙাল
পৌঁছাইয়া দেও তাহার পাশে।

www.pathagar.com

কাতরে নুর করবে প্রার্থনা, হয়তো বন্ধু করবে মার্জনা
আছি আশার আশে ॥

৬
বানাইয়া খেলাঘর গঠন দিল কি সুন্দর
পাঠাইল মনোহর খেলতে রঙ্গ খেলা
বন্ধু আমার রসের রঙিলা ॥
অচেতন ছিল হঠাৎ ঘুম ভাঙিল
প্রেমখেলা খেলাইতে বন্ধে মনে ভাবিলা
খেলতে প্রেম খেলা লাগে একজন রঙিলা
সময় বুঝিয়া এক ঝঙ্কার মারিলা ॥
কোন শব্দে করলো সৃজন, বানাইয়া আপন একজন
করিয়া মনের মতন, চৌদ্দ ভুবন গড়িলা
অচেতনকে করে চেতন, তাতে দান করল জীবন
খেলতে খেলা মনের মতন ভবে পাঠাইলা ॥
আঠারো হাজার মখলুকাতে, খেলতে আছে এই জগতে
আছে সবার সাথে সাথে কেউ না দেখিলা
খেলতে যার হবে ভুল সে লবে ভুলের মাশুল
তাইতো খেলায় কানুন বানাইলা ॥
বুঝি না তার বারণ কারণ, কিসে তারে করব বরণ
সাথী হইয়া সে জন কোথায় লুকাইলা
এ নুর কয় মন পাগেলা দেখে ভবের ঝামেলা
নাম সম্বলে বেঁধে লও ভেলা ॥

৭
জ্ঞান শিখিয়া করো জ্ঞানের সাধনা
জ্ঞান বাতি জ্বলিলে ঘরে দেখবে তুমি রূপের আয়না ॥
সাধনায় হয় শুদ্ধ অন্তর, জানা যায় সৃষ্টির খবর
কি আছে ব্রমাণ্ডের ভিতর পরে লিখে রচনা
লিখা হইছে বিশ্ব বিজ্ঞান, সকলই কলমের দান
কালির লিখা আল্লাহর কোরান, পড়ে তুমি দেখো না ॥
সাধনপুরে পেয়ে সাজা, যারা পাইছে সাধনের মজা
তাদের অন্তর সদায় তাজা, মোহ মায়ায় মজে না
ষড়রিপু করে বাধ্য, অসাধ্যকে করে সাধ্য
নাম করে মনের খাদ্য, ছাড়ে কু-ভাবনা ॥
সময়ের নাই নিশ্চয়তা, কোনদিন কারে ডাকবে বিধাতা
মান্য করে গুরুর কথা, সমানে কাজ করো না
জিন্দা থাকলে কলব রাহু, জপবে সদা আল্লাহু আল্লাহু
ঘুমে রইল নুরের রুহু এখনো সে জাগলো না ॥

www.pathagar.com

৮
কোন সাহসে ছাড়ব তরী অবাধ্য মাঝি মাল্লা
ভয়েতে প্রাণ কেঁপে উঠে দেখিয়া দূরের পাল্লা ॥
এতে আমার জীর্ণ তরী আর তো দূরের পাড়ি
ভয় করি নাই কোন উছিল্লা, আমার সঙ্গের সাথী সব অভাজন
তাদের প্রতিনিধি পাগলা মদন, আমার কথা শুনে না কখন, উল্টা করে চল্লা ॥
সহায় ছাড়া কেমনে তরী বাই, এই দেশে মোর দরদী নাই
গোসাই আমার না করিলে হিল্লা, দিনরাত্র ঘরে ভেজাল
একে তুলে অন্যের কাল, কে ধরবে হাল বেদ করতে ঘুমে মাঝি-মাল্লা ॥
আপন ঘরে প্রতিবাদী এই কথা কারে ফরিয়াদি, নিরবধি খেলাতে খাই গোল্লা
পারি না নিজেকে সামলাইয়া, গেছে নুর দুর্বল হইয়া
পাই না খুঁজিয়া ওই রোগের মোল্লা ॥

৯
কোন সন্ধানে গড়ল মানবতরী
লক্ষকোটি রূপ দিয়া বানাইয়াছে মেস্তরী ॥
অচেতন ছিলেন নিরাঞ্জন, না ছিল আসমান জমিন, না ছিল ভুবন
শুয়ে শুয়ে দেখে স্বপন জাগে মাসুক রূপ নেহারি ॥
মাসুক বানায় হইয়া আসিক, প্রেম খেলা খেলিতে জেগে উঠিল রসিক
তার কর্ম সবই সঠিক বানাইল মায়া করি ॥
ওই তরীর সে নিজে কর্ণধার, তরী জলে স্থলে সমান চলে ছয়জন ভাগীদার
তরী দেখতে লাগে বাহার আজব তার কারিগরি ॥
পঞ্চ ধাতুতে বানাইয়া তরী, মধ্যে বসাইয়া দিছে হাওয়ার এক ঘড়ি
আবদুন নুর গায় তাহার সারি পাইতে কৃপা বারি ॥

১০
আমার ঘরে আইলে পাখি পরিয়া তুই কোন মায়ায়
আদর যত্ন করতে পারলাম না মনে দুঃখ না নিবায় ॥
শুনছি আমি প্রভুর হুকুমে এসেছো আমার বাড়ি
মনে প্রাণে আমি তোমার করলাম না তাবেদারী
গোপন আছে দেখতে না পারি তাই আমি পরছি ধাঁধায় ॥
দেখাশুনা হইত যদি করতাম আমি জিজ্ঞাসন
আমার ঘরে আইছো যখন আমি তোমায় কই আপন
মিটল না মোর মনের আস্বাদন রইয়া গেলায় অচিনায় ॥
মহামহিম প্রভুর হুকুমে তুমি আইছো যখন গরিবালয়
আমার হইয়া প্রভুর কাছে আমার জন্য চাও অভয়
দয়া করতা দয়াময় তুমি মেহমানের উছিল্লায় ॥
দুঃখ কষ্ট যাহা পাইছ আমার বাড়ি আসিয়া
মাফ করিও ভুল ত্রুটি আমাকে অধম জানিয়া
আবদুন নুরের সালাম কইও গিয়া আমার মুনিবের রাঙা পায় ॥

www.pathagar.com

১১
ও সোনার ময়নারে আমি শুনলাম না তোর চাঁদ মুখের বুলি
নিয়ম বিধান মতো তুমি একদিন যাবে চলি ॥
আমি তোমায় দেখার জন্য করি ডাকাডাকি
উত্তর পাই না কথা কও না, চুপচাপ দিছ লুকি
তোমায় পাইয়া হইছলাম সুখী তুমি আমার বলি ॥
শুনতাম যদি তোমার কথা জুড়াইত তাপিত প্রাণ
মনে প্রাণে আমি তোমায় করিতাম সম্মান
তুমি আমার আদরের মেহমান, রঙিন ফুলের কলি ॥
তুমি যেদিন আমায় ছেড়ে হইয়া যাইবে বিদায়
সেই দিন আমার জন্য কাঁদবে বাপ-মায়
আবদুন নুর হইয়া অসহায় গায়ে মাখবে ধুলি ॥

১২
মায়া করে সোনার ময়না রইছো মাটির পিঞ্জিরায়
যাওয়ার বেলা কইয়া যাইও যাইতেছ তুমি কোন জায়গায় ॥
তুমি পাখি না আসিলে আমার না হইত চেতন
আমার কি ভাগ্যে জুটত দেখতে এই রঙিন ভুবন
হইয়া যখন আইলে আপন কেন মোরে ছাড়িবায় ॥
মূল মহাজনে বানাইয়া মাটির এই কারখানা
তোমারে চালক বানাই করছে তোমার দ্বারা চালনা
তুমি কি কইতে পারো না কতদিন মোরে চালাইবায় ॥
তুমি যখন আমার হইয়া চালাইতেছ কাজ কারবার
আমার জন্য কিছু করো মায়া পাইতে বন্ধুয়ার
যে দিন প্রভু করবে বিচার সেদিন তুমি কই রইবায় ॥
আমি একটা মাটির ঢেলা তুমি মোর গাড়ির চালক
ভুলের জন্য কারে দায়ী করবেন মোর প্রতিপালক
আবদুন নুর সেদিন হবে উল্লুক তুমি সব জবাব দিবায় ॥

১৩
মাটির গড়া মানুষ আমি দিও মাটিতে মিশাইয়া
চুপচাপ পড়ে থাকব জাতের সাথে মিলিয়া ॥
শুনিয়া দোজখের কথা প্রাণে নাই মোর সান্তনা
চেতন যদি থাকে আমার করিবায় কত জিজ্ঞাসনা
আমি কিছু উত্তর দিতে পারব না তোমার সামনে দাঁড়াইয়া ॥
রাজাধিরাজ বিশ্বপতি তুমি সর্বশক্তিমান
অপরাধী আছি আমি ভয়ে সদা কম্পমান
তোমার কাছে চাই আছান দয়া পাইবার লাগিয়া ॥

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি কেমনে যাই তোমার সামনে
নাম শুনিয়া কম্পন সদা উঠতেছে আমার মনে
আবনুন নুরকে কৃপা বলে দিবায় মাফ করিয়া ॥

১৪
উথাল পাথাল ঢেউয়ের সাথে নাও বাইও না সদাগর
তলাইয়া যাবে তোমার নৌকা হইবে তুই কাতর ॥
অনুরাগের বাতাস পাইলে নৌকা দিও ছাড়ি
পাছায় বইয়া গাইও তুমি দয়াল নামের সারি
ঠিক রাখিও নায়ের দাঁড়ি, থাকিও না বে-খবর ॥
কত সাধুর ভরা তলাই গেছে ওই না সমুদ্দুরে
কতজনকে গ্রাস করেছে কাম নদীর কুম্ভীরে
না বুঝিয়া যে নৌকা ছাড়ে ফিরে না আর ঘর ॥
বিশ্বাসের মাস্তুল তুলিও ঈমানে ঝাণ্ডা ধরি
মন পবনের নৌকায় নিও বিশস্ত সব দাঁড়ি
ভক্তির বাদাম তুলে নৌকায় দমের জিকির পড় ॥
সর্বকাজে মিল থাকিলে সহজ হবে পাড়ি
গুরুজিকে বানাইও তোমার নায়ের কাণ্ডারি
আবদুন নুর বইবে মাস্তুল ধরি কৃপা করতেন গুণধর ॥

১৫
ও মানুষ ভাবলে নারে আইছ কোন শহরে
মাল মাত্তা লুটিবে তোমার রসের বাজিগর ॥
তোমার সঙ্গের সাথী যারা শয়তানের অনুচর
দিন রাত্র দেয় তারা তোমার গোপন খবর ॥
থাকা খাওয়া তোমার ঘরে তোমায় ভাবে পর
তারারে বশ করে রাখছে আজব জাদুগর ॥
গুরু ধরে এই সব ভুতের রাস্তা বন্ধ করো
বীজমন্ত্র শিখে তুমি ভাব জাদুর ঘর ॥
দীন বন্ধুর দয়া ছাড়া উপায় নাইরে তর
আবদুন নুর কয় নাম স্মরণে মরার আগে মর ॥

১৬
হাওয়া ছেড়ে ঘুরে ফিরে হাওয়া কভু দেখি নাই
অনুভূতি আছে শুধু ধরার কৌশল নাই পাই ॥
শ্বাস আর প্রশ্বাসের মধ্যে আমাদের জীবনী
শেষ নিঃশ্বাস চলিয়া গেলে শেষ হয় সব কাহিনি
চির নিদ্রায় যাদুমণি ডাকে না মা আর ভাই ॥
পলকেতে এই বায়ু ঘুরে দেশ-দেশান্তর
থাকিয়া তোমার সাথে লইতেছে বিশ্বের খবর

www.pathagar.com

সময়ে ঠিক করো অন্তর ছাড়িয়া ভবের বড়াই ॥
গৌছ কুতুব পির ওলিগণ করিয়া বহু সন্ধান
এই বায়ুর সাথে তারা করছিল সাধন প্রধান
লভ্য করে মহাজ্ঞান ভাব সাগরে খেলছে লাই ॥
সময়েতে গুরু ধরে থাকো বায়ু ধরার সন্ধানে
ধরার মন্ত্র শিক্ষা করে মিশে যাও বায়ুর সনে
কিছু হলো না নুরের জীবনে কোন কূলে গিয়ে দাঁড়াই ॥

১৭
ওরে শূন্যের খেলাঘর
পলকে তুই শূন্য হবে জানো নি খবর ॥
শূন্যকারে এই ভ্রমাণ্ড শূন্যেতে বাসর
শূন্যের উপর খেল পাতিয়া বসাইছ আসর ॥
শূন্যেতে থাকিয়া তুমি শূন্যে করো ভর
শূন্যেতে শূন্য মিশিলে কি হইবে তর ॥
জন্ম হইতে শূন্য তুমি ছিলে মায়ের উদর
শূন্যেরে তুই করে মান্য শূন্যের রাস্তা ধর ॥
চক্ষু মুজলে সবই শূন্য নুর তুই শূন্যেরই উপর
দুই চক্ষু মুজিবার আগে শূন্যের সেবা কর ॥

১৮
দয়াল গুরু মর্মকথা, বলিবে প্রমাণ।
ঊনপঞ্চাশ বায়ু ঘুরে, সাত বায়ু আছে প্রধান ॥
সাত সমুদ্রে সপ্ত পুত্র হয়, কোন পুত্রের কিবা নাম বলো পরিচয়।
পিতা মাথায় দিলেন আশ্রয়, বলো তাদের মূল সন্ধান ॥
কি জানা হইল অন্তরে, দয়াল গুরু যাহা কিছু বলো আমারে।
ঊনপঞ্চাশ বায়ু ঘুরে, সপ্ত হয় বায়ু হয় প্রধান ॥
সাত সমুদ্রে সপ্ত পুত্র হয়, কোন পুত্রের কিবা নাম বলো পরিচয়।
আবদুস সাত্তার গুরু মোরে, বলিবে তার মূল কারণ ॥

১৯
গুরু আমি শুনি কথা, বলো পরিষ্কার।
একে একে বলো আমায়, ষোলটি হইল বিকার ॥
কোন বিকার কিবা নামে হয়, আটটি প্রকৃতি মোরে বলো পরিচয়।
বিকৃতি করিবে নির্ণয়, গুরুধন করো প্রচার ॥
ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপক্ষিতি হয়, কাহার কি গুণ বলো জুড়াব হৃদয়।
গুরুর কৃপায় করি বিনয়, একের গুণ কি পাঁচ প্রকার ॥
সপ্ত পাতাল কি কি নামেতে, সপ্ত বেদ কি কি নাম গুরু বলিতে।
ব্যোমের পাঁচটি গুণ জানিতে, বলেছে আবদুস সাত্তার ॥

www.pathagar.com

২০
সূর্যের বারো অংশরে গুরু, গুরু আমায় যাও বলিয়া।
কোন খণ্ডের কি নাম হইল, বলিবে খুলিয়ারে ॥
অষ্টাঙ্গ যোগ রাজযোগে, গুরু দেও বুঝাইয়া।
কি কি নাম হয় আটটি অঙ্গ, জানিব শুনিয়ারে ॥
অঙ্গেতে তেরটি মন্দির, কোন কোন জায়গা লইয়া।
কোন মন্দিরে কোন দেবতা, কি কাজে বসিয়ারে ॥
মৎ কর্মের নয়টি কর্ম, কিঞ্চিৎ নাম শুনিয়া।
আবদুস সাত্তার কোন কর্মেতে গিয়াছে ডুবিয়ারে ॥

২১
হৃদয়ের তারে তারে ভাবি আমি যারে
পাই না কেন তারে খুঁজিয়া
দুই দিন পরে যাব চক্ষু মুজিয়া ॥
করি এত ডাকাডাকি সে যে আমার পরাণপাখি
কেমনে রইল আমায় ভুলিয়া
পাইলে তার দরশন ধন্য হইতো এ জীবন
পতিত পাবন নামটি ধরিয়া ॥
কাঙালের সখা নামটি যার লেখা
পাই না কেন দেখা ভুবন ঘুরিয়া
লতা পাতায় যাহার গুণগান করছে সার
আমি আশায় আছি তার জনম ভরিয়া ॥
বলে বশিরউদ্দিন কাঁদাবে কতদিন
হইল কঠিন কি দোষ জানিয়া
সে যে হৃদয়ের ময়না মনেরই আয়না
ফিরিয়া চায় না কার ছল্লা পাইয়া ॥

২২
যারে আমি আপন বলি
সে যে আমার আপন হয়না
বুঝে ও বুঝে না আমার খাঁচার পাখি ময়না ॥
আমার করে দিলাম তারে কতই সোনার গয়না
তবুও সে অবুঝ পাখির কপালে সুখ সয়না ॥
ছটফট করে পাখি একবার খাঁচায় রয়না
কেমনে বান্ধিয়া রাখি খাঁচায় থাইকা লয় না ॥
দুধ কলা খাওয়াইলাম কত তবুও আমার কথা কয় না
কত দোষের দোষী বানাইলো ধরে নানান বায়না ॥
বশিরে কয় নাই পাখির ভয় ডাকলে কাছে আয় না
এত আদর দিলাম সোহাগ দিলাম স্বভাব দোষ তার যায় না ॥

www.pathagar.com

২৩

বিনা কাষ্টের তরী আমার যেই জনে বানায়
নিজের হাতে চালাইতাছে বসিয়া নৌকায় ॥
মদনগঞ্জে আটকা তরী কি করি উপায়
রূপগঞ্জেতে বিকিকিনির সময় বয়ে যায় ॥
হীরালাল পরশের ভরা যদি ডুবে যায়
কি জবাব দিব মহাজনে হিসাব যদি চায় ॥
নৌকায় আছেন নৌকার মাঝি চিনা বিষম দায়
পাগল বশির বলে যে চিনেছে সুখী এ ধরায় ॥

২৪

ছাড়িয়া যাইও না রে ও পরান পাখি
কত আদর সোহাগ দিয়ে তোরে যত্ন করে রাখি রে ॥
আমার ঘরে থাইকা পাখি করো লুকালুকি
দেখা দাও না কাছে আও না কত ভাবে ডাকি রে ॥
কত ছিল ভালোবাসা কত মাখামাখি
তুমি যদি যাও ছাড়িয়া একা কেমনে থাকি রে ॥
বশিরউদ্দিন চির অধীন দিও না রে ফাঁকি
ভুলবো কিসে ভুলিবার নয় কাজল বরণ আঁখি রে ॥

২৫

পরণ কাষ্টের নাও মাঝি হুশ করিয়া বাও
যাইতে যদি চাও বন্ধুর বাড়ি রে ॥
সাবধানে মাঝি তোমার বৈঠা ফালাইও
জল উঠিয়ে ডুবে না যেন জল সিছিও
মাঝি বাও ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই ভিড়িবে তীরে
মধুর সুরে গাইয়া নামের সারিরে ॥
ঢেউয়ের ফাঁকে লাখে লাখে ভাসতেছে কুম্ভীর
মাল্লাদের বুঝাইয়া রাইখ, হইও না অস্থির
ধরো শক্ত হাতে মাঝি হাইলের বৈঠাতে
সাহসেতে যাবে ডাঙ্গা মারি রে ॥
পবন ভরিয়া নাও বানাইলো যে জন
নায়ের ভিতরে থেকে করে নিয়ন্ত্রণ
বশিরউদ্দিন কয় সে জন বন্ধু দয়াময়
যার হাতে নায়ের জাঙ্গা দড়ি রে॥

২৬

আদর করে পুষেছিলাম কালো একটি ময়না
কতভাবে বুঝাইয়া আমার কথা কয় না ॥
যেমন কাকের বাসায় কোকিল ছানা বড় থেকে থাকে

www.pathagar.com

কাকের বাসায় থাকিয়া সে কোকিলের ডাক ডাকে
জাতের ডাক সদায় ডাকে অন্য বুলি লয় না ॥
সোহাগ করে খাওয়াইলাম কিচমিচ আঙুর বাদাম
তবুও সে অচিন পাখি করে আমার বদনাম
এ বুঝি তার ফল পাইলাম শুধু জ্বালা যন্ত্রণা ॥
নিদয়া নিঠুর পাখি যখনই উড়ে যায়
বারেবারে ডাকলে তারে ফিরিয়া না চায়
লুকি দেয় গহীন জঙ্গলায় বশির পায় না ঠিকানা ॥

২৭
আমার ভাঙা তরী ভাসাইলাম গো দয়াল
তোমার প্রেম সাগরে
দয়া করে দাও কিনারা বলি যে কাতরে ॥
আমার ভাঙা তরী হাবুডুবু করে
কেমন করে যাই সে পাড়ে পরান কাঁপে ডরে ॥
দাড়ি মাঝি হয় না রাজি ভয় জাগে অন্তরে
তোমার প্রেম সাগরে সাহস করে দিলাম পাড়ি ধরে ॥
ডুবাইয়া মাইরো না দয়াল বলি বিনয় করে
বশিরউদ্দিন তোমার অধীন আওয়ালে আখেরে ॥

২৮
আমার এই না দেহঘরে বাস করে এক হীরামন
আসা-যাওয়া করে সদায় দেখতে পায় না দুই নয়ন ॥
থাকে পাখি হৃদ কোমলে
চলিতেছে কল-কৌশলে
হঠাৎ কোন দিন যাবে চলে
ভাঙিয়া সুখের স্বপন ॥
হীরামন যখন যাবে উড়ে
শূন্য খাঁচা থাকবে পড়ে
রাখবে খাঁচা মাটির ঘরে
যতই আত্মীয়-স্বজন ॥
পেস্তা বাদাম মাখন ছানা
খাওয়াইলাম মজার খানা
বশিরে কয় আপন হয় না
ছিড়িয়া যাবে বন্ধন ॥

২৯
আমার এই দেহ রাজ্যে শুরু হলো খেলা
তেরো নদী সপ্ত সাগরে ঢেউ উঠেছে উতালা ॥
সুমতি কুমতি দুইজন

www.pathagar.com

খেলাতে দিল সমর্থন
পাইক আছে তাদের ষোলজন
সবাই তারা হয় মাল্লা ॥
চার কুতুব হইয়া কাজম্যান
খেলা করতেছে নিয়ন্ত্রণ
খেলাতে জিতিবে যেইজন
সে পাবে জয়ের মালা ॥
বশিরউদ্দিন কথা ধরো
কুমতির সঙ্গ ছাড়ো
সুমতিরে রাখো ঘরো
রাজ্য হবে উজ্জ্বলা ॥

৩০
ও দয়াল গো উদ্ধারিয়া লও আমারে
ডাকিতেছি ওগো দয়াল ডাকিতেছি কাতরে
তুমি বিনে দুজাহানে কে ত্বরাবে আমারে ॥
ও দয়াল গো ভবসাগরে পড়ে কাঁদি
নাহি জানি সাঁতার
আমি যদি ডুবে মরি কলঙ্ক রবে তোমার
নিজ গুণে করে নেও পার রহিম নামের জোরে ॥
ও দয়াল গো ভাঙা বৈঠা ছিড়া বাদাম
বাতাসে না ধরে
ঐ যে আমার জীর্ণ তরী হাবুডুবু করে
ভয় দেখায় কালো কুম্ভীরে কেমনে যাই পাড়ে ॥
ও দয়াল গো অসীম ক্ষমতা তোমার
জানি তুমি দয়াবান
দয়ার বলে অকূল জলে কতজনা পাইলো ত্রাণ
বশিরউদ্দিন গায় গুণগান বেহালার সুরে সুরে ॥

৩১
জীবন নদীতে মানব তরী হায় কি করি
জীবন নদীতে মানব তরী।
আমি তো জানি না সাঁতার কেমনে হইব পার
ঘোর অন্ধকার বিপদ বিষম বারি ॥
জীবন নদীর বাঁকে ঢেউয়ের ফাঁকে আমায় ডাকে
বাঁকে বাঁকে উঠে হুংকার মারি
ভয়ে কাঁপে আমার হিয়া কেমনে তরী বাইয়া
দয়ার বলে লইবেন উদ্ধারি ॥

www.pathagar.com

তরীতে মাল্লা ছয়জন সদায় তারা দেয় জ্বালাতন
সারাক্ষণ করে হুড়াহুড়ি
বৈঠা বায় না দাড় টানে না আমার কথা মানে না
গুণ টানে না চিঁড়া জাঙ্গার দড়ি ॥
কি করিব কোথায় যাব কার কাছে শান্তনা পাব
ভয়েতে প্রাণ কাঁপে আমারই
বলে বশিরউদ্দিন পাগল, সার হইল দুই নয়নের জল
নিবেদন করি আহাজারি ॥

৩২
কার ঘরেতে বসত করি কার ভিটাতে বাড়ি
সে আমারে দেয় না ধরা এমন আনাড়ি
আমি এমন আনাড়ি ॥
একই সাথে চলাফেরা একই সাথে দুজন
আমি দেখি না আমার সাথেরই স্বজন
সে স্বজন শুনি দেখবো তারে কেমন করি ॥
চর্মচোখে খুঁজি আমি পাই না খোঁজে তারে
আমি দেখি না সে দেখে আমারে
বিশ্বাসে স্বর্গ মেলে আছি বিশ্বাস ধরি ॥
নজরুল রানা পাগল হয়ে খোঁজে সেইজন
যার ঘরে যার ভিটার মাঝে থাকি সর্বক্ষণ
সেই মহাজনের চরণে যদি মরতে পারি ॥

৩৩
আমি শক্তি আমি মুক্তি আমি রই অবিচল
আমার মাঝে আমার চলাচল ॥
নিজ গুণে আছি আমি আমার এ দেহের মাঝে
সাজাইয়া রেখেছি আমি যেখানে যাহা সাজে
আছি আমি আমার কাজে
বিছাইয়া আমার আঁচল ॥
নিজ রূপ প্রকাশিতে আসিলাম আমি ধরায়
ছোঁয়া ধরা যায় না থাকি অধরা ধরার গায়
রূপ ধরিয়া বাতাস হইয়া
প্রকাশ করলাম নিজ বল ॥
মুক্তি মুক্তি মুক্তি বলে কাহার কাছে মুক্তি চাই
তড়িতে নয় ত্বরাইতে এসেছি জগতে তাই
নজরুল রানা শক্তি মুক্তি
যুক্তিতে হয় সবল ॥

www.pathagar.com

৩৪
তুমি আমি মিলে গেলে নাইরে কোনো ক্ষয়
গাইবো তখন প্রেমেরই গান সর্ব করে জয় ॥
এক মনে এক দেহঘরে থাকি যদি দুজন
তাহলে আর জ্বরা ভর করবে না এমন
রবে জীবন আমরণ মরণে কি ক্ষয় ॥
দুজন উঠিবো নেচে মধুর এ মিলনে
সকল সংশয় দূর হবে মিলন স্রোতবাণে
মিলন মধুর কাননে আলো শয্যাময় ॥
দুজন এক হলে তবে রয় না কেউ বেফানা
জেনেছে এ অমৃতবাণী নজরুল রানা
কোথাও কোনো গুল বাঁধবে না জানি যে নিশ্চয় ॥

৩৫
মন্ত্রি করে পাই না খোঁজে যান্ত্রিকেরই জগতে
কথা বলি রোবটেরই সাথে ॥
সোনা বন্ধুরে
বন্ধু বলে এ জগতে নাইরে কিছু আর
সোনা বন্ধু নামে অর্থে হইয়াছে অসার
সুখে-দুঃখে কথা বলার বন্ধু নাই আর জগতে ॥
ও প্রেমিরে
প্রেমি বলে এ জগতে কেবা কাহার
প্রেম পিরিতি ভালোবাসা হইয়াছে আঁধার
দেহ প্রেমে মগ্ন সবাই প্রেম রইলো অতীতে ॥
প্রাণের সংসার রে
সংসারে থাকিয়া সবাই হইতো রে স্বজন
বাপে-মায়ে ভাইয়ে-বইনে বাঁধা থাকতো মন
এখন কেউ কারো লয় না খবর চলে নিজের স্বার্থে ॥
ও মানুষ রে
রক্ত মাংসের মানুষের পাইনা রে সোজা
প্রাণের স্পন্দন নেইরে যেমন কলকজা
নজরুল রানার মরণ কালে কে রইবে প্রার্থনাতে ॥

৩৬
রঙের ঘর রঙের বাজার দেখি রঙের আয়োজন
মন নাচে রঙেরই নাচন ॥
রঙ উড়াইয়া দেয় আকাশে, রঙ উড়ে যায় সবখানে
রঙের বাতাস উড়াইয়া নেয় তার মানে মহাগুণে
রঙের রঙিলা কথা, রঙের রঙিন মানবতা
রঙ দিয়ে রঙিলা মন ॥

www.pathagar.com

রঙের সুখে হাসাহাসি রঙের তালে হাঁটি
রঙের সওদা রঙের সংসার রঙের ভিটামাটি
চোখের আলো রঙিলা, গলায় রঙের মালা
ঘরে-বাইরে রঙের তালা, সাবধানে রঙের ধন ॥
রঙ দিয়ে রঙের জমিনে বুনে রঙের ফসল
রঙের গান গাইয়া গাইয়া রঙে নাচে সকল
রঙের জগত পাইয়া নজরুল রানা রঙিলা হইয়া
দিবানিশি থাকে মজিয়া ভুলে জীবন মরণ ॥

৩৭
স্পিংয়ের পালা দিয়া ঘরের উপর ঘর বানাইয়া
মহাজন থাকেন সেই ঘরে
খুঁজলে তারে পাওয়া যায় না, ধরতে গেলে ধরা দেয় না
কয় কথা ভির-বাইরে ॥
ঘরের পালা নড়ে চড়ে, জলে চড়ে ডাঙায়ও চড়ে
ঘরখানা ঝরে না পড়ে
সামনে-পিছে ডানে-বামে যেথা খুশি যায় যে ধামে
দরকার অ-দরকারে ॥
পালার উপর তিনখানা ঘর, ঘরের ভিতর দিল্লীর শহর
সদরে কেউ যেতে না পারে
ঘরের ভিতর ঘর বানাইয়া নয় দরজায় তালা দিয়া
জ্বালায় আলো নীড়ে ॥
জগত তরে নাই তার দিশা, আসা-যাওয়া ভালোবাসা
খুঁজলে কি আর পাওয়া যায় তারে
ঘরে থেকে কথা কয় বাহিরে তার সুর উদয়
নজরুল রানা ঘোরে ॥

৩৮
শুকনা গাছে ধরলো ফুল, যে ধরালো সেজন গুণি
জেনেছি সে পথের ধারা, তাইতো ছুটি দিন-রজনী ॥
পথের ধারে শুকনো গাছ, পথিক যায় তায় বসে
পথিক পরশ ছোঁয়া পেয়ে, উঠলো গাছটি হেসে
পঞ্চরসে মাখা সেজন সুজনের সজনী ॥
সুপথ দিয়ে পথ ধরিলে দেখবি গাছটি ফুলে
চারিদিক সুবাস সৃজিত, স্বর্গের খেলা খেলে
আকুলতায় নেই ফলাফল, প্রেম সাধনে মুনি ॥
সাধন করো প্রেমের পাখি, খাঁচায় রেখে আঁখি
পাবে তবে সব আয়োজন দেবে নিজে ডাকি
নজরুল রানা গাছের মূলে ফুলের দিন গনি ॥

www.pathagar.com

৩৯
ওরে মানুষ কূলে আর আসা হবে না
দিলকোরাণে মুক্তি দিলে বেফানা পাবে ফানা ॥
দিনে দিনে দিনের ঘোরে নিজকে পেলে নিজের করে
শুদ্ধ হবে তবে সাধনা
সাধন ভজন মুক্তির কিরণ উড়িবে মানুষ নিশানা ॥
কোরাণ কিতাব প্রকাশ করে দিল-কোরাণে শাসন করে
অন্তরের ডাক হবে সান্তনা
আজ গেলে কাল হবে দুদিন ঋণের বোঝায় সাপ রেখো না ॥
নিজের সাথে আদান-প্রদান, নিজের তরে সকল বিধান
নিদানেও ধৈর্য ধারনা
এ পাড়েতে ওপাড় জেনে নজরুল রানা গায় মুক্তির গানা ॥

৪০
গতিপথে পতি আমি, জগত ভূমি রহিলে শ্বাস
পাড় হবে তো তরী লয়ে গেলে ক্ষয়ে সকল বিনাশ ॥
আমি লীলা আমি খেলা
জগতমূলে আমি মেলা
আমি গেলে গেলো বেলা
আমাতে আমার বসবাস ॥
কী রূপের আসা-যাওয়া
কী রূপের সঙ্গ নেওয়া
রূপের সাজ খোঁজে পাওয়া
অরূপে রূপ রাখো বিশ্বাস ॥
নজরুল রানা জগত তরে
কারো সাক্ষাত খোঁজে নারে
সে বুঝে তার সঙ্গ ধরে
আছে স্বরূপ দিয়ে সাক্ষাত ॥

৪১
তুমি বিনে আপনে, কে আর আপন আছে কাছে
আমি তুমি কোনজন, অমিল কোথায় রয়েছে ॥
তুমি প্রেমের মহাজন, আমাতে পাইলে জীবন
স্বজনেতে বিতরণ তাই সবাই জেনেছে
দেহ ঘরে স্থান নিয়া প্রকাশিতে যাও রচিয়া
তোমাতে আমাকে দিয়া তোমার কর্ম চলেছে ॥
সাগরে ঢেউ উঠিলে তরণী ছেড়ে দিলে
তব গুণে যাবে চলে বিশ্বাসীর বিশ্বাস আছে
তোমার বাড়ি তোমার ঘর, কেমনে হবে তবে পর

www.pathagar.com

ঘরের ভেতর যাযাবর শক্তির নিশান উড়িয়েছে ॥
তুমি আমি আমি তুমি, নজরুল রানা কোনজন শুনি
কে কার কারে ধরবো জানাজানি কে কথা কয়েছে
পাই কারে ধরবো কারে কেবা আমায় ভিন্ন করে
বিবরণ সুরে কিরণপুরে প্রেমের বাজার বসেছে ॥

৪২
উড়াল পাখিরে আমার উড়াল পাখিরে
জানি একদিন উড়াল দিয়া যাবি ॥
পাখি আমার ডাক শোনবে না
যাবার সময় ফিরে চাইবে না
যতই তারে লালন করি
ভুলে যাবে মোর ছবি ॥
নিয়ে ঘরে থাকার অধিকার
রাখবে না তার একটুও সার
ঘরে আঁধার কোনো বারে
উঠবে না আর রবি ॥
নজরুল রানা বিশ্বাস করিয়া
ধোকায় পড়লো মজিয়া
সময়ের তীরে বইয়া
কান্দন হলো হবি ॥

বেদে-সংগীত

বেদেরা যাযাবর। তাঁরা একেক সময় একেক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। যেহেতু নৌকায় এঁদের বসবাস, তাই নৌকা করেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাঁরা যাতায়াত করেন। নৌকাতেই তাঁরা বসতি স্থাপন করে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো সুনামগঞ্জ জেলায়ও বেদেদের অসংখ্য বসতি রয়েছে। জেলার সদর, দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক, জগন্নাথপুরসহ বিভিন্ন উপজেলায় বেদেদের নৌকার বহর বছরের প্রায় সময়ই দেখা যায়। এছাড়া সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রাম পুরোটিই বেদেদের গ্রাম। এখানে বেদেদের শতাধিক পরিবার বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তবে এসব বেদেদের অধিকাংশই এখন পেশা বদল করে নানান পেশায় প্রবেশ করেছেন।

লোকসংস্কৃতি গবেষক সুমনকুমার দাশ তাঁর *বেদে-সংগীত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'বিশ্বে সাপুড়েদের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে সাপুড়েরা ভারতবর্ষে যে আচার-সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করছে তা অনান্য দেশে দেখা যায় না। বিশ্বের অনেক দেশেই সাপ ধরা পেশার সঙ্গে অনেকে জড়িত থাকলেও একমাত্র ভারতবর্ষেই সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখানোসহ বিভিন্ন চিত্তবিনোদনের খোরাক জোগান দেন। এই ভারতবর্ষেই বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দরদ দিয়ে, যা বাঙালি মাত্রই উদ্বেলিত।'

www.pathagar.com

এই সাপের খেলা দেখানোর সময় বেদে-বেদেনীরা এক ধরনের সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। সুদীর্ঘকাল থেকে এসব সংগীত মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। আর প্রচলিত এসব গান 'বাইদানীর গান' বা 'বেদে-সংগীত' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। প্রকৃতঅর্থে এসব গান লোকসংগীত কিনা—তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, এসব গান আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাগানের ধারার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বেদে-বেদেনীরা সাপের খেলা দেখানোর সময় যেসব গান পরিবেশন করেন, এর মধ্যে সংগৃহীত কিছু গান নিম্নরূপ :

১

আগে বাইদ্যার সঙ্গ না করে
কালসাপিনী ধরতে গেলাম
সাহসের জোরে
ফণা ধরলো ছোবল মারলো
বিষে অঙ্গ কেমন করে ॥
ওঝা বৈদ্যের কাছে গেলাম
কত শতবার
কিছুতেই আর শান্তি হয় না
দিল বেকারার
ডাক শোনে না মন্ত্র মানে না
ঝারলে বিষ উজান ধরে ॥
বাইদ্যা যারা জানে তারা
সাপ ধরিবার ধরিবার কল
বাঁশির গানে ডেকে আনে
বাঁশিতে কৌশল
সাপিনী দেখিলে তারে
অমনি মাথা নত করে ॥
পঞ্চরসে মাখা যে জন
শুদ্ধশান্ত হয়
কালসাপিনী দংশিলে
তার মরণের নাই ভয়
সে জানে সুধা কোথায় রয়
খেয়ে যায় অমরপুরে ॥
মায়াবিনী কালসাপিনী
এ করিম বলে
মহামন্ত্র না জানিলে
দংশে কপালে
গুরুবস্তু ঠিক থাকিলে
সে জন সাপ ধরতে পারে ॥

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জের বেদে পল্লি

২
ধর্ম চালম কর্ম চালম
সাপের মই টক চালম
আসা আসি কমন চালম
ধর্ম চালম কর্ম চালম ॥

৩
মোরা এক ঘাটেতে রান্ধিবাড়ি
মোরা আরেক ঘাটেতে খাই
মোদের ঘরবাড়ি নাই
বাবু সালাম বারেবার।

৪
আমরা সব বেদের মেয়ে বাতের ব্যথা ভালো করি।
হয় যে রসিক সুজন বিনা ব্যয়ে পায় সে বড়ি ॥
ঝোলাতে টোটকা রেখে পড়াতে বেড়াই ডেকে,
মনের মতন রোগী দেখে কোঁচাটি ধরি ॥
যদি হয় ধনীর ছেলে, খাওয়াই ডিম ভেজে তেলে,
সে আপনজন সবায় ফেলে, জোগায় মোদের কড়ি ॥

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

বিনোদনপ্রিয় হাওরের মানুষেরা নানা উৎসবে-পার্বণে লোকনৃত্য ও লোকগানের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছেন। সেসব আয়োজনে লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই হয়ে আসছে। অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন লোকগানের আয়োজনে লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কমতি নেই। দেশের অনান্য অঞ্চলের মতোই হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, জুড়ি/মন্দিরা, চইট্যা, তবলা, খমক, সারিন্দা, স্বরাজ, একতারা, দোতারা, ডুগডুগি, শঙ্খ, কাঁসি, করতাল, মৃদঙ্গ, খোল, কর্ণেটি বা কেরিনেট, তুরি, নাকারি, সানাই, সারেঙ্গি, ধামসা, নূপুর, খঞ্জনি, খঞ্জরি, গোপীযন্ত্র, ঘণ্টা, চাটি, মাদল, সেতারাসহ বিচিত্র ধরনের লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে কিছু লোকবাদ্যযন্ত্রের পরিচিতি নিম্নরূপ :

১. মন্দিরা

কাঁসা ও পিতল দিয়ে তৈরি ঘন বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে মন্দিরা। এটি বাটি জাতীয় তালবাদ্য। মন্দিরা তৈরিতে দুটি বাটি ব্যবহৃত হয়। বাটির তলদেশে ফুটো করা থাকে। এই ফুটোর মধ্যে দড়ি দিয়ে এক ধরনের হাতলবিশেষ তৈরি করা হয়। মন্দিরা বাজাবার সময় এই দড়ি আঙুলে পেচিয়ে বাটিদ্বয়কে আঘাত করা হয়। লোকগীতি, কীর্তন, বাউলগানের সঙ্গে বাদ্য হিসেবে মন্দিরার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

২. ঢাক

বড় ও মোটা ফাঁপা একটি কাঠের খোলের দুইপাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদন করে ঢাক তৈরি করা হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, চড়কপূজায় ঢাকের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

৩. ঢোল

খোল কাঠ দিয়ে ঢোল তৈরি করা হয়। কাঠের মধ্য অংশ ফাঁপা। ফাঁপা দুই অংশ ঢাকতে দুই দিকে চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন করা থাকে। তবে বাঁ দিকে পুরু ছাউনি এবং ডান দিকে অপেক্ষাকৃত হালকা ছাউনি থাকে। দুই অংশটিকে গজরা রজ্জু ও চর্মা দিয়ে টানটান করে সংযুক্ত করা হয়। ছোট ও মোটা একটি কাঠি দিয়ে ঢোল বাজানো হয়। বিয়ে, কবিগান, জারিগানসহ গ্রামীণ নানা আচার-পার্বণে ঢোলের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

৪. ঢোলক

ঢোলক বাদ্যযন্ত্রটি ঢোল অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার। এটি ঢোল অপেক্ষা চিকন ও সরু এবং সামান্য একটু লম্বাও। খোলের দুই মুখ পাতলা চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। বামপাশের চামড়ায় খিরণ লাগানো থাকে। হাত দিয়ে বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয়ে থাকে। সাধারণত সুনামগঞ্জ অঞ্চলে যাত্রাগান এবং ঢপযাত্রায় ঢোলকের ব্যবহার বেশি লক্ষ্যণীয়।

www.pathagar.com

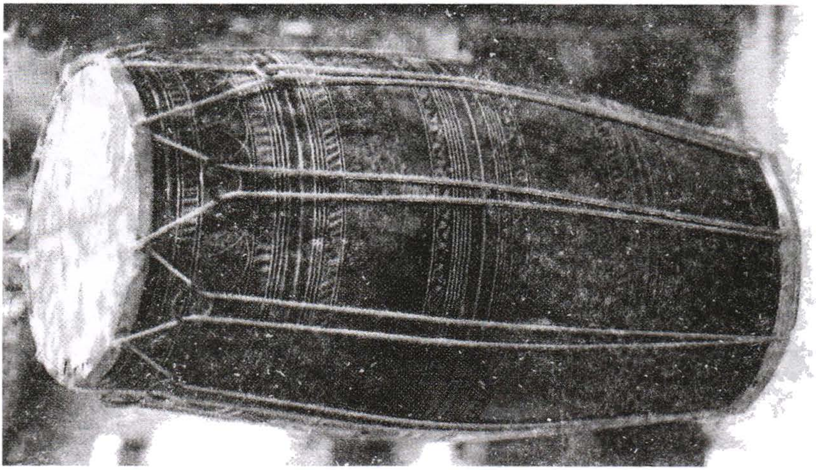

ঢোল

৫. কাঁসর

কাঁসার তৈরি বাদ্যবিশেষ। সাধারণত পূজার সময় হিন্দু ধর্মালম্বীরা এ বাদ্যযন্ত্রটি মাঙ্গলিক আয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন। বাদ্যটির মাথায় দুইটি ফুটো থাকে রশির গিঁট দেওয়ার জন্য। ওই ফুটোতে রশি বাঁধা থাকে। ফলে বাজানোর সময় রশিতে ধরে একটি মোটা কাঠি দিয়ে বাদ্যে সজোরে আঘাত করে কাঁসর বাজানো হয়। এর বাইরে সময়ের হিসাব রাখতে এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজানোর রেওয়াজ এখনো সুনামগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামীন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং থানায় প্রচলন দেখা যায়।

৬. লাউ

একটি শুকনো লাউয়ের অর্ধেক অংশ গোলাকার করে কেটে নিতে হয়। এরপর লাউয়ের ফাঁপা অংশে প্রায় দুই হাত লম্বা একখণ্ড ফাঁপা সরু বাঁশের মধ্যদিকে চিরে সোজা দাঁড় করিয়ে বেঁধে নিতে হয়। বাঁশের ফাঁপা অংশের মাঝখানে সুতা বেঁধে সেই সুতা লাউয়ের নীচে ফুটো করে এঁটে দিতে হয়। বাউলগান কিংবা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান পরিবেশনের সময় লাউয়ের ব্যবহার সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বেশ লক্ষণীয়।

৭. সারিন্দা

সুনামগঞ্জে বিভিন্ন বাউল গানের আসরে এবং উদাসীন বৈষ্ণবসাধুদের কীর্তন পরিবেশনের সময় সারিন্দার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ বাদ্যযন্ত্রটি লম্বায় দুই থেকে সোয়া দুই ফুট হয়। আস্ত একটি কাঠ কেটে নীচের অংশে খোদাই করে ধ্বনিকুণ্ড নির্মাণ করা হয়। ধ্বনিকুণ্ডের সরু অংশে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়। ছাউনির উপরে সওয়ারি লাগানো হয়। সারিন্দার উপরের অংশটি জীবজন্তু বা পাখি আকৃতির কারুকার্যখচিত থাকে। কারুকার্যখচিত অংশে তিনটি কাঠের বয়লার সাহায্যে নীচ পর্যন্ত তিনটি তার সংযুক্ত করা থাকে। চামড়ার এসব তার ছড়ের সাহায্যে বাজাতে হয়। ছড়াটি ধনুকের মতো বাঁকানো থাকে।

www.pathagar.com

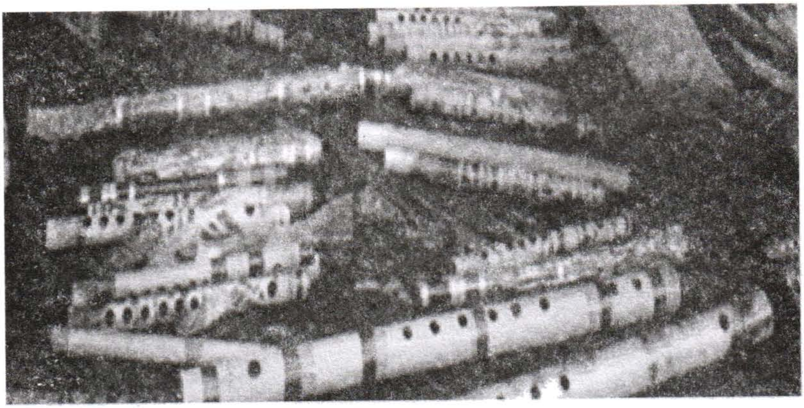

বাঁশি

৮. বাঁশি

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন লোকগান পরিবেশনের সময় বাঁশির অত্যাবশ্যক ব্যবহার দেখা যায়। এর বাইরে রাখালেরা মাঠে গরু চরানোর সময়ও বাঁশি বাজাতে দেখা যায়। এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাচীন লোকগীতিকারের গানে বাঁশির সমধিক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এখনও কোনো চাঁদনি রাতে কিংবা মধ্য দুপুরে মাঠে-ঘাটে-হাওরে সৌখিন বাঁশি বাদকদের বাঁশির সুমধুর ও উন্মাতাল সুর শোনা যায়। ফাঁপা সরু বাঁশ দিয়ে বাঁশি তৈরি করা হয়। তবে আধুনিককালে পিতল, কাঠ ও মাটি দিয়েও কিছু প্রকারের বাঁশি তৈরি হতে দেখা যায়। তবে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বাঁশের নির্মিত বাঁশির প্রচলনই সবচেয়ে বেশি। বাঁশি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকারের হচ্ছে : আড়বাঁশি, হরিণা বাঁশি, টিপরা বাঁশি, কদ বাঁশি, সরল বাঁশি, লয়া বাঁশি, মোহন বাঁশি ও মুখবাঁশি।

৯. শঙ্খ

বাংলার অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে শঙ্খ। সাধারণত হিন্দু ধর্মসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে শঙ্খের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তবে বিয়ে অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যাপূজায় শঙ্খের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। মৃত শঙ্খের খোলসকে শঙ্খবাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, রামায়ণ ও বিভিন্ন পুরাণে শঙ্খের নাম উল্লেখ রয়েছে। মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের কবি-কথাসাহিত্যিকদের রচনায়ও শঙ্খের নানামুখী উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্খের সন্মুখের ছিদ্রপথে ফুঁ দিলে সুমধুর আওয়াজ তৈরি হয়। বাংলার অন্যতম প্রাচীন লোকবাদ্য হিসেবে শঙ্খ ইতিমধ্যেই স্থান করে নিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ গীতায় যুদ্ধের গতিবিধি বর্ণনায় শঙ্খ-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে এভাবেই :

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥

www.pathagar.com

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমূলোইভৎ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ পদধ্মতুঃ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়।
পৌণ্ডং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরঃ ॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেবাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥
দ্রুপদো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক পৃথক ॥
সে ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রণাং হৃদয়নি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোইভ্যনুনাদয়ন্ ॥

www.pathagar.com

লোকউৎসব

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এটি যেন সুনামগঞ্জে একটু বেশিই। এখানে প্রতিটি ঋতুতে ঘটা করে নানান উৎসব পালিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে মিশে গেছে মানুষের সহজাত সংস্কৃতি। এসব সংস্কৃতিকে দিনদিন বর্ণিল ও মধুময় করে তোলে গ্রামীণ মানুষ উৎসবে রূপ দিয়েছেন। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানাকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় এসব উৎসব এখন স্বমহিমায় চিরভাস্কর। ঈদ, পূজা, বাংলা নববর্ষ, চৈত্রসংক্রান্তি, নবান্ন, পৌষমেলা, বিয়ে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নানা ক্ষেত্রে লোকউৎসবগুলো বর্ণাঢ্য পরিসরে আয়োজিত হচ্ছে। এসব উৎসবে আয়োজনের তারতম্য অনুযায়ী হাজারো মানুষের সমাগম ঘটে।

বিয়ে উপলক্ষে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের উৎসব-পর্ব পালিত হয় না। এরমধ্যে গায়ে হলুদ, সদরভাতা, মঙ্গলাচরণ, বউবরণ, ভাত-কাপড়, বৌভাত উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে আরো কিছু লোকউৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. বাংলা নববর্ষ

বাংলা নববর্ষ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও উৎসব। এ দিনটি অত্যন্ত ঘটা করে গ্রামীণ মানুষেরা পালন করে থাকেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসবটি সর্বজনীনভাবে সুনামগঞ্জে সুদীর্ঘকাল ধরে পালিত হয়ে আসছে। পুরোনো বছরের সকল ব্যর্থতা দূরে ঠেলে দিয়ে নবআনন্দে নতুন বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে উৎসাহ-উদ্দীপণা নিয়ে মানুষেরা দিন শুরু করেন। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে গোসল সেরে নেন। ওইদিন বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন করা হয়। কারণ গ্রামীণ মানুষেরা বিশ্বাস করেন, বছরের প্রথম দিনটি ভালো কিছু খেলে সারাবছর একইভাবে ভালো খাবার খেয়ে দিন অতিবাহিত হবে। তবে কোনো কোনো স্থানে ওইদিন পান্তা ভাত-ইলিশ খাওয়ার রেওয়াজও রয়েছে। বাংলা নববর্ষের একটি অন্যতম পরিচিত বিষয় হচ্ছে হালখাতা। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও হালখাতা উৎসব পালন রেওয়াজ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা ওইদিন হালখাতা উৎসবের আয়োজন করে তাদের ক্রেতাদের নিমন্ত্রণ নেন। ক্রেতারা সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে দোকানে এসে আগের বছরের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করেন। আগত ক্রেতাদের ব্যবসায়ী মিষ্টিমুখ করিয়ে নতুন বছরের ব্যবসা-কার্যক্রম শুরু করেন।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়। ফুটবল খেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগ লড়াই, কুস্তি খেইড় থেকে শুরু করে পালাগান, মালজোড়া গান, যাত্রাগান এবং বাউলগানের আয়োজন করে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে লোকশিল্পজাত, কুটিরশিল্পজাত, মৃৎশিল্পজাত সামগ্রীর সমন্বয়ে বৈশাখী অনুষ্ঠিত হয়। সবমিলিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অনেকটা ঘটা করে বাংলা নববর্ষের দিনটি পালন করে থাকেন সুনামগঞ্জবাসী।

www.pathagar.com

নবান্নের নতুন ধান

২. নবান্ন উৎসব

অগ্রহায়ন মাসে আমন ধান কাটার ধুম পড়ে। এ সময় সোনালি ধানে ভরে যায় গৃহস্থের বাড়িঘর। নতুন ধানের সুগন্ধে মৌ মৌ করে চারপাশ। ফসল ভালো জন্মালে সঙ্গত কারণেই কৃষকের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। তাই নতুন ধানের চাল দিয়ে শুরু হয় হরেক রকম পিঠা তৈরির ধুম। প্রায় প্রতিটি কৃষাণী ব্যস্ত হয়ে পড়েন পিঠাপুলি তৈরিতে। পুলি, চই, ভাপা পুলি, নারকেল পুলি, গুড় পুলি, মালপোয়া, চিতই পিঠা, পাটিসাপটাসহ নানা ধরনের পিঠা তৈরি হয়।

৩. চৈত্রসংক্রান্তি

চৈত্র মাসের শেষ দিনটি সুনামগঞ্জের গ্রামীণ মানুষেরা ঘটা করে পালন করে থাকেন। কোনো কোনো এলাকায় চৈত্রসংক্রান্তির দিনটিতে বিরাট মেলা বসে। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িতে তিতা খাবারের আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে নতুন বছরের আরম্ভলগ্নে তিতা খাবার খেয়ে শরীরের সব ধরনের রোগ-শোক-জ্বরাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলা। তারা ঘরবাড়ি ও হাঁড়ি-পাতিল ধোঁয়া-মোছা করে পরের দিনটি বরণ করে নিতে প্রস্তুত হন। চৈত্রসংক্রান্তিতে সুনামগঞ্জের একাধিক স্থানে গ্রামীণ মেলাও বসে। এতে বাঁশ, বেত, মাটি ও ধাতুর তৈরি সামগ্রীসহ বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা বসে। থাকে বায়োস্কোপ, সার্কাস, পুতুল নাচ, ঘুড়ি ওড়ানোসহ নানা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।

চৈত্রসংক্রান্তিতে গ্রামাঞ্চলের অন্যতম আকর্ষণ চড়কপূজা। ওই দিনটিতে প্রায় গ্রামেই চড়কপূজার আয়োজন করা হয়। ৪০/৫০ ফুট উচ্চতার একটি শাল/গজারি গাছ মাটিতে পুঁতে ওই গাছের পূজা করা হয়। গাছের অগ্রভাগে একটি লম্বা বাঁশ বেঁধে দিয়ে দুই পাশে শক্ত রশি প্রায় মাটি পর্যন্ত সাঁটানো হয়। এরপর বিশালাকৃতির বড়শি রশির দুই প্রান্তে লাগিয়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়। সেই দুই প্রান্তে বড়শিতে দুজন মানুষের পিঠে গেঁথে দিয়ে জোরে ঠিক শূন্যে ঘোরানো হয়। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানা বয়সী মানুষ উপস্থিত হন। চড়ক মাঠেই অসংখ্য লম্বা ধারালো রাম দায়ের ঠিক উপরে একজন মানুষকে শুইয়ে রাখা হয়। এরপর একাধিক মানুষ ওই শুয়ে থাকা ব্যক্তির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে হেঁটে চলেন, কিন্তু দায়ের ঘায়ে ওই শুয়ে থাকা ব্যক্তির কিছুই হয়। এর বাইরে ভয়ংকর এবং কষ্টসাধ্য আরো দৈহিক কলকৌশল দেখিয়ে থাকা হয় চড়কপূজায়। আতংকজনক এ-রকম চড়ক উৎসব সুদীর্ঘকাল ধরে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

চড়কপূজায় পুরুষেরা নানা ধরনের গানও পরিবেশন করে থাকেন। তবে চড়কপূজার অন্তত ১৫-২০ দিন আগে থেকে পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত বেশসংখ্যক মানুষ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নৃত্যগীতসহকারে ভিক্ষাবৃত্তিতে অংশ নেন। এ সময় তাঁরা সারাদিন উপবাস থাকেন। চড়কপূজার আগে পূজারারি স্থানীয় শশ্মানে গিয়ে পূজা দেন এবং গৌরিরি বিয়ে দেন। এ সময় ঢাকের তালে গৌরিনাচ ও বিভিন্ন গান গেয়ে চারপাশ উৎসবমুখর করে তোলেন।

৪. পৌষসংক্রান্তি

অগ্রহায়ণ শেষে আসে পৌষ। ঋতুচক্রের আবর্তে এ মাসে শীতের আবহ ভয়াবহরূপে টের পাওয়া যায়। পৌষ মাসের শেষ দিনটিতে গ্রামীণ মানুষ শীতের আমেজ নিয়ে পিঠা তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান। বিশেষ করে এ দিনটি গ্রামীণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পালন করে থাকেন। বিভিন্ন বাড়িতে কুটুমদের আগমনের পরিমাণও বেড়ে যায় সে-সময়। নানা রকমের পিঠা-পায়েস তৈরি করা হয়। পৌষের কনকনে শীত থেকে রক্ষা পেতে আগুনঘর পুড়িয়ে শরীরে তাপ লাগিয়ে পৌষসংক্রান্তিকে উপভোগ করেন। কোনো কোনো জায়গায় পৌষসংক্রান্তিকে ঘিরে বাউলগান কিংবা কিস্‌সা গান, কীর্তনের আয়োজন করা হয়। তবে বর্তমানে শহরে ফ্যাশনের অংশ হিসেবেও এখন পৌষসংক্রান্তিকে ঘটা করে আয়োজন করা হয়।

৫. ঈদ-উৎসব

বাঙালি মুসলমানের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো ঈদ। সারা দেশের ন্যায় সুনামগঞ্জেও পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পালিত হয়। রমজান মাসে ধর্মপ্রাণ মসুলমানেরা রোজা রেখে সন্ধ্যার নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার সারেন। ইফতারে হরেক রকম খাদ্য তৈরি করা হয়। সুনামগঞ্জে বিশেষ করে শাকসবজির আয়োজন করা হয় বেশিভাবে। ঈদের দিন জামাত শেষে একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে একে-অপরের বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানে পিঠাপায়েস, সেমাইসহ নানা খাবার দিয়ে আগতদের আপ্যায়ন করা হয়। আগতদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়। কোনো কোনো গ্রামে ঈদোৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে বিচিত্রা অনুষ্ঠান, ফুটবল খেলা, ষাঁড়ের লড়াই, কুস্তি খেলা, যাত্রাসহ বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। ঈদুল আযহাও একইভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। সামর্থবানরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, খাসি কোরবানি দিয়ে থাকেন এবং নিয়মানুযায়ী কোরবানীর মাংস আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র মানুষের মাঝে বন্টন করে থাকেন।

www.pathagar.com

৬. দুর্গোৎসব

দুর্গা পূজা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সুনামগঞ্জের সবকটি উপজেলায় সর্বজনীনভাবে এই পূজা হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ পারিবারিকভাবেও এ পূজা করে থাকেন। হিন্দু ধর্মালম্বীদের এটিই সবচেয়ে বড় উৎসব হওয়ায় একে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আনন্দ-আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা, সুদৃশ্য মণ্ডপ নির্মাণ, পূজা মণ্ডপের সামনে ঢপযাত্রা, বাউলগানের আসর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয় পূজা কমিটির পক্ষ থেকে। এতে ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আনন্দ-আয়োজনে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা অংশ নিয়ে সম্প্রতির বন্ধন তৈরি করেন।

৭. জাতীয় দিবস পালন

দেশের অনান্য অঞ্চলের মতোই যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মাধ্যমে সুনামগঞ্জে জাতীয় দিবস পালন করা হয়ে থাকে। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ দিবস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত দিবস (জাতীয় শোক দিবস) পালন করা হয়ে থাকে। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে শারীরিক কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে, নাটক-নাটিকা মঞ্চায়ন, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, দেশাত্ববোধক গানের আয়োজন এবং আলোচনাসভা পালিত হয়। এছাড়া শহিদ দিবসে নগ্ন পায়ে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ এবং জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কালো ব্যাজ ধারণ ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যে পালন করা হয়ে থাকে।

৮. মহররম আশুরা

আরবি চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাসটিই হচ্ছে মহররম মাস। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ৬৮০ সালে এ মাসের ১০ তারিখ কারবালা প্রান্তরে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন মর্মান্তিকভাবে শহিদ হয়েছিলেন। এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা সুনামগঞ্জ জেলায় পালন করে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় মহররম মাসের ১ তারিখ থেকে জারিগানের দল বসে। অনেক মহিলাদের নফল রোজা রাখতেও দেখা যায়। রোজা শেষে এ সময়টাতে অনেককেই নিরামিষ আহার করতে দেখা যায়। এটি মূলত মাজারকেন্দ্রিকভাবে বেশি পালিত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে মাজারে জারি-মার্সিয়া পরিবেশন করে থাকেন আগতরা। মহররম উপলক্ষে লাঠিখেলাও অনুষ্ঠিত হয়।

৯. অষ্টমী স্নান

সুনামগঞ্জের সুরমা নদী, কালনী নদী, দাড়াইন নদী, যাদুকাটা নদীসহ কয়েকটি নদীতে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী স্নানের প্রচলন রয়েছে। হিন্দু ধর্মালম্বীরা পূণ্যের আশায় কিংবা মানত পূরণের আশায় এ স্নান করে থাকেন।

www.pathagar.com

লোকমেলা

রৌয়াইল মেলা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের রৌয়াইল গ্রামে শত বছর ধরে চলছে ঐতিহ্যবাহী রৌয়াইল মেলা। প্রতি বছরের ১৩ ফাল্গুন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় মাটির তৈরি জিনিসপত্র-হাড়ি-পাতিল, বাঁশ ও বেতের সামগ্রীসহ নানা কুটিরশিল্প, লৌহশিল্প, মিষ্টি, বাচ্চাদের খেলনা, কাপড়, প্লাস্টিকসামগ্রী, নারীদের প্রসাধন দ্রব্য, কাঠের আসবাবপত্রসহ নানা সামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়।

সোমেশ্বরী মেলা

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার দাড়াইন নদীর ধারে সবুজ-শ্যামল ছোট্ট গ্রাম বাহাড়ার পাশেই প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে 'সোমেশ্বরী মেলা'র প্রচলন। হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে পুণ্যার্জনের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে সোমেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণ।

সোমেশ্বরী মেলার উৎপত্তি বিষয়ে জানা যায়, ভাটি এলাকার কৃষকেরা বছরে একবারই ফসল ফলাতেন। সেটা হচ্ছে বোরো ধান। সেই খেতের ফসলের উপর নির্ভর করেই সারা বছর খাদ্যসহ খরচ জুগাত।

কিন্তু আগাম বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে প্রায় বছরই সেই ফসল হয় পানিতে তলিয়ে যেত নতুবা বিনষ্ট হতো। এমনই একসময়ে বাহাড়া গ্রামের এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশের নলখাগড়ার বনে নল কাটতে গিয়ে একটি শিলা (পাথর) দেখতে পান। ওই ব্যক্তিটি নল কাটার সুবিধার্থে পাথরটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন পাথরের উপরে রেখে নল কাটার সময়ে দায়ের আঘাতে পাথরটি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যায়। ভেঙে যাওয়া পাথরের অংশ দিয়ে তাৎক্ষণিক রক্ত বেরোতে থাকলে লোকটি ভয় পেয়ে যান। ওই রাতেই ব্যক্তিটি স্বপ্নে দেখেন—ভাঙা পাথরটি হচ্ছেন সোমেশ্বরী দেবী। সেই দেবীকে গ্রামের পাশে স্থাপন করে পূজা-অর্চনা করতে হবে। এ স্বপ্নের কথা তিনি গ্রামবাসীকে জানালে সবাই মিলে গ্রামের পাশের একটি উঁচু স্থানে পাথরটি স্থাপন করেন।

সেই থেকেই পাথরখণ্ডটি 'সোমেশ্বরী দেবী' রূপে হিন্দু ধর্মলম্বীদের কাছে পূজিত হয়ে আসছে। পাথরখণ্ডটিকে গ্রামের লোকেরা 'সোমেশ্বরী দেবীর শিলা' আখ্যা দিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করেন। মানুষজন অকাল বন্যা ও শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে সোমেশ্বরী দেবীর দারস্থ হয়ে মানত করতে থাকেন। ধীরে ধীরে সে খবর ভাটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পুণ্যার্থীদের বিস্তৃতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবেই শুরু। এখন সেই সোমেশ্বরী প্রাঙ্গণ তীর্থ হিসেবে রূপ পেয়েছে।

www.pathagar.com

সোমেশ্বরী মেলা যে দেবীর স্মরণে পালিত হয়ে আসছে, সেই দেবীর বিগ্রহ হচ্ছে বেশকিছু পাথরখণ্ড। শাল্লার আদি গ্রাম বাহাড়ার পাশে ছোট্ট ছোট্ট গোটা চল্লিশেক পাথরখণ্ড তার শরীরে সিঁদুর ধারণ করে গ্রামীণ সহজ-সরল মানুষের লৌকিক ইতিহাস ও বিশ্বাসের সাক্ষী হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাটি অঞ্চলের মানুষেরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রতি শুক্র ও সোমবার পাথরখণ্ডে দুধ ঢেলে স্নান করিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে দেন। কত শত মানুষ সেই পাথরখণ্ডের কাছে হাতজোড় করে মানত করছেন। এখানে দাঁড়িয়ে কায়মানোবাক্যে মনের দুঃখ জানাচ্ছেন লৌকিক দেবী সোমেশ্বরীর কাছে। জীবনযুদ্ধে না-পাওয়ার বেদনা ও হতাশায় আকীর্ণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস এখানে প্রতিনিয়ত জমা হচ্ছে। তাঁরা উদ্ধারের আশায় পরম ভক্তিভরে সোমেশ্বরীর কাছে পরিত্রাণ চান।

সেটা তো লৌকিক দেবী সোমেশ্বরীর এক রূপ। অন্য আরেক রূপ রয়েছে। সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় প্রতি চৈত্র মাসের রবি ও সোমবার। এ দুইদিন এখানে মেলা বসে। স্থানীয় অনেকে আবার মেলাকে 'বান্নি' বলে থাকেন। দুই দিনব্যাপী মেলার প্রথম দিন বসে 'বেল-কুইশ্যালের মেলা'।

এই মেলায় কেবল বেল ও ইক্ষু বিক্রি হয়। সেই মেলাস্থলটি হচ্ছে সোমেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে যাওয়ার সামান্য আগে। দাড়াইন নদীর পাড়ে এই মেলা বসে। শত শত পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা বেল ও ইক্ষু নিয়ে বসে থাকেন। প্রতি আঁটি (এক আঁটিতে অন্তত ১২-১৫টি ইক্ষু থাকে) ইক্ষু বিক্রি হয় ৫০ থেকে ১৪০ টাকায় এবং প্রতি হালি বেল বিক্রি হয় ৪০ থেকে ১৫০ টাকায়। পরের দিন সোমবার সোমেশ্বরী প্রাঙ্গণে বসে বারোয়ারি মেলা। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য জিনিস—হরেক রকমের জিনিস মেলে সেই মেলায়।

উপমহাদেশের অন্যতম এই বৃহৎ মেলায় ভাটি অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটত একসময়। তবে মেলা ধীরে ধীরে বৈচিত্র্য হারাচ্ছে, মানুষের সমাগমও কমছে। কমতে কমতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে—এখন মানুষ হাজার পঞ্চাশেক হয় কিনা সন্দেহ! আমাদের শৈশবে এই মেলাই ছিল উচ্ছ্বাস প্রকাশের অন্যতম ক্ষেত্র।

দক্ষিণা কালীকা দেবীর পূজা ও ধর্মীয় মেলা

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার সাউধ্রেশ্রী গ্রামে প্রতি বাংলা বছরের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দক্ষিণা কালকী দেবীর পূজা উপলক্ষে ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় মেলা হলেও গ্রামীণ মেলার পুরো আবহই এ মেলায় পাওয়া যায়।

অদ্বৈতাচার্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে মেলা

অদ্বৈতাচার্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় মাঘ মাসের ১১ তারিখ অদ্বৈতাচার্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মীয় মেলা

সুনামগঞ্জের বিশম্ভরপুর উপজেলায় শ্রীমৎ অদ্বৈত জয়ন্তী উপলক্ষে ১১ মাঘ ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

মহিলাদের বারুণী

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার বাহাড়া গ্রামের পাশে প্রতি চৈত্র মাসের শেষ শুক্রবার নারীদের বারুণী হয়ে থাকে। কয়েকশ বছর ধরে এ মেলার প্রচলন। এই মেলাটি 'বেট্টিনরার মেলা' নামেও সুপরিচিত। মেলায় নারীদের নানা ব্যবহার্য সামগ্রী ছাড়াও মিষ্টিজাত দ্রব্য, শিশুদের খেলনা, মাটির তৈরি হাড়ি-পাতিল, লৌহসামগ্রীসহ নানা উপকরণ কিনতে পাওয়া যায়।

খাগাউড়া মেলা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়নের খাগাউড়া গ্রামে ১০ ফাল্গুন বসে তিন দিনব্যাপী মেলা। পাঠাবলি, লুটসহ নানা ধর্মীয় উৎসবাদি এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া গৃহস্থালি জিনিসপত্র থেকে শুরু করে মিষ্টি, মাছ, মৃৎশিল্প, শিশুতোষ খেলনা, কুটিরশিল্পসহ নানা উপকরণ মেলায় কিনতে পাওয়া যায়। চিত্তবিনোদনেরও বিরাট সমাহার বসে মেলায়।

ধলমেলা

পরমেশ্বরী দেবীর পূর্জা-অর্চনাকে কেন্দ্র করে কয়েকশ বছর আগে ধলমেলা শুরু হয়েছিল। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার তাড়ল ইউনিয়নের ধলগ্রামের পাশে প্রতি বছরের ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মেলায় নানা উপকরণের পাশাপাশি সার্কাস, ওপেন্টি বায়োস্কোপ প্রদর্শনসহ চিত্তবিনোদনের নানা আয়োজন থাকে। এ মেলার কাহিনিকে উপলক্ষ করে প্রয়াত বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম ১৯৯০ সালে *ধলমেলা* শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। করিমের এ পুস্তিকা প্রকাশের সুবাদে মেলাটি দেশ-বিদেশে বাংলা ভাষাভাষী বোদ্ধামহলে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করে।

হোমাই ঠাকুরের মেলা

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার আনন্দপুর গ্রামের পাশে হোমাই ঠাকুরের মন্দিরকে কেন্দ্র করে কয়েকশ বছর ধরে একটি গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শেষ সোমবার এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাওর অঞ্চলের অন্যতম এই বৃহৎ মেলাকে কেন্দ্র করে ওইদিনটি মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। মেলাকে উপলক্ষে করে বাড়িতে-বাড়িতে 'নাইওরি' আগমনের ঘটনাও ঘটে।

www.pathagar.com

লোকাচার

বাঙালির আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। হাওরেও নানা উৎসব-পার্বণে নানা ধরনের আচার-সংস্কৃতি ঘটা করে আবহমানকাল ধরে পালিত হয়ে আসছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ধর্মীয়-সামাজিক রীতিনীতিসহ জীবন-জীবিকায় সাথে সম্পর্কিত নানা পার্বণে এসব আচার-অনুষ্ঠান লালন করে আসছেন। দেবদেবী, পীর, প্রকৃতি এবং অতিপ্রাকৃত নানা শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে লোকধর্মকেন্দ্রিক নানা আচার-সংস্কৃতি এখন লোক আচার-অনুষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত এ-রকম কিছু আচার-অনুষ্ঠান নিম্নরূপ :

১. কল্কী নারায়ণের পূজা

কল্কী নারায়ণ পূজা সুনামগঞ্জের হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ঘট, ফুল, দূর্বা, গন্ধ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে আসন সাজিয়ে এ পূজা করতে হয়। কল্কী নারায়ণ পূজায় গাঁজা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। এর বাইরে পূজা আয়োজনকারী সাধ্য অনুযায়ী পান, সুপারি, ফল, মিষ্টি, মুড়ি-বাতাসা রেখে থাকেন। মূলত নিশ্চুপ হয়ে শব্দহীন গাঁজার কলকে টান দেওয়ার বিষয়টিকে ঘিরেই এ পূজার উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। এটিকে ত্রিনাথের পূজা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে উৎসর্গ করেই এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেবল পুরুষেরা এ পূজায় অংশ নেন। এ পূজায় পাঁচালি পাঠের রেওয়াজ রয়েছে। কল্কী নারায়ণের পূজায় পাঁচালি হিসেবে ভরতচন্দ্র সরকারের লেখা একটি পাণ্ডুলিপি সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়ে আসছে। লেখকের বাড়ি-গ্রাম: বিষ্ণুপুর, ডাকঘর : কাদিরগঞ্জ, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ। সংগৃহীত এ পাঁচালিটি নিম্নরূপ :

পয়ার

দেবোত্তম কল্কীদেব কহে নরগণ,
নমঃ অভ্য নমো নমঃ কল্কী নারায়ন।
কলির যুগে এলেন প্রভু হয়ে অবতার,
পাঁচালী প্রবন্ধে লিখি মহিমা তোমার।
হীনবুদ্ধি অল্পমতি আমি অভাজন,
ভুলত্রুটি ক্ষম প্রভু কল্কী নারায়ন।
সাধ্য কি লিখিতে আমার বিদ্যা বুদ্ধিহীন,
তব পদে মতি যেন থাকে চিরদিন।
ছাড়িয়া এসব কথা তবনাম স্মরি,
কল্কী নারায়ন প্রীতে বলো হরি হরি।
একদিন কল্কী দেব ব্রাহ্মণ রূপ ধরি,

www.pathagar.com

যাইতে লাগিলেন প্রভু ভ্রমণে নগরী।
সম্মুখে দেখিতে পান নদী একটাই,
নৌকা বিনে ওপারেতে যাবার উপায় নাই।
নিশম্ভুর ভাই শম্ভু কুষ্ঠ রোগী ছিল,
পার করো বলিয়া দেব ডাকিতে লাগিল।
শম্ভু বলে কেবা তুমি দেশী না বিদেশী।
রোগী হয়ে কি করিয়ে নৌকা বেয়ে আসি,
বসো তুমি আসুক ভাই আমার সাধ্য নাই,
কুষ্ঠ রোগী হয়ে নৌকা কি করিয়ে বাই
কল্কী নারায়ন বলে শীঘ্র পার করো,
কুষ্ঠ রোগী ভালো হবে আমি দিলে বর।
এই কথা শুনিয়া শম্ভু নৌকাতে উঠিল,
ভাসাইতে নৌকাখানি ভালো হয়ে গেল,
নয়নে দেখিল শম্ভু কল্কীদেব মুড়তী
সদয় হলো কল্কীদেব কুষ্ঠ রোগীর প্রতি,
উঠিল নৌকাতে আসি কল্কী নারায়ন,
জোড় হস্তে কহে শম্ভু তুমি কোন জন।
কল্কী দেব নারায়ন হলো আমার।
ভক্তের বাঞ্চা পরাইতে হলেন অবতার।
মূঢ় পূজা যেবা করে লয় যেবা নাম
সর্বকার্য সিদ্ধি হয় তার পুরে মনস্কাম।
আমার পূজার বিধি বেশি কিছূ নয়,
সকলেই করিতে পায় জানিবে নিশ্চয়।
সাত ছিলিম তামাক আর সাতটি টিক্কা দিয়া
নিমাতে টানিয়া খাবে সাতজনে মিলিয়া।
ফল মিষ্টি যত দ্রব্য বেজোড় রাখিবে
যে জনার ভুল হয়ে পূজা মানি লবে।
একজনে সাজাবে সব এক মন হইয়া
কল্কী সাজাবে তামাকে সপ্ত টিক্কা দিয়া।
একজনার পর আরেক জন খাবে সাতটান করিয়া,
যে জনার হয় ভুল পূজা লও মানিয়া।
প্রথম জনে নামাইবে ভুষি প্রসাদ দিয়ে
ধ্বনি দিবে সবে মিলে পূজা শেষ করিয়ে।
ঘট জল ছিটাইবে সব ভক্তগণে
এই হলো পূজার বিধান বলবে জনে জনে।
ভক্তি ভাবে যেই জনে মোর পূজা করে,
অলক্ষ্মী ছাড়িয়া তার লক্ষ্মী আসে ঘরে।
একথা শুনিয়া শম্ভু ষষ্টাঙ্গে পড়িয়া

www.pathagar.com

কল্কী দেব করিতে পূজা লইল মানিয়া
ওপারে উঠিয়া দেব অদৃশ্য হইল
খানিক্ষণ পরে নিশম্ভু ঘাটেতে আসিল।
শম্ভু দেখে খেওয়া দিচ্ছে এ কি ব্যাপার হলো।
কি করিয়ে কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে গেল।
শম্ভু কহে নিশম্ভুরে অলৌকিক ঘটনা,
কল্কী নারায়ন নামে এল একজনা।
তাহার বরেতে ভাইরে ভালো হয়ে যাই।
সত্য সত্য বলি আমি কল্কী দেব গোঁসাই।
চল ভাইরে আজই যেয়ে পূজা করি তার
ঘরে ঘরে কল্কী দেবের পূজা হোক প্রচার,
বাড়ি যেয়ে দুই ভাই মিলি পূজা আরম্ভিল
গ্রামের শতেক লোক নিমন্ত্রণ করিল।
শুনিয়া দেশের লোক আশ্চর্য হইল,
কি করিয়া কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে গেল।
সন্ধ্যা বেলা দুই ভাই মিলে পূজা আর ছিল,
গ্রামের যত মেয়ে ছেলে সকলে আসিল।
আরেক গ্রামের অন্ধ ঐ গ্রামেতে আতুর আরেক জন,
বাকি মাত্র রয়ে গেল ওরা দুইজন,
পাশাপাশি ওরা ছিল দুই ঘরে দুইজন,
এদের যেতে মনে আবার হলো আকিঞ্চন।
ঠেস ঠাক্করে গেল অন্ধ আতুরের ঠাঁই।
আতুরকে যাইয়া বলে চল মোরা যাই।
আতুর বলে অন্ধ ভাইরে যাবার সাধ্য নাই,
সর্বাঙ্গ গলিতে মোর পরের হাতে খাই
অন্ধে বলে কাঁধে উঠ পথ দেখাবে তুমি,
কল্কী দেব নাম নিয়ে হেঁটে চলব আমি।
কল্কী দেব নাম নিয়া ওরা যে চলিল
পূজা বাড়ি গিয়ে দুজন ভালো হয়ে গেল।
বিস্ময় ভাবিল লোকে দেখিয়ে ঘটনা,
কল্কী দেবের কৃপায় ভালো ওরা দুইজনা,
বিশ্বাস হইল লোকের কল্কী দেবের প্রতি,
আগ্রাহে প্রসাদ খেল দিয়ে শক্ত ভক্তি।
দীনহীন ভরত অন্ধ হয়েছি জগতে,
কোন দেব কৃপায় ভালো পারলেম না হইতে।
আরো এক ঘটনা বলি শুন সাধু ভাই,
গরিব এক ব্রাহ্মণ বেটা হারাইয়াছে গাই।
ঘরে আছে ব্রাহ্মণী তার আর আছে পুত্রবধূ,

www.pathagar.com

মাতাপুত্র বউ শ্বাশুড়ি ঝগড়া করে শুধু।
গাই খুঁজিতে ব্রাহ্মণ বেটা মাঠে মাঠে ঘুরে,
ব্রাহ্মণীর দুঃখ বলি লাচাড়ির সুরে।

লাচাড়ি

কান্দে ব্রাহ্মণী শুনি বিলাপ করিয়া ধ্বনি
হারাইয়ে সাধের গাই বাছুরী।
ব্রহ্মণনা এল বিধি জানি কি করিল,
এখন আমি উপায় কি যে করি,
পুত্রবধূ কয় না কথা বধূ খেল ছেলের মাথা
দিবানিশি থাকে দরবার ঘরে।
ছেলে থাকে বধূর মতে পারি না আর বধূর সাথে।
কি ভেজাল ঘটিল মোর সংসারে।
খুঁজে ব্রাহ্মণ দিনমান না পেয়ে গাভীর সন্ধান
শেষে দেখা রাখাল গণ সনে।
দেখে রাখালগণ সবে পূজে কল্কী নারায়ন দেবে
পয়ারেতে নরেন চন্দ্র বলে।

পয়ার

পূজা সারি রাখাল ঘন কহিল ব্রাহ্মণে
কি কারণে দ্বিজ তুমি আসিলে এখানে।
ব্রাহ্মল কহিল এক গাভী হারাইল,
খুঁজিলাম নান স্থানে কোথায় না মিলিল।
রাখালগণ কহ শুন দ্বিজ মহাশয়,
কল্কীদেবের পূজা মানো পাইবে নিশ্চয়।
একথা শুনিয়া দ্বিজ মানস করিল,
একটু খানে দূরে গিয়া গাভীটি পাইল।
হরষিত দ্বিজবর গাভীটি পাইয়া,
কিসের কল্কী নারায়ন গিয়াছে ভুলিয়া।
গাভীটি রাখিয়া সে যায় হুক্কাতে জল ভরে
পাশের এক বাড়িতে হেল সে আগুন আনার তরে
এরই মধ্যে গাভী আবার গেল যে হারিয়া
হুক্কা চুঙ্গা নিয়া আবার ছুটিল দৌড়িয়া।
পড়িল ব্রাহ্মণ বেটা বিষম বিপাকে,
বলে হারাইনু গাভী আমার এসালার তামাকে।
আবার সে যাইয়া বলে রাখালগণ ঠাই,
পাইয়া গাভীটি হারাই আগুন আনতে ভাই।
রাখালগণ কহে ব্রাহ্মণ একি বিশ্বাস হয়,
কল্কীদেব অবহেলা করছে নিশ্চয়।

www.pathagar.com

সত্য কথা কহি শুন ওহে রাখালগণ,
সত্যি হেলা করিয়াছি কল্কী নারায়ন
যজ্ঞ সুত্র ধরে আমি প্রতিজ্ঞা করো যাই
বাড়ি যাইয়া করব পূজা যদি গাভী পাই।
এ কথা বলিয়া ঠাকুর কিছু দূর গিয়া
দেখিতে পায় ঐ গাভী খায় বাছুরী লইয়া
গাভী পেয়ে ব্রাহ্মণের আরো বিশ্বাস হলো
বেলা শেষে গাভী নিয়া বাড়ি চলে গেল।
পুত্র আর পুত্রবধু ডাকিতে লাগিল।
মা দেখে যাও গাভী নয়া বাবা যে আসিল।
বাপ বলিয়া পুত্রবধু ডাকে না তখন
কল্কীদেব বুঝি বধুর ফিরাইয়াছে মন।
পুত্রকে ডাকিয়া দ্বিজ নিমন্ত্রণ করায়
আসিল পাড়ার সব কল্কিদেব পূজায়
সকলি কহিল ঠাকুর পূজা করার ত্বরে
হারাইল মিলে পণ্য কল্কী দেবের ঘরে
নয়নে দেখিল সবে কল্কী দেবের পূজা।
অল্প পয়সায় হয়ে যায় একবারে সোজা
প্রচার হলো বাড়ি বাড়ি দেশ দেশান্তরে
সত্য ভাবি পূজা এখন করে ঘরে ঘরে
ভরত চন্দ্র দাস বলে ভাই ভগ্নি সকলি
আরও এক ঘটনা আমি সংক্ষেপে বলি।
সুধারাম নামে দ্বিজ ছিল একজন
ভিন্ন গ্রামে গিয়ে ছিল শ্রাদ্ধরেই কারণে।
ফেরার পথে দ্বিজ বর সন্ধ্যা বেলায় প্রায়
উঠিল এক শিষ্যের বাড়ি তামাকের নেশায়
সে বাড়িতে ছিল সেদিন কল্কী দেব পূজা
তামাক দেবলিয়া ঠাকুর নামাইল বোঝা।
নিমাতে বসিয়া তামাক টানছে সপ্তজনে
কেউ দেয় না ডাকিলে উত্তর ব্রাহ্মণের সনে
উষ্ঠা মেরে ফেলে দিল ভোগ দ্রব্য সকল
আমার হতে পূজা বড় ওরে মূর্খের দল।
গালাগালি করে ঠাকুর বাড়িতে আসিল
খেয়ে দেয়ে সুধারাম আরামে ঘুমালো।
প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ ডাকে ব্রাহ্মণীরে
ঠেলিলে নড়ে না কেহ আছে যেন মরে
চিৎকার মারে সুধারাম আতংকিত হইয়া
মানুষ গরু যে যেখানে আছে যে ডলিয়া।

www.pathagar.com

আসিয়া পাড়ার লোক কহিতে লাগিল
না জানি কোন পাপ ঠাকুর কোথায় করে এল।
সুধারাম কহে এক পাপ করিয়াছি
কালকে যে এক শিষ্যের পূজা পায়ে দলিয়াছি।
না জানিয়া তাদের পূজা করি লণ্ডভণ্ড
সে কারণে মোর ঘরে মহামারী কাণ্ড।
বেহুসের মতো ব্রাহ্মণ গেল তাদের বাড়ি
কহিতে লাগিল ঠাকুর সব প্রকাশ করি।
পূজা মানি শ্রীঘ্র যাও ঘটজল নিয়া
সকলকে ছিটিয়ে দেও কল্কীদেব স্মরিয়া
মাথায় করি ঘটজল প্রমাণ করিয়া
বাড়ি আসি দিল জল সবাইকে ছিটাইয়া
জাগিয়া উঠিল সব কল্কী দেব কৃপায়
পুত্রহীনের পুত্র হয় হারাইলে ধন পায়
মন প্রাণে যেবা পূজে কল্কী নারায়ণ
দিনে দিনে বাড়ে কার পুত্র ধনজন।
ভরত চন্দ্র দাস রচে কল্কীদেবের পাঁচালী
মুনিলে হয় পাপ ক্ষয় দুঃখ যায় চলি
দীনহীন ভরত অন্ধের এই নিবেদন
ভুল ত্রুটি ক্ষমা প্রভু কল্কী নারায়ণ
সংক্ষেপে করি শেষ পদে ভক্তি করি
কল্কী নারায়ন প্রীতে বল হরি হরি
হরি বল হরি বল, হরি বল।
ওঁ নারায়নং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবী সরস্বতী বঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ।

ধ্যান

সজল জল দোহা বাতবেগৈক দেহ
বর ধৃত কর বালঃ সর্বলোকৈক পালঃ
কলিযুগ বল হন্তা সত্য ধর্ম প্রণেতা
কলয়তু কুশলং বঃ রঙ্গ সভুপ।

প্রমাণ

নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতাচয়চ
জগদ্বিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

বন্দনা

করজোড়ে করি স্তব বন্দি গন পতিদেব তাহার চরণেতে প্রণাম। সর্ব্ব দেব পূজা, শিবসুত চর্তুভূজী করে সদা তজ জপ ধান। তবে পতা বন্দি শিব, নিস্তার কারণ জীব, শাস্ত্র কর্তা সৃষ্টি ঈশ্বর। বন্দিব তাহার দয়া জগত মোহিনী তারা তার পদে

মন রহুক মোর। তবে বন্দি নারায়ন গোপিকার প্রানধন লক্ষ্মী মাতা বন্দির সদসের। তবে বন্দির সরস্বতী দহে দান কবিরতি, এই বর মাগি মা তোমারো। রাধিকা রুক্সিনী রমা তাবে বন্দি সত্য তামা, বাল্মিকী নারদ আদিমণি। ভ্রাতা আদি দেব যত সবারে করিয়া নত, বন্দি মাতা হরের ঘরনী। বন্দনা বন্দিতে ভরত কর কাতরে নিবাস মোর বিষ্ণুপুরে সদা প্রভু রাখুন সুস্থিরে।

২. শনি দেবের পূজা

শনি হচ্ছে অশুভ শক্তি। এ শক্তি মানুষের পেছনে লাগলে জীবনে নানা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সুনামগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে কোনো মানুষের একের পর এক ক্ষতি হতে থাকলে তাঁর পেছনে শনি লেগেছে বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য শনি দেবের পূজা করে থাকেন ওই ব্যক্তি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা এ ধর্মবিশ্বাস থেকে প্রতি শনিবার এ পূজার আয়োজন করে থাকেন। নারীরা এ পূজা করে থাকেন এবং পুরুষেরা পূজায় অংশ নেন। শনি পূজার সময়ও পাঁচালি পাঠ করা হয়। পাঁচালি পাঠ ও পূজার রীতিনীতি নিয়ে একটি বহুল প্রচলিত পুস্তিকা সুনামগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে ধর্মপ্রাণ নারীদের কাছে পাওয়া যায়। দিলীপ রায়ের সংগৃহীত ও সম্পাদিত এ পুস্তিকাটিতে উল্লেখিত পাঁচালি নিম্নরূপ :

বন্দনা

নমঃ শ্রীগণেশায় নমঃ
নমঃ নারায়ণং নমস্কৃতং নরোশ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততোজয়মুদিরয়েৎ ॥
বেদে রামায়ণশ্চৈব পুরাণে ভারতে স্তথা।
আদৌ চন্দ্রে চ অন্তেচ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্র গীয়তে ॥
নমঃ নারায়ায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ নমঃ ॥
বন্দি দেব গজানন পার্বতী নন্দন।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আর দেবগণ ॥
সর্ববিঘ্ন নাশ হয় তোমায় শরণে।
অগ্রেতে তোমার পূজা করি যতনে ॥
আদিদেব নিরঞ্জন ক্ষীরোদ শয়ন।
বন্দিলাম ভূমি লুণ্ঠিত তাঁহার চরণ ॥
যাঁহার হুঙ্কারে সৃষ্টি এই ত্রিভুবন।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ ॥
ত্রিনয়নী তাহার বন্দিনু চরণ।
বেদমাতা সরস্বতী লইনু শরণ ॥
বন্দিলাম করজোড়ে পদ কমলার।
বৃন্দাবনে বন্দিলাম রাধা শক্তিকার ॥
সকলের পাদপদ্মে করিলাম নতি।
সূর্যপুত্র শনৈশ্বর কহিব ভারতী ॥
যাঁহার শরণে হয় সর্বদুঃখ ক্ষয়।

www.pathagar.com

যাঁহার শরণে গৃহে লক্ষ্মী স্থায়ী রয় ॥
তাঁহার চরিত্রগুণ করিব বর্ণন।
সকলেতে মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥
স্কন্দপুরাণেতে লিখেছেন মুনিবর।
শনির চরিত্র গুণ অতি মনোহর ॥
জপ-তপ-উপচারে যেই পূজা করে।
সেইজন সুখী হয় শনৈশ্চর বরে ॥
অপুত্র হইলে তার পুত্র জন্মে ঘরে।
সর্বসুখে সুখী হয় সেই শনিবারে ॥
সেবক লিখিল গ্রন্থ করিয়া সন্ধান।
শনির পাঁচালি কথা পুরাণ আখ্যান ॥

ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

শ্রীহরি নামেতে এক ছিল বিপ্রবর।
করিতে ব্রাহ্মণ সেবা ছিল মন তাঁর ॥
নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পূরণ।
তাহাতে দ্বিজ সেবাও হয় অনুক্ষণ ॥
বিনা চিন্তামনি চিন্তা, অন্য চিন্তা নাই।
কেমনে সে চিন্তামনি চিনিবারে পাই ॥
অন্তরে সদাই সুখি অন্ন নাই পেটে।
তথাপি কৃষ্ণের নাম লয় অকপটে ॥
হেনকালে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
হেরিয়া তাহার মুখ আনন্দে ভাসিল ॥
হরিদাস পুত্র নাম রাখিল ব্রাহ্মণ।
পাঠশালে দেন তারে করিতে পঠন ॥
হরিদাস সুশীল সকলে গুণ গায়।
অল্পদিন মাঝে সে শিখে সমুদয় ॥
শাস্ত্রজ্ঞ হইল ক্রমে শাস্ত্র আলোচনে।
পণ্ডিত বলিয়া তারে সকলেই গণে ॥
কিন্তু তার কিছুতেই নাই অন্য মতি।
সদা চিন্তা কিসে পাবে কমলার পতি ॥
সকল বিদ্যায় ক্রমে হইলে নিপুণ।
চারদিকে সকলেতে গায় তার গুণ ॥
কালেতে সকলি হয় কে করে খণ্ডন।
পড়িল শনির দৃষ্টি দ্বিজের নন্দন ॥
শনিতে হরিল বল, বুদ্ধি গেল দূরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্বিজ গেল বহু দূরে ॥
যে দশাতে আপনি পড়িয়া ভগবান।

www.pathagar.com

গণ্ডকীতে শীলাকাটি পাইলেক ত্রাণ ॥
চতুর্দশ বর্ষ যে শিলা কাটিছিল।
শালগ্রামে তাহাতে শিলা নাম হৈল ॥
ইন্দ্র অঙ্গে বগের যে চিহ্ন হয়েছিল।
সেই শনি কোপে পড়ে ভ্রমিতে লাগিল ॥
বিদর্ভ নগরে গিয়ে হলো উপনীত।
আশ্চর্য হইল দেখি রাজার চরিত ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান

সেখানে রাজা হয় শ্রীবৎস ভূপতি।
সর্বগুণে গুণাকর সদা ধর্মে মতি ॥
তাঁহার সভায় দ্বিজ হলো উপনীত।
অভ্যর্থনা করে রাজা হয়ে হরষিত ॥
কোথায় নিবাস বলি কহ নরপতি।
কোন বংশে জাত হও বল হে সম্প্রতি ॥
শুনিয়া দ্বিজের পুত্র কহে সমাচার।
হরিদাস নাম ধরি সাধু ব্যবহার ॥
অতি দীন দুঃখী আমি নাহি পিতামাতা।
স্বদেশে বিদেশে থাকি যাই যথা তথা ॥
বাতুলের প্রায় আমি ভ্রমি দেশে দেশে।
জীবন ধারণ করি অতি কায় ক্লেশে ॥
শ্রীবৎস বলেন দ্বিজ চিন্তা পরিহর।
আমার আলয় থাকি মোরে কৃপা কর ॥
শাস্ত্রেতে নিপুণ তুমি বুঝি অনুমানে।
আমারে করহ তুষ্ট বাক্যের সন্ধ্যানে ॥
আমার আছয়ে দুই যুগল নন্দন।
তব স্থানে পড়াইব এই আকিঞ্চন ॥
কোন কষ্ট নাহি তার সদা সুখে রয়।
রাজপণ্ডিত বলি লোক হলো পরিচয় ॥
মিষ্টভাষী সদা করে মিষ্ট আলাপন।
নৃপতির পুত্রদ্বয় করে অধ্যয়ন ॥
এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত।
বালকের বেশে শনি হইল উপনীত ॥
হরিদাস নিকটেতে দিল দরশন।
পড়ুয়ার মত শনি চিনে কোন জন ॥
চিনিতে নারিল দ্বিজ শনির ছলনা।
শনির রূপেতে মন হইল মগনা ॥
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবর কহ বাছাধন।

www.pathagar.com

কোন কার্য হেতু তব হলো আগমন ॥
শনি বলে মহাশয় কর অবধান।
পড়িতে আইনু আমি তোমা বিদ্যমান ॥
বিপ্র বলে যথাসুখে কর বিদ্যাভাস।
যত্নের সহিত তোমায় পড়াব বিশেষ ॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য সন্তুষ্ট হইল।
তাহার নিকটে শনি পড়িতে লাগিল ॥
ব্যাকরণ স্মৃতি কাব্য সাঙ্খ্য দরশন।
অল্পদিন মধ্যে সব কৈল অধ্যয়ন ॥
সমস্ত বিদ্যায় নিপুন হইল মনি।
বিপৃবর পরিচয় চাইল তখনি ॥
শনি বলে কিবা নিজ পরিচয়।
শনৈশ্চর নাম মম সূর্যের তনয় ॥
শুনিয়া তাঁহার বাক্য বিপ্রবর কয়।
বড় সৌভাগ্য আমার শুনি পরিচয় ॥
গ্রহের প্রধান তুমি মান্য দেবতা।
আমারে করিলে কৃপা কি কহিব আর ॥
যদি হে প্রসন্ন দেব হলে আমা পরে।
কিসে কষ্ট দূর মম হইবার পারে ॥
তাহার সন্ধান কথা কহ দেখি শুনি।
ব্যথায় ব্যথিত বড় আকুল পরাণি ॥
আমার রাশিতে আছে তোমার কটাক্ষ।
কিসে যাবে বল দেখি হইয়া সপক্ষ ॥
শনি বলে বলি তব শুন মহাশয়।
মম ভোগ দশ বর্ষ কাল মাত্র রয় ॥
আর অবশিষ্ট ভোগ দশ মাস আছে।
দশদণ্ড যাবে না আসিবে পাছে ॥
সেই দশদণ্ড তুমি পাবে অতিকষ্ট।
পশ্চাতে যাইলে ক্লেশ ঘুচিবে অরিষ্ট ॥
সপ্তম দিবসে গিয়ে ভাগীরথী তীরে।
এক মনে এক ধ্যানে ভজ মুরারিরে ॥
মম কোপ হতে পাবে অবশ্যই মুক্তি।
কহিলাম সত্য আমি এই স্থির যুক্তি ॥
এতবলি শনিদেব হলো অন্তর্দ্ধান।
আর না দেখিতে পায় বিপ্রের সন্তান ॥
শনি আজ্ঞা মত পরে গিয়া গঙ্গাতীরে।
একমনে নারায়ণ বসে ভজিবারে ॥
দশদণ্ড পূর্ণ হইল হেন জ্ঞান করি।

www.pathagar.com

উঠিয়া দাঁড়ায় বলি শ্রীহরি শ্রীহরি ॥
দশদণ্ড পূর্ণ নহে দেখিল যখন।
নয়ন মুদিয়া পুনঃ ভজে নারায়ণ ॥
সূর্য-পুত্র মনে কোপাবিষ্ট হলো।
নারায়ণে সাক্ষী করি তখনি বলিল ॥
আপনার দোষে কষ্ট পাইবে ব্রাহ্মণ।
মম কিবা দোষ ইথে দৈবের ঘটন ॥
আমি যা কৈনু তার কৈল বিপরীত।
বুঝে-পড়ে শাস্তি দিব যা হয় বিহিত ॥
যে দুই রাজার পুত্রে পড়াইতে দ্বিজে।
মায়াকরি দুই পুত্র হরি নিল নিজে ॥
নিজ মায়া মন্ত্রে দুই শিশুমুণ্ড গড়ি।
বিপ্রের নিকটে লয়ে গেল ত্বরা করি ॥
নয়ন মুদিয়া ধ্যান করে দ্বিজবর।
ফেলিয়া দিলেন মুণ্ড উরুর উপর ॥
হেথায় শ্রীবৎস রাজা শয়নেতে ছিল।
পুত্র অমঙ্গল যত স্বপনে দেখিল ॥
স্বপন দেখিয়া রাজা শশব্যস্ত হয়ে।
বিপ্রের নিকটে দ্রুত চলিলেক ধেয়ে ॥
দেখিয়ে বিপ্রের কোলে পুত্র মুণ্ডদ্বয়।
হাহাকার করি রাজা ভূতলে গড়ায় ॥
সেবক কহিছে রাজা কেন হও ভ্রান্ত।
অচিরে পাইবে পুত্র না জান বৃত্তান্ত ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

রাজা অতি দুঃখ মনে শিরে কারাঘাত হানে,
কাঁদিয়া করে হাহাকার।
হায়রে দারুণ বিধি, এই কি হলো বিধি,
প্রাণনিধি করিল সংহার ॥
বিদ্যাবন্ত জন দেখি, তাহারে সাদরে রাখি,
পড়িবারে দিনু যত্ন করি।
হবে পুত্র গুণবান, সুখেতে জুড়াবে প্রাণ,
এই বাঞ্ছা সদা মনে করি ॥
হিতে হলো বিপরীত, বিপ্র হয়ে দস্যুরীত,
আমায় করিল সর্বনাশ।
স্মরিতে বাছার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
ভালো কর্ম করিল প্রকাশ ॥

www.pathagar.com

হেথা অন্তঃপুরে রাণী, একথা শ্রবণে শুনি,
এলে থেলো পাগলিনী প্রায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, নয়ন নীরেতে ভাসে,
বলে মম হৃদি ফেটে যায় ॥
আমি রে ভুজঙ্গফণি তুইরে আমার মনি,
মরি আমি তোমার বিহনে।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, মা মা বলিয়ে ডাক,
শ্রবণে জুড়াইব মন-প্রাণ ॥
কান্দেন শ্রীবৎসরাজ, জীবনেতে কিবা কাজ,
যদি গেল মম পুত্র নিধি।
কোথা বাপ পুত্র ধন, কোলে আয় যাদুধন,
তোর শোকে কান্দি নিরবধি ॥
ক্রোধে হলো অঙ্গ ভারি, আর না সহিতে পারি,
চরে ডাকি দিল অনুমতি।
শুন ওরে চরগণ, কর রে বিপ্রে বন্দন,
কারাগারে রাখহ সম্প্রতি ॥
সেবক কাতরে কন, না কর বিপ্রে নন্দন,
বিপ্র হন সর্বসিদ্ধি দাতা ॥
আজ্ঞামাত্র চরগণ ব্রাহ্মণে বান্ধিল।
গলা ধাক্কা দিয়ে তারে কারাগারে নিল ॥
বিপ্রের নয়ন বারি ঝরে অবিরত।
বলে হায় একি ঘটিল প্রমাদ ॥
শুনিছে আপদ নাশে ভবানী চরণ।
সকল বিপদ হন্তা শ্রীমধুসূদন ॥
রক্ষা কর দয়াময় এ ঘোর সঙ্কটে।
ভূপতির ক্রোধ দেখে মম হৃদি ফাটে ॥
বিদেশে এসেছি আমি নাহি জানি ছল।
এ দুঃখ কহিব আর কাহারে বল ॥
এইরূপে বিপ্রবর কারাগারে কান্দে।
শুনিলে ফাটে হৃদয় কিবা কব ছন্দে ॥
অতঃপর শুন সবে হয়ে একমন।
দশদণ্ড বেলা পূর্ণ হইল যখন ॥
পুত্র শোকে নৃপবর আছেন কাতর।
হেনকালে দুই পুত্র আইল সত্বর ॥
চরণে প্রণাম করি পড়ে লুটাইয়া।
পিতা-মাতা বলি ডাকে ব্যাকুল হইয়া ॥
রাজা বলে কোথা ছিলে অন্ধের নয়ন।
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ ॥

www.pathagar.com

দুই পুত্র বলেছিনু করিয়া শয়ন।
দূতগণে কহে রাজা আনহ ব্রাহ্মণ ॥
ইহার বৃত্তান্ত কথা জানে সেই দ্বিজে।
বিপ্রেরে দিলাম কষ্ট না বুঝিয়া নিজে ॥
আজ্ঞামাত্র দূতগণ আনে বিপ্রবরে।
শীর্ণ কলেবর বিপ্র কান্দেন কাতরে ॥
ভূপতি সে বিপ্রবরে করে নানাস্তুতি।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি মহামতি ॥
না জেনে তোমারে কষ্ট দিলাম যে আমি।
সকলের নিকট আমি হলাম বদনামী ॥
ত্বরায় করহ মম সন্দেহ ভঞ্জন।
কোন শিশু মুণ্ডদ্বয় দেখিনু তখন ॥
বিপ্র কহে মহারাজ করি নিবেদন।
কিছুমাত্র নাহি জানি তাহার কারণ ॥
শনি দোষে কষ্ট পাই ঘটায় প্রমাদ।
শরি সে খেলা ভূপ মম পরিবাদ ॥
সকলি ঈশ্বর ইচ্ছা অঘটন ঘটন।
আর কেন সেই কথা কর উত্থাপন ॥
রাজা বলে সত্য করি মানি।
গ্রহ দোষে নানা কষ্ট ভালোরূপ জানি ॥
যদি হে কখনও হয় শনি দরশন।
পূজিয়ে তাঁহার পদ করি নিবারণ ॥
ষোড়শোপচারে পূঁজি নানা উপচারে।
ভক্তিতে সাধনা করি বিধি ব্যবহারে ॥
বিপ্র বলে মহারাজ স্থির কর মতি।
এখনি জানাব আমি শনি গ্রহ-পতি ॥
এত বলি বিপ্রবর করিল স্তবন।
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি দিল দরশন ॥
শনির চরণে রাজা পড়ে লুটাইয়া।
বহুবিদ স্তব করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
তোমার করিব পূজা করিয়াছি মন।
এ-দাসের অপরাধ কর বিমোচন ॥
তুমি হে গ্রহের শ্রেষ্ঠ দেব শনৈশ্চর।
রাখ মার সবই পার ইচ্ছায় তোমার ॥
আমি অতি নরাধম কি জানি মহিমা।
নিজগুণে কর প্রভু সব দোষ ক্ষমা ॥
তপন তনয় তুমি সর্ব গুণধাম।
তোমায় যে চিনে তার পুরে মনস্কাম ॥

www.pathagar.com

করিব তোমারি পূজা করিয়াছি মন।
অনুগ্রহ করি দেব করহে গ্রহণ ॥
পূজার পদ্ধতি প্রভু কভু নাহি জানি।
নিজ মুখে কহ তাহা জুড়াক হৃদয়মণি ॥
শুনিয়া রাজার স্তব শনিগ্রহ কয়।
ক্ষমিলাম অপরাধ নাহি আর ভয় ॥
পূজার নিয়ম মম শুনহ ভূপতি।
তুমি অতি বুদ্ধিমান সুজ্ঞান সুমতি ॥
আমার বারেতে শুদ্ধ পরিয়া বসন।
করিবে আমার ব্রত হয়ে শুদ্ধ মন ॥
নীলবস্ত্র তিল তৈল লৌহের আসন।
মাষকালাই আদি করিবে আয়োজন ॥
কৃষ্ণবর্ণ ঘট চাই করিতে স্থাপন।
পঞ্চ জাতি ফল ফুলে করিবে অর্চ্চন ॥
দরিদ্র বিধান তার কহিলাম সার।
ভক্তিই প্রধান তার কি কহিব আর ॥
ভক্তি করি যেবা করে আমার পূজন।
ক্ষণমাত্রে হয় তার দুঃখ বিমোচন ॥
পূজা অন্তে করিবেক আমায় প্রণাম।
নবগ্রহ স্তোত্র পাঠে লইবেক নাম ॥
পরেতে প্রসাদ খাবে করিয়া ভক্তি।
পাপ-তাপ যাইবে দূরে পাইবে মুক্তি ॥
রাত্রিতে লইবে প্রসাদ বাসি না করিবে।
অভক্তিতে নিলে পরে প্রমাদ ঘটিবে ॥
আমার পূজাতে যারা করে অনাদর।
চিরকাল দুঃখে তারা হইবে কাতর ॥
এই কথা বলে শনি হলো অন্তর্দ্ধান।
ভক্তিতে করেন রাজা শনির পূজন ॥
প্রতি শনিবারে পূজা করে নরবর।
ধন দিয়া বিপ্রগণের তুষিল অন্তর ॥
ইন্দ্রের অধিক ধন হইল তাঁহার।
সুখের নাহিক সীমা ঐশ্বর্য অপার ॥
শঙ্খপতি সওদাগরের উপাখ্যান।
শনির প্রভাব দেখি এক ডোমনারী।
মানস করিল বহু স্তুতি ভক্তি করি ॥
আমার দুহিতাসহ সাধু সদাগরে।
বিবাহ হইলে শনি পূজিবে সত্বরে ॥
শনির সকল কার্য অতীব অদ্ভুত।

www.pathagar.com

বাণিজ্যে আইল এক সওদাগর সুত ॥
শনি পূজা করিবারে শাশুড়ি কহিল।
বাণিজ্যে পূজিব বলি সাধু চলি গেল ॥
দক্ষিণ রাজার দেশে হলো উপনীত।
বেচাকিনি করে সদা আশা অতিরিক্ত ॥
বহুবিধ লভ্য হয় ধন রত্ন হার।
নাহি পূজে শনৈশ্চয়ে সদা অহঙ্কার ॥
দেখিয়ে সাধুর রীতি, শনি ক্রোধে জ্বলে।
নিশিযোগে রাজাকে বলেন স্বপ্ন ছলে ॥
তব ভাণ্ডারের সব চুনি মুক্তা ধন।
চুরি করি নিয়ে যায় সাধু মহাজন ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা কহে কোটালেতে।
সদাগর বান্ধি আন আমার সাক্ষাতে ॥
আজ্ঞা মাত্র সদাগরে বান্ধিয়া আনিল।
কারাগারে রাখিবারে রাজা আজ্ঞা দিল ॥
কাঁদিয়া সাধুর সুত বন্দী ঘরে যায়।
মনে ভাবে শনির সেবায় আছি বড় দায় ॥
এত বলি শনৈশ্চরে করে আরাধন।
বন্ধন মুক্ত কর পূজিব চরণ ॥
অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু নিজ দাসে।
তব পূজা করি নৌকা ভাসাইব দেশে ॥
তুষ্ট হয়ে শনি পুনঃ ভূপে আদেশিল।
সাধু সূত চোর নয় মম কোপে ছিল ॥
স্বপ্ন দেখি করে রাজা সাধুকে বিদায়।
পূজা করি সওদাগরে নিজ বাসে যায় ॥
শাশুড়িকে প্রণমিয়া ধন ঘরে নিল।
বহুবিধ উপাচারে শনিকে পূজিল ॥
এই মতে শনি পূজা যেই জন করে।
যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ যায় দূরে ॥
শনির পাঁচালি গ্রন্থ গৃহে থাকে যার।
সুখ শান্তিময় তার হইবে সংসার ॥
অতএব বন্ধুগণ ধরহ বচন।
ভক্তি করি শনিগ্রহ করিবে পঠন ॥
সকল বিপদ হতে পাবে পরিত্রাণ।
বেদেতে সকল কথা আছয়ে প্রমাণ ॥
হরি হরি মুখে বল যত বন্ধুগণ।
শনির পাঁচালি কথা হলো সমাপন ॥

www.pathagar.com

৩. পূণ্যিপুকুর ব্রত

বৈশাখ মাসে সুনামগঞ্জ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের কুমারীগণ পূণ্যিপুকুর ব্রত করে থাকেন। এ পূজা করলে সাবিত্রী সমান পতিব্রতা ও প্রচুর সুখের অধিকারিনী হয়ে থাকেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। এরফলে কুমারীদের মধ্যে এ পূজার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা শুরু হয়ে পুরো বৈশাখ মাস পর্যন্ত এ পূজা চলে। এভাবে চার বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট ওই সময়টিতে এ পূজার আয়োজন করতে হয়। বাড়ির উঠোনে একটি ছোট্ট পুকুরের মতো গর্ত করে তার চারপাশে কড়ি দিয়ে সাজিয়ে রাখতে হয়। মাঝখানে একটি তুলসি চারা রোপন করে মন্ত্র আওড়িয়ে গাছে জল ঢেলে দিতে হয়। প্রতিদিন এমনটিই করার রেওয়াজ রয়েছে।

৪. শিব পূজার ব্রত

কুমারীগণ শিব পূজার ব্রত করিলে শিবের মতো স্বামী পাওয়ার আশির্বাদপ্রাপ্ত হন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে পুরো বৈশাখ মাস এ পূজার্চনা করতে হয়। এ পূজার প্রণামমন্ত্র এ-রকম : 'নমঃ শিবায় নমঃ, নমঃ শিবায় নমঃ, নমঃ শিবায় নমঃ, নমঃ হরায় নমঃ, নমঃ, ব্রজায় নমঃ, নমঃ শিবায় নমঃ'।

৫. সাবিত্রী-চতুর্দশী ব্রত

প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামীর মঙ্গল কামনায় নারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাবিত্রী-চতুর্দশী ব্রত পালন করে থাকেন। এ ব্রতের ফলে স্বামী নিরোগ হয়ে আমৃত্যু জীবনযাপন করতে পারেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর নামই সাবিত্রী চতুর্দশী। ব্রতের সময় সারা দিন উপবাস থেকে সন্ধ্যার সময় সাবিত্রীদেবীর পূজার সম্পন্ন করে স্বামীর মঙ্গলকামনা চাওয়া হয়। তবে ব্রতের আগের দিন হবিষ্য করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। ব্রত শেষে কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের ভোজনও করিয়ে থাকেন।

৬. জামাই ষষ্ঠী

পুত্রকন্যার অশেষ কল্যাণের জন্য বাবা-মায়েরা জামাই ষষ্ঠী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন এই ব্রত পালন করতে হয়। ব্রতের শুরুতেই পিটুলি দিয়ে একটি কালো বিড়ালি ও একটি কঙ্কণ তৈরি করতে হয়। এটিকে নানা প্রকার ফল দিয়ে সাজিয়ে ছয়টি পান, ছয়টি সুপারিকে বাঁশপাতা ও হলুদ নেকড়া দিয়ে মুড়িয়ে ছয় গাছি হলুদ সুতা দিয়ে পেঁচাতে হবে। এটিকে 'ষাট সুতা' বলা হয়ে থাকে। পরে তেল, হলুদ ও দই সমতে মা-ষষ্ঠীর পূজা করিতে হয়। পূজার পর সেই হলুদ ছেলে-মেয়ে-জামাইয়ের কপালে লাগিয়ে ডান হাতে 'ষাট সুতা' বেঁধে দিতে হয়। পূজা শেষে চিড়া, দই, আম, কাঁঠাল, কলাসহ ফলাদি আহার করতে হয়।

৭. লক্ষ্মীপূজা

পরিবারে ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপূজার ব্রত করে থাকেন মহিলারা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। মা লক্ষ্মী দেবীর আসন ও

www.pathagar.com

ঘট বসিয়ে পবিত্র মনে এ পূজা করতে হয়। সাধ্য অনুযায়ী ব্রতীরা প্রসাদের আয়োজন করে থাকেন। পূজার সময় অনেক নারীরা পাঁচালি পাঠ করে থাকেন। পাঁচালি পাঠ শেষে পূজার্চনা করে ভক্তি দিয়ে পূজাপর্ব সমাপ্ত করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত উপজেলায় একটি প্রিন্ট করা পুস্তিকার প্রচলন রয়েছে। এ পুস্তিকায় ব্রত ও আচারের নিয়মাবলী ছাড়াও একটি দীর্ঘ পাঁচালি সংকলিত রয়েছে। পুস্তিকাটি ঢাকার বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটির সংকলক ও সম্পাদক দিলীপ রায়। পাঁচালিটি নিম্নরূপ :

দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ।
মৃদু মন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস ॥
লক্ষ্মীসহ একাসনে বসি নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ ধামেতে বসি করে আলাপন ॥
হেনকালে বীণা হাতে দেবর্ষী নারদ।
প্রণাম করিল লক্ষ্মী নারায়ণ পদ ॥
কি কারণে তব হেতা মাতা জিজ্ঞাসিলা।
নতশিরে মুণিবর তবে নিবেদিলা ॥
বল মাতঃ এ কেমন মহিমা তোমার।
চঞ্চলা চপলা সদা ভ্রমে দ্বারে দ্বার ॥
মূহুর্তের তরে তব নাহি কথোও স্তিতি।
মর্ত্তবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি ॥
অন্নভাবে জীর্ণ জীব শক্তি হীন দেহ।
অন্নের কারণে করে আত্মহুতি কেহ ॥
অন্নের কারণে নিজ পুত্র কন্যাগণে।
পরিত্যাগ পরিহার করি যায় কত শত জনে ॥
কহ দেবী! কহ কহ কি পাপের ফলে।
দুর্ভিক্ষ অনলে সদা মর্ত্তবাসী জ্বলে ॥
বিষন্নতা হয়ে মাতা অতি দুঃখমনে।
মৃদুস্বরে নারদেরে বলেন তখনে ॥
মানবের সুখ দুঃখ অথবা পতন।
দুষ্কর্মের ফল মাত্র জানিবে কারণ ॥
চঞ্চলা আমার নাম জগৎ ব্যাপিয়া।
কি কারণে তাহা বলি শুন মন দিয়া ॥
দুর্জনের রীতি নীতি করিয়া প্রবেশ।
আর্যভাব, জাতিধর্ম করিতেছে শেষ ॥
শাস্ত্র জ্ঞান নাহি মানে দেখ যত নর নারী।
অশাস্ত্রকে শাস্ত্রজ্ঞান করে নিরন্তর ॥
যত অনাচার আনি ভরিল সংসার।
অশুচি স্থানে থাকা দুষ্কর আমার ॥
গৃহধর্ম, শিক্ষা দিক্ষা দিয়া বিসর্জন।
কুরুচি, কুশিক্ষা সবে করিছে অর্জন ॥

www.pathagar.com

অনার্য, ভাবেতে ভোর সাজে নারী প্রায়।
বসন ভূষণে মন সদা তাহা চায় ॥
পর নিন্দা পরচর্চ্চা সদা ভালোবাসে।
মিলিলে সঙ্গিনী সদা সেই সব ভাষে ॥
পুরুষের পরিহাসে উল্লাসিত অতি।
পাপ পূর্ণ সদা মন নষ্ট পথে মতি ॥
দিবাভাগে নিন্দ্রা যায় ক্রোধ অহংকার।
আলস্যে কলহে মিথ্যা অনার্য ব্যাভার ॥
তর্ক পেলে হেলা করে হিত উপদেশ।
ধরা করে সরা জ্ঞান বাচালের শেষ ॥
প্রদীপ না দেয় তারা প্রতি সন্ধ্যাকালে।
বিলাসে উল্লাসে মত্ত পমেটম্ গালে ॥
সূর্যোদয় হলে দেয় গোবরের ছিটা।
বাসি মুখে থাকে নিজ বাসি বস্ত্র পরা ॥
উচ্চ হাসি উচ্চরব যথেচ্ছা গমন।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা আর মিশি জাগরণ ॥
মতি গতি ভিন্ন অতি অতিথি দেখিলে।
থাকুক সেবার কার্য ক্রোধে উঠে জ্বলে ॥
গুরুজনার হিতবাক্য রুষ্ট হয় অতি।
বিদ্রুপ করে বা কত তাহাদের প্রতি ॥
উলুধ্বনি দিতে হলে মাথায় পড়ে বাজ।
হাস্য ঠাট্টা করি বলে অসভ্যের কাজ ॥
স্বামীর আত্মীয়গণে সদা করে পরজ্ঞান।
গোপনে কু-যুক্তি দয়ে পৃথক কারণ ॥
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি হেতু শুধু হাসি মুখে।
প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করেন স্বামীকে ॥
পরিহাস পাত্র হয় অক্ষম যখন।
তাচ্ছিল্য করয়ে বাক্য না করে শ্রবণ ॥
মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা কভু নাহি কয়।
পরশ্রী কাতর মন কুটিলতা ময় ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি হীন মতিচ্ছন্ন অতি।
স্বীয় স্বার্থে সদা মত্ত যত কুলবতী ॥
রসনার তৃপ্তি হেতু অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ফল তার নানা ব্যাধি অকালে মরণ ॥
যেই গৃহে এইরূপ পাপের আগার।
অচলা হইয়া তথা থাকি কি প্রকার ॥
এই সব অনাচার দেখি ঘরে ঘরে।
তাইত চঞ্চলা হয়ে ভ্রমি দ্বারে দ্বারে ॥

www.pathagar.com

ঘুচিলে এসব দোষ হলে সদাচারী।
ভক্তি ডোরে বাঁধা রহ দিবা বিভাবরী ॥
ভক্তজনা বাঁধা আমি ভক্তি না থাকিলে।
কোন ফল নাহি হয় শুধু ফুলে জলে ॥
ভক্তিই পরম শক্তি বাঁধিতে আমায়।
ভক্তি হীনের পূজা ব্রত সকলি বৃথা হয় ॥
এত সব কহিলেন দেবী মুনিবরে।
পুনরায় জিজ্ঞাসিল মুনি কর যোড়ে ॥
কি হলে প্রসন্ন তুমি হও নর প্রতি।
কৃপা করি কৃপাময়ী বল তা সম্প্রতি ॥
পারে কি লভিতে নর তব পদ ছায়া।
দয়াময়ী ওগো তুমি না করিলে দয়া ॥
নারদের বাক্য শুনি কহেন কমলা।
কি করিলে প্রতি গৃহে থাকিব অচলা ॥
সংক্ষেপে জানাই তোমায় সেই বিবরণ।
লক্ষ্মী যুক্তা করে নারী করে আচরণ ॥
শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান কির, সিঁন্দুর পরিয়া কপালে।
গোবরের ছিটা দেয় প্রতি ঊষাকালে ॥
স্বামীর চরণে নিত্য সেবে যেই নারী।
যথার্থ বচন কহে পরিহাস ছাড়ি ॥
শ্বশুর শ্বাশুড়ি যত আদি গুরুজনে।
সেবা করে যত্ন বাক্যে পালেন যতনে ॥
পতিব্রতা নারীর এই সুলক্ষণ।
সলজ্জ সতত, কহে সংক্ষিপ্ত বচন ॥
প্রতি গুরুবারে যেবা লক্ষ্মীব্রত করে (বৃহস্পতিবার)
তার গৃহ কভু নাহি ছাড়ি তিলকের তরে ॥
ধনে পুত্রে বাড়ে ইহাতে নাহিক অন্যথা।
শাস্ত্রের বচন মুনি জানিও সর্বদা ॥
যার গৃহে হয় নিত্য অতিথি পূজন।
নারী পরিচর্য্যা করে করিয়া যতন ॥
যেথা নাই হিংসা দ্বেষ ক্রোধ অহংকার।
তথায় বসতি হয় সদায় আমার ॥
শুদ্ধাচারে না থাকিলে হয় বিপরীত।
অলক্ষ্মী ঢুকিয়া করে সতত অহিত ॥
শুনহ নারদ মুনি আমি জানাই তোমায়।
সতী নারী যেই জনা সেই মোরে পায় ॥
মধুর বচনে সেবি মাতা অতঃপর।
নারদ মুনিরে দিল বিদায় তারপর ॥

www.pathagar.com

নরলোকে লক্ষ্মী ছাড়া দুঃখে জড় সড়।
প্রতিকারের চেষ্টা করিব তা সত্বর ॥
এতেক চিন্তিয়া দেবী নারায়ণ প্রতি।
কহিলেন প্রাণনাথ মানবের দুর্গতি ॥
কেমনে ঘুচাব আমি দেও উপদেশ।
শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কহে হৃষিকেশ ॥
উতলা কি হেতু শন-হ বচন আমার।
লক্ষ্মীব্রত নরলোকে করহ প্রচার ॥
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি বামাগণে।
পূজিয়া শ্রবণ করিবে তথা আনন্দিত মনে ॥
ঘুচিবে দুর্গতি তাহে তোমার কৃপায়।
অতুল সম্পদ হবে বলিনু তোমায় ॥
শ্রীহরি বচেন দেবী আনন্দিত চিত্তে।
চলিলেন নরলোকে পূজা প্রচারিতে ॥
বিদর্ভ নগরে আসি হলো উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া দেব হইল বিস্মিত ॥
সে দেশের রাজা হলো নামে শ্রী-সুমন্ত।
রূপবান গুণবান; ঐশ্বর্য অনন্ত ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি আর অতিথি সম্ভাষণ।
অগণিত শোভে যথা কুবেরের ভবন ॥
সাত পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি।
রূপে গুণে হেন যোগ্য না মিলে অবনী ॥
এক অন্নে সাত পুত্র রাখিয়া রাজন।
স-সম্মানে পরলোকে করিল গমন ॥
রাজপুত্র বধূদের কু-বুদ্ধি ঘটিল।
পরস্পর হিংসানলে জ্বলিতে লাগিল ॥
কুমতি চাপিল ঘাড়ে করিয়া যুক্তি।
কুমন্ত্র পতির কানে দিল যুবতী ॥
সাত ভাই সাত হাঁড়ি হইল তখন।
অলক্ষ্মীর সহচর দিল দরশন ॥
অনাচারে লক্ষ্মীদেবী ত্যাগিল সংসার।
সোনার সংসার ক্রমে হলো ছারখার ॥
বৃদ্ধা রাণী করে হায়, সদা দুঃখে ভাসে।
তিষ্ঠিতে পারে না আর বধূদের রোষে ॥
অপযশে জ্ঞানহীনা হয়ে বৃদ্ধা রাণী।
নিবিড় কাননে গেল ত্যাজিতে পরাণী ॥
অন্নাভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন।
চলিতে শক্তিহীনা করিছে ক্রন্দন ॥

www.pathagar.com

হেনকালে ছদ্মবেশী দেবী নারায়ণী।
বন মাঝে উপস্থিত হইল আপনি ॥
সদয় হইয়া দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে।
কি হেতু এসেছ বৃদ্ধা এ ঘোর কান্তারে ॥
কার কন্যা হও তুমি কাহার গৃহিনী।
কি হেতু মলিন বদন কহ তাহা শুনি ॥
মম সাধ্য হলে কষ্ট ঘুচাব নিশ্চয়।
শুনি তাহা হরিষতা বৃদ্ধা যোড় হাতে কয় ॥
বিদর্ভ নগরে রাজা শ্রীসুমন্ত নাম।
তাঁহার রমণী আমি বিধি এবে বাম্ ॥
গুণবান সাত পুত্র রাখিয়া নৃ-পতি।
বৃদ্ধাকালে করিলেন লোকান্তরে গতি ॥
যতদিন ছিল রাজা গৃহে সদা মোর।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা ছিল ধন ঐশ্বর্য প্রচুর ॥
পতির হইল কাল সুখ শান্তি যত।
গৃহ হতে ক্রমে ক্রমে হলো তিরোহিত ॥
সাত পুত্র সাত হাঁড়ি হয়েছে এখন।
সদাই বধূরা মোরে করে জ্বালাতন ॥
সহিতে না পারি আর তাহাদের যন্ত্রণা।
ত্যাজিতে জীবন আমি করেছি কল্পনা ॥
লক্ষ্মী বলে শুন বৃদ্ধা আমার বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন ॥
যাও সতী গৃহে ফিরে কর লক্ষ্মীব্রত।
অচিরে হইবে সুখ পূর্বের মত ॥
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি বামাগণে।
করিবে লক্ষ্মীর ব্রত হয়ে এক মনে ॥
জলপূর্ণ ঘটে দিবে সিঁন্দুরের ফোঁটা।
আম্রের পল্লব দিবে শিরে এক গোটা ॥
আসন সাজায়ে দিবে তাতে গুয়া পান।
সিন্দুর গুলিয়া দিবে ব্রতের বিধান ॥
ধূপ দীপ জ্বালাইয়া রাখিবে গৃহেতে।
শুনিতে বসিবে তথা দূর্বালয়ে হাতে ॥
একান্তে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন।
একচিত্তে ব্রত কথা করিবে শ্রবণ ॥
কথা শেষে হুলুধ্বনি প্রণাম করিবে।
তারপর নারীগণ সিঁন্দুর লইবে ॥
যে নারী এই ব্রত করে প্রতি গুরুবারে।
হইবে শুদ্ধ চিত্ত লক্ষ্মীদেবীর বরে ॥

www.pathagar.com

যেই গৃহে ব্রতকালে সব বামাগণ।
অন্য সব কাজ রাখি ব্রতে দেয় মন ॥
সেই গৃহে বাঁধা থাকি হয়ে অচলা।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি আমি শ্রীকমলা ॥
গুরুবারে হয় যদি পূর্ণিমা উদিত।
যেই নারী উপবাসে করে এই ব্রত ॥
সকল অভীষ্ট তার হইবে পূরণ।
পতি পুত্র সহ সুখে রবে সদাক্ষণ ॥
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে ॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার হবে তার ফলে ॥
অলসতা ছাড়ি সূতা কাটে বামাগণ।
অন্ন বস্ত্র কষ্ট যাবে মহাত্মা বচন ॥
আমি লক্ষ্মী বলি ইহা নিজ মূর্তি ধরি।
দেবী দরশন দিলা স্বয়ং কৃপা করি ॥
দেখিয়া হইল বৃদ্ধা আনন্দে বিভোর।
প্রণাম করিলা সতী হাত করি জোড় ॥
ধরা মাঝে মম ব্রত করহ প্রচার।
অচিরে হইবে তব বৈভব অপার ॥
মম বরে সপ্ত বধূ হবে বশীভূত।
সুখ শন্তিময় হবে সংসার পূর্বের মত ॥
বরদান করি দেবী হলো অদর্শন।
হরিষে বিষাদে বৃদ্ধা গেল আপন ভবন ॥
গৃহেতে আসিয়া সব করিল বর্ণন।
যে রূপে ঘটিল তার দেবী দরশন ॥
ব্রতের বিধান সতী কহিল সবায়।
সবিশেষ কথা দেবী কহিল তাঁহায় ॥
বধূগণ মিলি সবে করে লক্ষ্মীব্রত।
হিংসাদ্বেষ স্বার্থভাব ঘুচিল ত্বরিত ॥
দেবী করিল তথা পুনঃ আগমন।
অচিরে হইল গৃহ শান্তি নিকেতন ॥
এইরূপে লক্ষ্মীব্রত করে প্রতি ঘরে ঘরে।
ক্রমে প্রচারিত হইল বিদর্ভ নগরে ॥
দৈবযোগে একদিন ব্রত কথা শুনি।
উপনীত হইল আসি জনৈক রমণী ॥
পতি তার রুগ্ন অতি অক্ষম অর্জনে।
ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় খায় তা দুজনে ॥

www.pathagar.com

ব্রতের মানস করি মনেতে বাসনা।
নীরোগ কর পতিরে করিল প্রার্থনা ॥
ঘরে যেয়ে এয়ো লয়ে করে লক্ষ্মীব্রত।
ভক্তি ভরে করে সতী পূজা বিধিমত ॥
লক্ষ্মীর কৃপায় তার দুঃখ হইল দূর।
গতির হইল সুস্থদেহ সম্পদ প্রচুর ॥
যথাকালে শুভ লগ্নে হইল তনয়।
হইল তাঁহার সংসার সুখের আলয় ॥
অবশেষে শুন এক অপূর্ব ব্যাপার।
ব্রতের মাহাত্ম্য হলো সর্বত্র প্রচার ॥
বিদর্ভ নগরে এক গৃহস্থ ভবনে।
নিয়োজিত নারীগণে ব্রত আচরণে ॥
শ্রীনগরবাসী এক বণিক তনয়।
উপনীত হইল আসি ব্রতের সময় ॥
অতুল সম্পদ তার ভাই পাঁচজন।
একে অন্যে অনুগত সদা সর্বক্ষণ ॥
ব্রত দেখি হেলা করি সাধুর তনয়।
বলে একি ব্রত, এতে ফল কিবা হয় ॥
সদাগর বাক্য শুনি যত ব্রতীগণ।
মোরা করি লক্ষ্মীব্রত দুর্ভাগ্য মোচন ॥
ভক্তি যুক্ত মনে যেবা এই ব্রত করে।
অতুল সম্পদ হয় তার লক্ষ্মীদেবীর বরে ॥
এত শুনি সদাগর অহংকারে বলে।
অলস মেয়ের দল সংসার মজালে ॥
ধনজন সুখ ভোগ যা কিছু এ ভবে।
সকলই শ্রমলভ্য পূজিলে কি হবে ॥
বসিয়া থাকিলে যদি লক্ষ্মী দেয় ধন জন।
বুঝিব তখন এই ব্রতটি কেমন ॥
গর্বিত বচন দেবী শুনিয়া তাহার।
ছাড়ি গেলা লক্ষ্মীদেবী শুন পরে তার ॥
ধনমদে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হেলা।
নানা দ্রব্য ভরি তরী বাণিজ্যেতে গেলা ॥
হইল লক্ষ্মীর রোষসহ ধন জন।
সপ্ততরী গঙ্গা মাঝে হইল নিমগণ ॥
গৃহদাহে সর্বনাশ ঘটিল তাহার।
দিনান্তে জুটেনা অন্ন সদা হাহাকার ॥
ভায়ে ভায়ে হইল ভেদ ভিন্ন হইল অন্ন।
সোনার সংসার এ-রূপে সকল হইল বিপন্ন ॥

www.pathagar.com

জঠর যাতনা সবে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা হেতু পাঁচ ভাই হইল দেশান্তরী ॥
নানাহ বিপদে পড়ি সাধুর নন্দন।
কান্দিয়া কান্দিয়া করে নগর ভ্রমণ ॥
কি দোষে আমারে বিধি নিষ্ঠুর এমন।
অধম মানব আমি অতি অভাজন ॥
কৃপাময়ী লক্ষ্মীদেবী সকলি বুঝিল।
সাধুর দুর্গতি দেখি দয়া উপজিল ॥
নানাদেশ ঘুরাইয়া আনি তারপরে।
উপনীত করাইল বিদর্ভ নগরে ॥
দেখে তথা ব্রত করিছে সেই ব্রতীগণ।
স্মরণ পড়িল তার পূর্ব বিবরণ ॥
বুঝিব তখন, কেন পড়িল হেন বিপদে।
অহংকারী বলে লক্ষ্মী না রাখিল পদে ॥
যুক্ত করি ভক্তি ভাবে হয়ে একমন।
স্তব স্তুতি করে অতি সাধুর নন্দন ॥
অধমের যতেক দোষ ক্ষমা কর মাতঃ।
তব পদে মতি যেন থাকে অবিরত ॥
ক্ষমা কর ভগবতী ওগো ক্ষমাশীলে।
সত্য স্ব-রূপা তুমি হও এ ভূমণ্ডলে ॥
পরমা প্রকৃতি তুমি জ্ঞান হীন মানব।
অপার মহিমা রাশি কি বুঝিব তব ॥
পতিব্রতা রমণীর তুমি মা উপমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে দিতে নাহি সীমা ॥
দেব নর সকলের বিভব রূপিণী।
জগৎ ঈশ্বরী তুমি ঐশ্বর্য প্রদায়িনী ॥
রাস অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি রাসেশ্বরী।
তব অংশ রূপা হয় ভবে যত নারী ॥
ত্রিদশ ঈশ্বরী তুমি ত্রিদশ মণ্ডলে।
লক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠাত্রী তুমি ভূমণ্ডলে ॥
ক্ষীরোদ-সাগরে তুমি সাগর মোহিনী।
তুমিই তুলসী গঙ্গা পতিত পাবনী ॥
সত্য স্বরূপিনী তুমি বেদ প্রসবিনী ॥
পদ্মাবতী নামে তুমি ব্যক্ত পদ্মবনে।
কুন্দদন্তী নাম ধর তুমি কুন্দ বনে ॥
তুমি মা সুশীলা সতী কেতকী বনে।
তুমিই কদম্ব মালা কদম্ব কাননে ॥
রাজলক্ষ্মীরূপে তুমি মাগো থাক রাজপুরে।

www.pathagar.com

গৃহলক্ষ্মী ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত চরাচরে ॥
দরিদ্রকে দিতে পার তুমি রাজ পদ।
তোমার শ্রীপদ ভবে অভয় সম্পদ ॥
দয়াময়ী ক্ষমাশীল অধম তারিণী।
অপরাধ ক্ষম মাগো তরাও জননী ॥
অন্ন দে, বর দে মাতঃ! বিপদ হারিণী।
দয়া কর দয়াময়ী অয়ি নারায়ণী ॥
এইরূপে স্তুতি করি ভক্তি যুক্ত মনে।
কায়োমনে সদাগর ব্রত কথা শুনে ॥
ব্রত সমাপন-শেষে করিয়া প্রণাম।
মানস করিল ব্রতের আসি নিজ ধাম ॥
কহে সাধু বধূগণে লক্ষ্মীব্রত সার।
সবে মিলি কর ইহা প্রতি গুরুবার ॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি হৃষ্টা বধূগণ।
ভক্তি যুক্ত মনে করে ব্রত আচরণ ॥
ভক্তের অধীন দেবী হইলা সদয়।
সাধুর দুর্গতি করিলেন ক্ষয় ॥
দেবীর কৃপায় বহু সম্পদ লভিল।
দারিদ্রতা দূর হইল বিপদ খণ্ডিল ॥
ভাসিয়া উঠিল সপ্ততরী সহ ধন জন।
উল্লাসে বিস্ময়ে পূর্ণ সকলের মন ॥
প্রত্যেক লক্ষ্মীর বাক্য দেখিয়া নয়নে।
ভক্তি ভরে ভাবে সবে সদা সর্বক্ষণে ॥
হিংসা, দ্বেষ পরিহরি ভ্রাতা, বধূগণ।
সকলে মিলিল-ছিল পূর্বেতে যেমন ॥
শান্তিপূর্ণ নিকেতন হইল সাধুর ভবন।
দয়া ধর্ম ব্রত সবে ধন ঐশ্বর্য প্রচুর ॥
শাস্ত্রের বচনে এই লক্ষ্মীর চরিত্র।
পড়িলে শ্রবণে হবে পরম পবিত্র ॥
নিষ্ঠার সহিত গ্রন্থ যদি ঘরে রাখে।
লক্ষ্মীসহ নারায়ণ সেই গৃহে থাকে ॥
লক্ষ্মীব্রত যে রমণী করে এক মনে।
দিনে দিনে বাড়ে তার ধন পুত্র জনে ॥
সর্বদা শান্তিতে থাকে দূরে যায় তাপ।
লক্ষ্মীব্রত করিলে দেহে না থাকে পাপ ॥
পতি পুত্র হিতৈষিণী সতী যে নারী।
স্বপ্নাদেশে করে ব্রত সর্বার্থ দায়িনী ॥
সতীর সাধনা ধন এই লক্ষ্মীব্রত।

www.pathagar.com

কালে কালে প্রতি গৃহে হয়েছে প্রবর্তিত ॥
অতএব মতি রাখি লক্ষ্মীদেবীর পদে।
বিধি মত কর ব্রত তরিবে বিপদে ॥
সতীর নিমিত্ত ব্রত সদায় তাঁর জয়।
অসতীর কর্মদোষে যায় সব রসাতল ॥
সতীর সতীত্বে ধর্ম সর্বত্র মঙ্গল।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা যত ব্রতীগণ ॥
প্রণাম করহ এবে ব্রত কথা হলো সমাপন ॥
নমস্তে করুণাময়ী দুঃখ নাশিনী।
অগতির গতি তুমি হও নারয়ণী ॥
ক্ষীরোদ সম্ভবা দেবী বিশ্ববিমোহিনী।
বিশ্বমাতা কৃপাময়ী জগৎ জননী ॥
স্ব-ভক্ত বৎসলা তুমি সত্য স্বরপিণী।
পদ্মাসনা হরি প্রিয়া ভূতপহারিণী ॥
চঞ্চলা কমলা তুমি ত্রিলোক পালিনী।
প্রণমামি দয়াময়ী মাধব মোহিনী ॥
ভিক্ষা মাগি পদযুগে কাতর অন্তরে।
লক্ষ্মীনারায়ণ যেন বাঞ্ছা পূর্ণ করে ॥

৮. পঞ্চায়েতের বৈঠক

সুনামগঞ্জ জেলায় গ্রামীণ সমাজে এখনো পঞ্চায়েতের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাড়া বা গ্রামে ঝগড়াঝাটি কিংবা মারামারি অথবা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল তৈরি হলে সেটা পঞ্চায়েত বসে বিচারকাজ সম্পন্ন করেন। বিশেষ করে জমিজামাসংক্রান্ত বিরোধী, গোষ্ঠীর মধ্যে ফ্যাসাদ, বাড়ির সীমানা নিয়ে ঝামেলা, গৃহপালিত পশু অন্যের বাড়ির সবজি-ফসল খেয়ে ফেললে–এসব ঝামেলা মিটাতে গ্রামের মানুষেরা পঞ্চায়েতের কাছে বিচার দাবি করেন। সে অনুযায়ী গ্রামসহ আশপাশের গণমান্য মুইব্বিদের নিয়ে পঞ্চায়েত বসে তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পঞ্চায়েতের বৈঠককে ঘিরে যে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটছে তাও নয়। তবে এসব ছাপিয়ে পঞ্চায়েত বৈঠক গ্রামীণ প্রাচীন আচার-সংস্কৃতির একটি অন্যতম ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পঞ্চায়েতের কথা না-মানলে কিংবা সিদ্ধান্তে র বাইরে গেলে ওই ব্যক্তিকে বহিষ্কার অর্থাৎ 'পাচরবাদ' করে দেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে এ পঞ্চায়ের সংস্কৃতির প্রচলন রয়েছে। ঝগড়া-ফ্যাসাদের বিচার ছাড়াও নানা উৎসব-পার্বণে গ্রামের পঞ্চায়েতকে ডেকে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করে ভালো খাবার খাওয়ানোর রেওয়াজও রয়েছে। এতে পাড়া-প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর সঙ্গে সৌহার্দবোধ তৈরি হয়। পঞ্চায়েতের কল্যাণে অনেক ইতিবাচক কর্মকাণ্ডও গ্রামীণ এলাকায় সম্পন্ন হচ্ছে।

৯. অন্নপ্রাশন

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুর মুখে প্রথম ভাত অর্থাৎ অন্ন তুলে দেওয়ার সময় এক আচার পালন করা হয়। আচারিক এই অনুষ্ঠানটিকেই অন্নপ্রাশন বলা হয়। শিশুর ছয় মাস বয়সের পর

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণের মাধ্যমে দেবতার পূজা করা হয় এবং দেবতাকে নিবেদিত প্রসাদ শিশুর মুখে দিয়ে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়। তবে এই উৎসবে পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকেও নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। ভালো খাবারের আয়োজন করে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। আত্মীয়স্বজনরা ধান-দুর্বাসহ উপহারসামগ্রী দিয়ে শিশুটিকে আশির্বাদ করে থাকেন।

১০. খৎনা

ইসলামী রীতি অনুযায়ী ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী ছেলে/কিশোরের লিঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখা চামড়াটুকু কেটে খৎনা করানো হয়। এটিকে অনেকে মুসলমানিও বলে থাকেন। এটি গ্রামীণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুন্নত কাজ বলে অভিহিত করে থাকেন বলে এ কার্যক্রমকে কেউ কেউ 'সুন্নত' নামেও বলে থাকেন। স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ছাড়াও কিছু পেশাজীবী লোক এই খৎনার কাজটি করে থাকেন। যেদিন ছেলে/কিশোরকে খৎনা করানো হয় ওইদিন আত্মীয়স্বজনদে গরু কিংবা খাসি জবাই করে খাওয়ানোর রেওয়াজ রয়েছে। তবে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ মোরগ বা হাঁস জবাই করে আত্মীয় খাইয়ে থাকেন।

১১. আকিকা

ইসলাম ধর্মের বিধি অনুযায়ী সন্তানের নাম নির্ধারণের দিন আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে পশু জবাই করে খাওয়ানোকেই আকিকা বলা হয়। উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে আকিকা অনুষ্ঠান একটি বিশাল উৎসবে রূপ নেয়। প্রচুর সংখ্যাক আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ানোর পাশাপাশি কেউ কেউ দরিদ্রদের জন্য কাঙালিভোজও দিয়ে থাকেন। আমন্ত্রিতরা শিশুরা সাধ্য অনুযায়ী উপহারসামগ্রী প্রদান করে থাকেন।

১২. সাধভক্ষণ

হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো নারী যখন নয়মাসের গর্ভবতী থাকেন, তখন সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সন্তান সম্ভাবা ওই নারীর রুচিমাফিক খাবার ওই সময় পরিবেশন করা হয়। আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে আনা হয়। তারা সাধ্যমতো উপহার প্রদান করেন।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

সুনামগঞ্জের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বাংলাদেশের অনান্য অঞ্চল থেকে একটু ব্যতিক্রম। হাওর অধ্যুষিত জনপদ হওয়ায় এখানকার মানুষের আচার-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে ভিন্নতর। এ জেলার প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী এবং ১৫ ভাগ মানুষ মৎস্যজীবী। বাকি ৫ ভাগ মানুষ নানা ধরনের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সঙ্গত কারণেই ধান ও মাছে পুরো সুনামগঞ্জ জেলা সমৃদ্ধ। পুরো জেলাকে সুতোর মতো পেঁচিয়ে রেখেছে ছোট-বড় অসংখ্য হাওর-বিল-নদী-খাল। সুনামগঞ্জের ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী হওয়ায় একসময় এখানে নানা প্রজাতির ধান চাষ হতো। তবে এখন বোরোসহ মাত্র গুটিকয়েক প্রজাতির ধান চাষ হয়ে থাকে। বিলুপ্ত ও অবিলুপ্ত এসব ধানের মধ্যে ছিল–আউশ, আমন, ইরি, বোরো, লডাং, বুরি আবরি, বদিরাজ, পাইজাম, বিআর ২৮, ২৯, মালা, গাজি, চান্দিনা, বিরুই, মুক্তা, কালোজিরা, বিন্নি, নাজিরশাইল, টেপি, বেগুন বিচি, চিনিশাইল, সোনামুখী, দুধরাজ প্রভৃতি।

মিঠা পানির মাছের মধ্যে সুনামগঞ্জ অঞ্চল বিখ্যাত। এখানকার হাওরের মাছ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হচ্ছে। এমনকী হাওরের সুস্বাদু মাছ সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশেও ব্যাপকভাবে রপ্তানি হচ্ছে। এখানে নানা জাতের মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রজাতির মাছ হচ্ছে–শিং, মাগুর, বোয়াল, কৈ, গজার, বালিয়ারা, দাড়কিনা, পুটি, বাঁশপাতা, ভেদা, কইটকইট্টা, পাবদা, আইড়, শোল, ইছা, লাছো, চিতল, কালবাউস, গনিয়া, গুতুম, ঘোলসা, কেচকি, বাইম, টেংরা, লাটি, বইচা, রানি, চান্দা, মলা, গারুয়া, পোডা, কাইক্কা, শরপুটি, কাতলা, রুই, মৃগেল, কারফু, গ্লাস কার্ফ, কারফু, তেলাপিয়া, নাপিত, কানাপনা প্রভৃতি। নানা উৎসব-পার্বণে এখানকার মানুষ নানা ধরনের পিঠা-পুলি-পায়েস তৈরি করে থাকেন। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের এসব খাবার আলাদা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এখনো টিকে রয়েছে। এসব ছাড়াও বিভিন্ন জাতের চাউলের পোলাও, জাও, খিচুরি, বিন্নি ধানের খৈ, চালের খৈ, মুড়ি, চিড়া, মিঠাই তৈরিরও রেওয়াজ রয়েছে। সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ডুগি, লাউ, আলু, মরিচ, ঢেড়্স, গাজর, শিম, টমেটো, পটল, মাসকলাই, শর্ষে, ধনে পাতা, পাট শাক প্রভৃতি সবজি উৎপাদন করে থাকেন কৃষকেরা। উৎপাদিত এসব সবজি দিয়ে নানা স্বাদ ও পদের তরকারি এবং ভর্তা বানান এ অঞ্চলের মানুষ।

খাবারের মধ্যে শুকনা মরিচ বেটে সিদলের ভর্তা, কুমড়া বড়া, মরিচ ভর্তা, টমেটো ভর্তা, পটল ভর্তা, আলু ভর্তা, পান্তা ভাত-শুকনো মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি বিশেষ খাদ্যবিশেষ, মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট, মাসকালাইয়ের ডাল, কাঁঠাল বিচির সিদল তরকারি, কদু দিয়ে সিদল তরকারি, কচুশাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চাশাক, কলার মুচি দিয়ে শুটকি, ওল কচু, কচুর মুখি, কচুর লতি, শিমের বিচির ডাল, কুমড়ার মোরাব্বা, পাখির মাংস, গরুর গোস্ত, কাছিমের মাংস, লাউফুলের বড়া, খাসি ও পাঠার মাংসসহ নানা মুখরোচক খাবারের প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

হাওরের মানুষের অতিথিপরায়ণতা যে-কাউকেই মুগ্ধ করে। কারো বাড়িতে কোনো অতিথি গেলে তাঁকে সাধ্যমতো আদর-আপ্যায়ন করার রেওয়াজ সুনামগঞ্জ অঞ্চলের ধনী-গরিব প্রতিটি বাড়িতেই প্রচলন রয়েছে। 'অতিথির সেবা মানে নারায়ণ সেবা'–এ ধরনের একটি প্রবাদসম বাক্য এ অঞ্চলের মানুষেরা বিশ্বাস করে থাকেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সেবা আর অতিথির সেবা এক অর্থেই এখানকার সহজ-সরল গ্রামীণ মানুষেরা হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। আর এ বিশ্বাস থেকেই অতিথির সেবায় নিয়োজিত হয়ে বাড়ির গৃহস্থ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী খাবার-দাবারের আয়োজন করে থাকেন। ভোজনরসিক হাওরবাসীর এ আপ্যায়ন গ্রামীণ মানুষের মানবিক চেতনার ধারাকেই পরিস্ফুট করে। যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক উত্থান ও বিকাশ সত্ত্বেও সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দাদের অতিথিপরায়ণতার এ বিষয়টি এখনো নিরন্তর বহন করে চলেছেন এ প্রজন্মের মানুষ। যুগের পর যুগ ধরে চলমান সমাজ-সংস্কৃতির এ ক্ষেত্রটি এখানকার মানুষের জীবনযাপনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র হিসেবে সবার কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে টিকে রইবে বলে হাওরের মানুষেরা বিশ্বাস করে থাকেন। নিম্নে সুনামগঞ্জ অঞ্চলের কিছু প্রচলিত লোকখাদ্যের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. বুগলি

বীজ ধানে যেগুলোতে ঘেরা উৎপন্ন হয়েছে, কেবল সেসব ধানের চাউল দিয়ে পায়েসের ন্যায় এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। সে খাবার 'বুগলি' নামে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে পরিচিতি পেয়েছে। গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ধান তোলার মৌসুমে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই বেশি পরিমাণে বীজধান আলাদা করে তোলে রাখা হয়। সেই বীজধান বপনের পর যেসব শেকড় উদ্ভিন্ন ধান অবশিষ্ট থাকে, সেসবের চাউল তৈরি করে পায়েস জাতীয় 'বুগলি' প্রস্তুত করে খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। বিলাসি খাবার হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের গরিব ও নিম্নবিত্ত পরিবারেও বুগলি তৈরি ও খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

২. ভাতের মদ

গ্রামাঞ্চলে ভোলাসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের শেষদিন ভাদের মদ তৈরির রেওয়াজ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে বলা হয়ে থাকে, 'কার্তিক মাসের শেষ দিন আর অগ্রহায়ণ মাস আসার প্রারম্ভে' এই ভোলাসংক্রান্তি উৎসব হয়। আবার দুর্গাপূজার শেষ দিন অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিনও ভাতের মদ তৈরির রেওয়াজ রয়েছে। এটি হিন্দু ধর্মালম্বীদের বাড়িতে তৈরি হয়ে থাকে। বাজারে 'মদ তৈরি গোটা' জাতীয় ছোট একটি গোলাকৃতি উপকরণ পাওয়া যায়। এক কেজি চালের প্রস্তুতকৃত ভাতের সঙ্গে এ ধরনের একটি গোটা গুজে দিলেই মদ তৈরি করা সম্ভব। পাতিলভর্তি ভাতের সঙ্গে এই গুটা গুজে দিয়ে তিনদিন পর খাবার হিসেবে পরিবেশন করতে হয়। এ জাতীয় খাবারের সুগন্ধি বেশ চমৎকার।

৩. ক্ষীর

দুধ দিয়ে সুস্বাদু আতপ চালের মিশ্রণে ক্ষীর তৈরি করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে গত বছর দশেক আগেও ক্ষীরে গুড় মেশানো হতো। তবে বর্তমানে অনেকেই চিনি দিয়ে ক্ষীর প্রস্তুত করে থাকেন। বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে ক্ষীর রান্না করার প্রচলন সুনামগঞ্জ অঞ্চলে রয়েছে। অনেকে ক্ষীরে কুড়ানো নারকেলও মিশিয়ে থাকেন। এতে ক্ষীরের স্বাদ বহুগুণে বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

তবে মরিচা গুড়ের ক্ষীরের প্রচলনও সুনামগঞ্জে ব্যাপকভাবে রয়েছে। তবে সুনামগঞ্জে এক ফসলি জমি বোরো ধান ফলনের পর যখন গাছের চারাগুলো গর্ভবতী হয়, তখন 'ক্ষীরবাস' নামে এক ধরনের কৃষিব্রত অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কৃষাণীরা উপবাস থেকে এই আচার পালন করে থাকেন। সে সময় ক্ষীর অর্থাৎ পায়েস তৈরির সঙ্গে মালফা (পিঠা বিশেষ) তৈরি করে নিজ খেতে গিয়ে ইশান কোণে ভোগ লাগানো হয়। পরে ভোগের প্রসাদ অর্থাৎ ক্ষীর-পিঠা সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধারণত বৃহস্পতিবার অথবা রোববার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে এই ক্ষীরবাস অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে।

৪. পিঠা

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি, জামাই খাওয়ানো, সাধভক্ষণ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদ উৎসব, খৎনা, জামাই চাদরিসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সুনামগঞ্জের প্রায় সবকটি পরিবারে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে। এর বাইরে বিয়ে উৎসব কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মেহমান বাড়িতে এলেও পিঠা তৈরি করা হয়। নানা স্বাদ-বর্ণ-রংয়ের বিভিন্ন প্রজাতির পিঠার সৌন্দর্য ভোজনরসিকদের খাদ্য তালিকায় নবমাত্রা যোগ করে। এসব উৎসবে পিঠাপুলির উৎসব যেন লেগে যায় হাওরের গ্রামগুলোতে। উৎসবের দিন গ্রামীণ নারীদের হাতে তৈরি এসব পিঠা পরিবেশনের মাধ্যমেই মেহমানদারি করা হয় অতিথিদের। সুদীর্ঘকাল ধরেই হাওরের মানুষের কাছে তাই পিঠার কদর অনন্য স্থান দখল করে রেখেছে। সুনামগঞ্জের লোকখাবারের মধ্যে পিঠার প্রচলন সবচেয়ে বেশি।

সুনামগঞ্জে প্রায় সারা বছরই নানা উপলক্ষে পিঠা তৈরি হয়ে থাকে। তবে বিশেষ করে শরৎকালে পিঠা তৈরির ধুমটা বেশি পড়ে। আর অগ্রহায়ণে অর্থাৎ হেমন্তে নতুন ধান কাটার পর এবং শীতকালেও পিঠা তৈরি হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে লৌকিকযন্ত্র ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভেনে চাল বের করে পিঠার উপকরণ প্রস্তুত করা হতো। সুনামগঞ্জে চিতই, পাটিসাপটা, পুলি, ভাপা পিঠা, সাগুদানা পিঠা, জামদানি পিঠা, চুষি পিঠা, সিঙ্গারা পিঠা, নারিকেল ভাজা পুলি, নারিকেল সিদ্ধ পুলি, গজা, নানা ধরনের নকশি পিঠা, তেলের পিঠাসহ নানা ধরনের পিঠা বানানো হয়। কে কত রকমের পিঠা বানাতে পারেন–তা নিয়েও কোনো কোনো গ্রামের নারীদের মধ্যে মনস্তাত্বিক প্রতিযোগিতা হতে দেখা যায়।

পিঠার মধ্যে সুনামগঞ্জে 'পুরি পিঠা' সবচেয়ে জনপ্রিয়। পিঠার এ প্রজাতিটি প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বানানো হয়। ধারণা করা হয়ে থাকে, হয়তো 'পুলি' থেকে অঞ্চল বিশেষে উচ্চারণের তারতম্যের কারণে শব্দটি 'পুরি' অথবা 'ফুরি' হিসেবে রূপ নিয়েছে। এই পিঠা প্রায় সারা বছরই গ্রামীণ নারীরা বানান। কোনো উৎসবে এ পিঠার উপস্থিতি থাকবেই। চালের গুঁড়া ও গুড় পানির মিশ্রণে পিঠা তৈরির উপকরণ তৈরি করা হয়। পরে একটি বাটি কিংবা টিনের ডিব্বার মধ্যে ওই হালকা ঘনজাতীয় তৈরি করা তরল উপকরণটি অর্ধেক কড়াই ভর্তি গরম তেলে ভেজে পিঠা তৈরি করা হয়। তেলে যথাযথভাবে ভেজে নিয়ে হাতা দিয়ে পিঠাগুলো তুলে ফেলা হয়। এরপর এগুলো পরিবেশন করা হয়।

পুলি পিঠাও সুনামগঞ্জে বিশেষ জনপ্রিয়। নারিকেল, চিনি, চালের গুঁড়া, সয়াবিন তেলের সমন্বয়ে এসব পিঠা তৈরি করা হয়। এর বাইরে সুস্বাদু সব উপকরণ দিয়ে আরো বিভিন্ন ধরনের পুলি পিঠা প্রস্তুতের রেওয়াজ রয়েছে। এরমধ্যে 'ক্ষীর পুলি',

www.pathagar.com

'নারকেল পুলি', 'চন্দ্রপুলি', 'তিলের পুলি', 'মুগের পুলি', 'ভাপা পুলি', 'চিঁড়ার পুলি' উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো বাড়িতে আবার 'সবজি পুলি'ও তৈরি করতে দেখা যায়। আতপ চালের গুড়ার সঙ্গে লবন ও কুসুম গরম পানি মিশিয়ে প্রস্তুতকৃত চিতই পিঠার প্রচলনও সুনামগঞ্জে রয়েছে। গরু বা হাঁসের মাংস কিংবা সর্ষে বাটা অথবা সিদল ভর্তার সঙ্গে চিতই পিঠা সচরাচর পরিবেশন করা হয়ে থাকে। নানা ধরনের আল্পনার কারুকাজে ভরপুর নকশি পিঠার মধ্যে কড়ি পিঠা, ফুল পিঠা, শাপলা পিঠার ঐতিহ্য সুনামগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের।

৫. চই পিঠা ও দুধ চই পিঠা

চই পিঠা ও দুধ চই পিঠা সুনামগঞ্জের মানুষের প্রিয় খাবার। দুই পিঠার দুই ধরনের স্বাদ। চই পিঠা হচ্ছে একটু পানসে স্বাদের এবং দুধ চই পিঠা হচ্ছে মিষ্টিজাতীয়। আতপ চালের গুঁড়ো সামান্য গরম পানিতে মিশিয়ে নরম করা হয়। এরপর সেই নরম ময়দাজাতীয় চালের গুড়ো হাতের আঙুলসম করে দলা পাকিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। কড়াই ভর্তি গরম পানিতে সেসব পিঠা সিদ্ধ করে পরিবেশন করা হয়। সেসব পিঠাকে চই পিঠা বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লবন, সিদল ভর্তা কিংবা সবজি দিয়ে এই পিঠা খাওয়া হয়ে থাকে। আর দুধ চই পিঠা তৈরি করতে নরমজাতীয় ওই ময়দার ন্যায় চালের গুঁড়া ও পানি মিশ্রত উপকরণ দুই হাতের মাঝে রেখে ঘষে ঘষে কুচি কুচি পিঠা তৈরি করা হয়। সেসব তৈরি পিঠা চিনিমিশ্রিত দুধে রেখে উনুনে জ্বাল দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা হয়।

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

সুনামগঞ্জ জেলা হাওর অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলে বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন গ্রামে লোকনাট্য পরিবেশনের ধুম পড়ে। বর্ষা ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে শুষ্ক মৌসুমেও লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। তবে সেটি নিতান্তই অল্প। গ্রামের সাধারণ মানুষ এসব লোকনাট্যে অভিনয় করে থাকেন। সুদীর্ঘকাল ধরে হাওরাঞ্চলে লোকনাট্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা 'যাত্রাগান' পরিবেশনা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে। কেউ কেউ এসব পরিবেশনাকে 'যাত্রাপালা' বলেও অভিহিত করে থাকেন। এসব যাত্রাগানের মধ্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক, জনসচেতনামূলক, প্রণয়আখ্যানসহ নানা জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। প্রচলিত যাত্রাগানের মধ্যে *নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা*, *রূপবান*, *ডালিমকুমার*, *জরিনা সুন্দরী*, *মেহেরজান* প্রভৃতির খুবই জনপ্রিয়তা রয়েছে। খোলা আকাশের নিচে কোনো বাড়ির উঠোনে বিনোদনপ্রিয় গ্রামীণ সৌখিন মানুষের আয়োজনে এসব যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত রাতের বেলাই যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়। যেখানে যাত্রা মঞ্চায়িত হয়, সে স্থানটি আকাশের দিকে বাঁশের খুঁটি পুতে ত্রিপল টানিয়ে মঞ্চ নির্মাণ, মাটিতে খড় বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা এবং হ্যাজাক লাইটের মাধ্যমে আলোকসজ্জা করা হয়।

গ্রামের মানুষই লোকনাট্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে অংশ নেন এবং আয়োজক গ্রামসহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা দর্শক-শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত হন। দর্শকদের রুচি ও চাহিদার প্রতি সম্মান রেখে লোকনাট্য পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে নানা আঙ্গিকের গান পরিবেশন করেন ছুকরিরা। পুরুষ মানুষকে নারী সাজিয়ে অনেকসময় 'ছুকরি' বানানো হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পেশাদার নারী যাত্রাশিল্পীকে টাকার বিনিময়ে এসব যাত্রাগান পরিবেশনার আসরেও নিয়ে আসা হয়। প্রায়সময় পুরুষেরা নারী সেজে লোকনাট্যের পরিবেশনায় অংশ নেন, তাঁদেরকে 'ফিমেইল অভিনেতা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রস্তুতকৃত মঞ্চের পাশেই একটি ঘরে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বসে থাকেন। সেখান থেকেই আসরে দৌড়ে এসে অভিনয়ে অংশ নেন। লোকনাট্যে হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, খোল, দোতারা, ডুগি, তবলা, জুড়িসহ নানা ধরনের দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। শুরুতেই বন্দনা পরিবেশনের মাধ্যমে লোকনাট্য শুরু হয়। সচরাচর এসব বন্দনায় টাকার বিনিময়ে ভাড়ায় আনা নারী অভিনেত্রী এবং নারীরূপী পুরুষ অভিনেতারাই অংশ নেন। প্রায় লোকনাট্যে 'বিবেক' চরিত্রে একজন অভিনেতা অভিনয় করে থাকেন। তিনি লোকনাট্যের প্রয়োজনমাফিক উপদেশমূলক গান পরিবেশন করে মানুষের ঘুমন্ত বিবেকবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

লোকনাট্যের একটি জনপ্রিয় ধারা 'ঢপযাত্রা'। এটি হিন্দু ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত। এসব ঢপযাত্রা ধর্মীয় যাত্রাগান অভিধায়ও ব্যাপক পরিচিত। এসব

www.pathagar.com

ঢপযাত্রার লেখকেরা গ্রামীণ সাধারণ মানুষেরাই। দীর্ঘদিন ধরে এসব ঢপযাত্রা হাওরাঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও অনেক ঢপযাত্রার লেখকের নাম জানা সম্ভব নয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রজন্মের অনেকেও ঢপযাত্রা রচনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। হাওরাঞ্চলে প্রধানত *সীতার বনবাস*, *নিমাই সন্ন্যাস*, *দাতা কর্ণ*, *দুর্গার মহিমা*, *নৌকাবিলাশ*, *কংসবধ*, *মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ*, *শনির চক্রান্ত*, *দাতা হরিশচন্দ্র*, *লক্ষ্মণ শক্তিমান*, *অভিমুন্য বধ* এসব ঢপযাত্রা খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *মনসামঙ্গলসহ* হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন পুরাণের একাধিক কাহিনি অবলম্বনে ঢপযাত্রা রচিত হয়ে থাকে। ঢপযাত্রার অভিনয়শিল্পীরা যাত্রার মতোই পোশাক-আশাক পরে মঞ্চে আসেন। কেবল ধর্মীয় রীতিনীতিটুকু পোষাকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। নারী-পুরুষের চরিত্র থাকলেও পুরুষেরাই সাধারণত নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। যাত্রা মঞ্চায়নের সময় একাধিক ধর্মীয় গানও পরিবেশিত হয়। সঙ্গত কারণেই হারমোনিয়াম, ঢোল, ঢোলক, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ–এসব নানা লোকবাদ্যযন্ত্র আবশ্যকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সুনামগঞ্জের দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ উপজেলায় ঢপযাত্রার প্রচলন বেশি। এসব এলাকায় ঢপযাত্রার অনেক পেশাদার শিল্পী ও সংগঠন রয়েছে। সাধারণত বর্ষা থেকে শরৎকাল পর্যন্ত ঢপযাত্রা বেশি পরিবেশিত হয়। দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ, বাসর, জন্মাষ্টমীর সময় এসব ঢপযাত্রার আয়োজন বেশ চোখে পড়ে। ঢপযাত্রা গানের শিল্পী হিসেবে সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার ডুমরা গ্রামের সুধাংশু, অসিত তালুকদার, শ্রীকান্ত দাস, নিশিকান্ত, মনমোহন দাস, সুজিত কুমার চৌধুরী, চয়ন, লিটন দাস, অবনী দাস, সুবল দাস; কৃষ্ণপুরের নিবারণ; আনন্দপুরের রণধীর দাস; নোয়াগাঁওয়ের পরেশ রঞ্জন চৌধুরী; ব্রাহ্মণগাঁওয়ের প্রসেনজিৎ; হরিপুরের বিমল দাস; আদিত্যপুরের যামিনী; পোড়ারপাড়ের রেনুকা রঞ্জন চৌধুরী; বিষ্ণুপুরের সুনীল; মুক্তারপুরের নীতেশ; হাসনপুরের দিলীপ দাস এবং জামালগঞ্জ উপজেলার ছয়হারা গ্রামের রাজেন্দ্র তালুকদারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশিত ঢপযাত্রার সবগুলোরই নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপি রয়েছে। নিম্নে 'অজ্ঞাতে পঞ্চপাণ্ডব' শীর্ষক একটি ঢপযাত্রার পুরো পাণ্ডুলিপি উল্লেখ করা হলো। উল্লেখিত ঢপযাত্রাটি রচনা করেছেন নিবারণ চন্দ্র দাস। এ ঢপযাত্রাটি সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলাসহ হাওরের বিভিন্ন উপজেলায় দীর্ঘ এক দশক ধরে মঞ্চায়ন হয়ে আসছে। ঢপযাত্রাটি সরাসরি লেখকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি পেশায় হোমিও চিকিৎসক। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তাঁর পিতার নাম : নিতাই চন্দ্র দাস, মাতার নাম : যশোদা বালা দাস। গ্রাম : কৃষ্ণপুর, ডাকঘর : আজমিরীগঞ্জ, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।

আট ভাই-বোনের মধ্যে নিবারণ চন্দ্র দাস পঞ্চম। তাঁর জন্মতারিখ : ১৬ আগস্ট ১৯৬৮ ইংরেজি। তিনি প্রায় ৯০টি ঢপযাত্রা, যাত্রাপালা ও নাটক রচনা করেছেন। এসব রচনার মধ্যে অন্তত ৬০টি বিভিন্ন সময়ে হাওরাঞ্চলে মঞ্চায়িত হয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি নিয়মিত ঢপযাত্রা লেখা ও অভিনয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এসব ছাড়াও তিনি অন্তত তিন শতাধিক কীর্তন, লোকনাথবন্দনা, ধামাইল, ত্রিনাথের গান রচনা করেছেন। পেশাগত কারণে তিনি বর্তমানে সিলেট শহরের করেরপাড়া এলাকায় বসবাস করছেন। তাঁর বাসায় প্রায় সপ্তাহখানেক যাতায়াতের পর পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করা গেছে। পাণ্ডুলিপিটি নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

অজ্ঞাতে পঞ্চপাণ্ডব

চরিত্রাবলি

দুর্যোধন : হস্তিনাপুরের রাজা
শকুনী : ঐ মাতুল
দুশাসন : ঐ ভ্রাতা
যুধিষ্ঠির : ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি
ভীম : ঐ ভ্রাতা
অর্জুন : ঐ ভ্রাতা
নকুল : ঐ ভ্রাতা
সহদেব : ঐ ভ্রাতা
বিরাট : মৎসদেশের রাজা
উত্তর : ঐ পুত্র
কিচক : ঐ সেনাপতি
বক : ধর্মরাজ
প্রসন্ন : সর্বহারা
দ্রৌপদী : পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী
শক্তি : আদ্যশক্তি।

প্রথম অংক
প্রথম দৃশ্য
স্থান : মন্দির

[প্রসন্নের প্রবেশ]

(বন্দনা)
প্রথমে বন্দনা করি, প্রভু নিরঞ্জন।
যাহা হতে এ পৃথিবী, হইল সৃজন ॥
দ্বিতীয় বন্দনা করি, শিব জটাধারী।
যাঁর সম নাহি আছে, ত্রিভুবন জুরী ॥
তৃতীয়ে বন্দনা করি, দেবী সরস্বতী।
যাঁর কৃপায় হইতে পারে, অগতির গতি ॥
পূর্বেতে বন্দনা করি, তথা দিবাকর।
এক দিকে উদয় যাঁর, চৌদিকে পশর ॥
পশ্চিমে বন্দনা করি, ব্রহ্মাণ্ডের সার।
যেথায় বসতি আছে, জননী গঙ্গার ॥
উত্তরে বন্দনা করি, পর্বতের আলয়।

www.pathagar.com

যেথায় অদ্বৈত গোসাই, নিয়াছেন আশ্রয় ॥
দক্ষিণে বন্দনা করি, কালিদহ সাগর।
যেথায় সর্বস্ব হারায়, চাঁদ সদাগর ॥
চৌদিকে বন্দনা করি, মধ্যে নিলাম স্থান।
পালা গান গাওয়ার আজ্ঞা, মাগে নিবারণ ॥

প্রসন্ন : এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র উনাকেই স্বরণ করুন, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

প্রসন্ন : (গীত)

মহাভারতের কথা, অমৃত সমান।
ব্যাস বলে শুনে ভবে, যত পুন্যবান ॥
আদিপূর্বে শুরু হলো পালার সূচনা।
ব্যাসমুনির মহাবাণী, আরম্ভ রচনা ॥
মূল বিষয় কৌরব পাণ্ডব, ধর্ম আর অধর্ম।
কিরূপে ধর্মের জয়, প্রকাশ তার মর্ম ॥
সভাপর্বে সগোত্রেতে, গুরুতর দ্বন্দ্ব।
শকুনির চক্রান্তে, পাণ্ডব হইল অন্ধ ॥
পাশায় ছলনা করে, কৌরবের শকুনী।
ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের, চোখে এল পানি ॥
সত্যেতে আবদ্ধ রাজা, ধর্ম যাঁর সার।
রাজবস্ত্র পরিত্যাগে, যায় রাজ্যের বার ॥
বনপর্বে দুঃখের কথা, শুন শ্রোতাগণ।
খাদ্যাভাবে ভীমসেনের, কণ্ঠগত প্রাণ ॥
দ্বাদশ বৎসর কাটাইল, পাণ্ডব ও পাঞ্চলী।
মৎসদেশে অজ্ঞাত বাসে, গেল সবে চলি ॥
বিরাট পর্বেতে অজ্ঞাত, কেহ নাহি জানে।
এই মতে পালাখানি, রচে নিবারনে ॥
মহাভারত স্বাক্ষী রেখে, রচে নিবারন।
অজ্ঞাতে পঞ্চ পাণ্ডবম শুরু যে এখন ॥

ঝুমুর : অজ্ঞাতে পঞ্চ পাণ্ডব, শুরু যে এখন হলো।

প্রসন্ন : যথা ধর্ম তথাই জয়, এ কথা জানিও নিশ্চয়। [প্রস্থান]

[শকুনির প্রবেশ]

শকুনি : হা হা হা। আমি বেঁচে থাকতে পঞ্চ পাণ্ডব কিছুতেই রাজত্ব করতে পারে না। আমি মাতুল। যেমন করেই হোক, কলে বলে কৌশলে রাজত্বটা আমার হাতের মুঠোয় আনতেই হবে। তারপর হা হা হা।

[দুর্যোধনের প্রবেশ]

দুর্যোধন : মামা, আপনাকে খুঁজে না পেয়ে নিজেকে খুবই অস্বস্তি বোধ হচ্ছি।

শকুনী : এখন তো কাছে পেলে ভাগ্নে?

দুর্যোধন : কিছুটা স্বস্তিবোধও পেলাম। মামা–

www.pathagar.com

শকুনী : জানিস দুর্যোধন, আমি কি চিন্তা করেছি?

দুর্যোধন : না বললে জানব কি করে মামা, তা অবশ্যই আমাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে থাকবেন।

শকুনী : তা একশো বার করব। কারণ আমি মাতুল। তোমার অনুমান দেখছি ঠিকই ভাগ্নে। তুমি আমার সহোদরার গর্ভজাত সন্তান। আমি কি তোমার অমঙ্গলের চিন্তা করতে পারি? আমি মাতুল। কিন্তু ভাগ্নে–

দুর্যোধন : মামা–

শকুনী : আমি ঠিক করেছি, কালই তোমাদের রাজ্য থেকে নিজেকে প্রত্যাবর্তন করব।

দুর্যোধন : কেন মামা? হঠাৎ এরই মধ্যে আপনি যদি চলে যান, তাহলে আমাদের উপদেশ দেওয়ার কে আছেন? পিতা অন্ধ, উনার উপর সব বিষয়ে আস্থা রাখা যায় না। তাই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আপনাকে স্মরণ করা ছাড়া আর কে আছেন মামা?

শকুনী : তবুও আমাকে যেতে হবে ভাগ্নে। আমি মাতুল। লোকমুখে আমার অপবাদের অন্ত নেই। চতুরদিক থেকে লোকজন আমার মুখে থু থু দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন? আমিতো এ বংশের কারো অমঙ্গল কামনা করিনে। আমি–আমি–

দুর্যোধন : মামা, মামা আপনি শান্ত হোন। লোকে যা বলে বলুক, কিন্তু আমিতো জানি, আমার গর্ভধারীনির সহোদর ভাই, আমার গুরুজন। বংশ মর্যাদায়ও আপনি কোনো অংশে কম না।

শকুনী : তারপরেও আমাকে যেতে হবে দুর্যোধন। কারণ আমি মাতুল। এ রাজবাড়ির প্রতিটি তৃণবৃক্ষ থেকে সবাই আমাকে বিদায় জানিয়েছে। তাছাড়া ভাবতেই পারছি না দুর্যোধন, যাদের আমি আপন ভাগ্নের চেয়ে কোনো অংশে কম দেখিনে, সে কেমন করে আমার অপবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিয়ে দিল। আমি মাতুল। এরপরেও তুমি–

দুর্যোধন : হ্যাঁ মামা, তারপরেও আপনাকে থাকতে বলছি। যে কালো হাত আপনাকে অপমানিত করেছে, আমি শুধু দু-হাত পেতে তার নামটা ভিক্ষে চাচ্ছি। আপনি বলুন, কে সেই অপদার্থ? আমি তাকে চরম শাস্তি দিব।

শকুনী : দুর্যোধন–

দুর্যোধন : মামা–

শকুনী : তুমি আমার আদরের ভাগ্নে। আমি মাতুল। শুধু বলি–

দুর্যোধন : বলুন–

শকুনী : যে কালো হাত আমাকে অপমানিত করেছে, তাকে কৌশলে এ রাজ্য থেকে বিতারিত করতে হবে। যেমনটি ঘটেছিল অযোধ্যায়, ঘটেছিল হরিশ্চন্দ্রের, যেমনটি শ্রীবৎস রাজার–

[দুশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা।

শকুনী : কি জন্য এসেছো দুঃশাসন? কি তোমার অভিপ্রায়?

দুঃশাসন : অন্তঃপুরের সংবাদ–

শকুনী : সংবাদ–

www.pathagar.com

দুঃশাসন : শুধু সংবাদ বলা যায় না মামা। আদেশনামাও বলতে পারেন।
দুর্যোধন/শকুনী : আদেশনামা–
দুঃশাসন : হ্যাঁ মামা, আমি ঠিক তাই অনুমান করেছি। মা আপনাকে এই মুহূর্তে রাজ্য ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছেন।
দুর্যোধন : দুঃশাসন– (ধমক দিয়ে)
দুঃশাসন : আমাকে ধমকালে কি লাভ হবে দাদা? আপন সহোদরা যার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, তার এক মুহূর্ত এখানে না থাকাই উত্তম। (দ্রুত প্রস্থান)
শকুনী : দুর্যোধন দুর্যোধন–
দুর্যোধন : আপনি শান্ত হোন মামা। এ একটি ষড়যন্ত্র শুরু হচ্ছে। আমি এর শেষ কোথায় দেখতে চাই। কোথায়? কোথায় মাতা?
[দুঃশাসনের পুনঃ প্রবেশ]
দুঃশাসন : মাতা এখন বিশ্রামে আছেন দাদা।
দুর্যোধন : দুঃশাসন–
দুঃশাসন : দাদা–
শকুনী : ওকে যেতে বলো দুর্যোধন। আমি মাতুল।
দুঃশাসন : ছোটদের রাষ্ট্রীয় আলোচনায় কর্ণপাত করা গুরুতর অপরাধ, তা আমি জানি মামা।
শকুনী : দুঃশাসন, তুমি এখন আসতে পার।
দুঃশাসন : ঠিক আছে মামা, আমি আসি। (প্রস্থান)
দুর্যোধন : মামা, আমি যতদূর অনুমান করছি. এ হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডবের ষড়যন্ত্র।
শকুনী : তুমি ঠিকই অনুমান করেছো দুর্যোধন। আমি মাতুল। আমি বুঝতেই পারছিনে আপন সহোদরা কোন বার্তায় আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। নারী জাতীকে বিশ্বাস করতে নেই দুর্যোধন।
দুর্যোধন : আপনি ব্যস্ত হবেন না মামা, আমি এর উপযুক্ত প্রতিউত্তর দিতে চাই।
শকুনী : তা অবশ্যই দিবে ভাগ্নে। আমি মাতুল। এর শেষ কোথায় না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না। দুর্যোধন–
দুর্যোধন : মামা–
শকুনী : পাশা, আমার পাশাটা ঠিক আছেতো ভাগ্নে?
দুর্যোধন : কেন মামা? আপনি না পাশা আর খেলবেন না বলে প্রতিজ্ঞিত।
শকুনী : তারপরেও আমাকে আর একবার, মাত্র আর একটিবার পাশা খেলতে হবে। এবং এটাই হবে আমার জীবনের শেষ খেলা। তারপর পাশা নিয়ে ঐ গঙায় বিসর্জন দিবে। আমি মাতুল।
দুর্যোধন : না মামা, পাশাই সকল অনর্থের মূল। এ চিন্তা আপনি ত্যাগ করুন।
শকুনী : দুর্যোধন–
দুর্যোধন : মামা–
শকুনী : এই খেলা সেই খেলা নয়। এটা নামে মাত্র পাশা খেলা হবে। তাতে আমি ষোল আনাই বে আইনীভাবে চাল চালিয়ে যাব। এতে যদি ধরাতে শকুনী

www.pathagar.com

নামের কলংক রটে, তাতেও আমি পিছ পা দিব না। আমি চরম প্রতিশোধ নিতে চাই, চরম প্রতিশোধ, হা হা হা।

দুর্যোধন : ঠিক আছে মামা, এখনই আমি তা করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

শকুনী : শকুনী, হা হা হা আমার নাম শকুনী। হা হা হা যে ভাবেই হোক পাণ্ডব বিহনে আমি একেশ্বর হয়ে থাকতে চাই। পাশাতেই হবে তার পরিণাম। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য
স্থান : পাশামঞ্চ

[দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

দুর্যোধন : বাসনা জেগেছে মাতুলের, পুনঃশ্চ খেলিতে পাশা তব সনে।

যুধিষ্ঠির : কেন এ কুকথা মুখে উচ্চারিলে ভাই। পাশাতে নৈরাশ্যের সৃষ্টি, পাশাতেই সব দুরাশা। এসব জেনেও–

দুর্যোধন : মাতুলের মন রক্ষার্থে আমার হেন বার্তা ঘোষণা করতে হচ্ছে। মনস্থ করেছি এটাই হবে কৌরব ও পাণ্ডব বংশের সবচেয়ে চূড়ান্ত খেলা।

যুধিষ্ঠির : চুড়ান্ত খেলা–

[শকনীর প্রবেশ]

শকুনী : হ্যাঁ হ্যাঁ। এটাই হবে চুড়ান্ত খেলা।

দুর্যোধন : এতে আমরাও একমত আছি মামা।

যুধিষ্ঠির : সামান্য পাশা খেলায়–

দুর্যোধন : ক্ষত্রিয়েরা কোনো কর্মেই পিছপা দেয়নি, আমিও দেব না।

শকুনী : তুমিও ক্ষত্রিয় সন্তান বাবা। অতএব এতে অসম্মতি আসার কোন প্রশ্নই আসে না। আমি মাতুল।

দুর্যোধন : ক্ষত্রিয় হয়ে অসম্মতির প্রশ্ন আসা তোমার মুখে শোভা পাবে না যুধিষ্ঠির। তাছাড়া গুরুজন যখন আদেশ করেছেন, তা একজন ধার্মিকের পক্ষে পালন করা শ্রেয়। এতে যদি নিজের জীবনও দিতে হয়, তাতে পিছপা হলে ধর্ম নষ্ট হয়।

যুধিষ্ঠির : মদ-জুয়া-পাশা–এ তিনে সর্বনাশা। তা জানা সত্ত্বেও একজন মান্যব্যক্তি কিভাবে ঐ উক্তি করতে পারেন?

দুর্যোধন : আমি তার জবাব দিতে চাইনি । আমি শুধু বলতে চাই, এক্ষুনি পাশা খেলা শুরু হবে। এতে ইচ্ছে হয় অংশ নাও, নতুবা রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। কোথায়, কে আছিস–

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম তব পদে ভ্রাতা।

দুর্যোধন : যাও ভাই দুঃশাসন, কোথায় আছে পাশা, এক্ষুনি নিয়ে আস। আর শুনো রাজ্যময় সংবাদ পৌঁছে দাও, এই মুহূর্তে কৌরব ও পাণ্ডব বংশের মধ্যে পাশা খেলা শুরু হবে।

www.pathagar.com

দুশাসন : সে আর বলতে হবে না দাদা। এক্ষুনি আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

শকুনী : যদি একান্তই পাশাতে তোমার অনিচ্ছা আসে, তাহলে হেঁটমণ্ডু দিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যাও। আমি মাতুল।

যুধিষ্ঠির : রাজসভায় যেহেতু পর্দাপন করেছি, সেহেতু পাশা আমি খেলব। তবে আপনার সঙ্গে খেলা–

দুর্যোধন : না, খেলা হবে আমার সঙ্গে। তবে পাশার চাল চালাবেন মামা। এতে যত রত্ন দিতে হয়, তা দিব আমি।

যুধিষ্ঠির : ঠিক আছে, খেলা শুরু করা যাক। এবারে পণ আমি করিলাম মাতুল, ইন্দ্রপ্রস্থে যত রত্ন দিতে নাহি ভুল। কিন্তু তুমি এত সম্পদ পাবে কোথায়?

দুর্যোধন : এই হস্তিনা ধন সম্পদে ভরপুর। তুমি জিতলে অবশ্যই আমি সমপরিমাণ অর্পণ করিব।

[পাশাসহ দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম মামা, এই নিন পাশা। (পাশা অর্পণ)

শকুনী : ঠিক আছে ভাগ্নে, তুমি আসতে পার।

দুঃশাসন : অন্তঃপুরের–

দুর্যোধন : রাখো তোমার অন্তঃপুর। যা বলা হয়েছে তাই করো।

দুঃশাসন : ঠিক আছে দাদা, আমি অন্তঃপুর চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

শকুনী : এবার শুরু করা যাক। আমি মাতুল।

[খেলা শুরু ও কৌরব জয়ী]

শকুনী : হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। প্রথমবারেই তো হেরে গেলে ধর্মপুত্র। খেলা কি বন্ধ করে দিব? আমি মাতুল।

যুধিষ্ঠির : না মামা, আমার অশ্ব আছে যত। অর্পণ করিতে আমি আছি সম্মত।

শকুনী : হে হে হে ঠিক আছে ভাগ্নে। আমি মাতুল। (খেলা আরম্ভ ও জয়ী কৌরব) এবারও তো হেরে গেলে ভাগ্নে?

যুধিষ্ঠির : আমার যত হস্তি-রথ, দাস-দাসী, সব হারালেও আজি মুখে থাকবে হাসি।

শকুনী : বলো কি বাবা যুধিষ্ঠির? হস্তি-রথ-দাস-দাসী–

দুর্যোধন : আপনি চাল চলিয়ে যান মামা। পণ কতক্ষণ থাকতে পারে দেখা যাবে।

শকুনী : ঠিক আছে (আবারও খেলা এবং কৌরব জয়ী) কি হলো বাবা পাণ্ডু পুত্র, খেলা কি বন্ধ করে দিব? আমি মাতুল।

যুধিষ্ঠির : না মামা, আমার যত যুদ্ধ এবং সারথী, সবকিছুই এবার পণ করিলাম। তবে একটি অনুরোধ মামা, অধর্মের আশ্রয় নিবেন না, এটাই আমার প্রার্থনা।

শকুনী : বলো কি বাবা? আমি মাতুল। আমি কি অধর্মের আশ্রয় নিতে পারি? ঠিক আছে, (আবার খেলা ও কৌরব জয়ী) এবার দেখলেতো ভাগ্নে।

যুধিষ্ঠির : (মাথায় হাত রেখে) হায়–

দুর্যোধন : কি হলো যুধিষ্ঠির, সামান্য ধন সম্পদ হারিয়েই মাথায় হাত। তাহলে এগুলি ফিরিয়ে দিব নাকি?

শকুনী : কি হে ধর্মের নন্দন, সর্বস্ব হারিলা আর কি করিবা পণ?

www.pathagar.com

যুধিষ্ঠির : আমার যত পশু, গাভী, উট ও মেষ রাজ্যসহ হারিলে খেলা আমার শেষ। এবারের খেলায় আমি তাই পণ করিলাম।

শকুনী : তাতো করবেই বাবা, আমি মাতুল। ঠিক আছে (খেলা আরম্ভ ও কৌরব জয়ী) এবার কি হবে ভাগ্নে?

যুধিষ্ঠির : আর যে আমার কিছুই নেই মামা।

শকুনী : তাহলে খেলা এবার বন্ধ করে দেই?

দুর্যোধন : না থাকলেতো খেলা বন্ধ করাই উচিত মামা।

যুধিষ্ঠির : না মামা, এইবারে করিলাম পণ, ভাতৃগণের যত রত্ন ধন।

শকুনী : বলো কিহে পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ, ঠিক আছে, হে হে হে চেয়ে দেখো বাবা। (খেলা আরম্ভ ও কৌরব জয়ী)

যুধিষ্ঠির : এবারও খেলায় আমি হেরে গেলাম। নকুল ও সহদেবকে আমি পাশায় পণ করিলাম।

শকুনী : ঠিক আছে, (তাড়াতাড়ি খেলা ও কৌরব জয়ী) হেরে তো গেলে ভাগ্নে, সৎ ভাই বলেই তাদের পাশায় ধরতে পারলে।

দুর্যোধন : এটা তোমার মোটেই উচিত হয়নি যুধিষ্ঠির। আপন ভাইদের সযত্নে রেখে নকুল আর সহদেবকে তুমি–

যুধিষ্ঠির : না, তব অনুমান মিথ্যে ভ্রাতা। এবারে পণ করিলাম ভীম আর অর্জুনকে।

শকুনী : তোমার মাথায় কি গোল ঢুকেছে ভাগ্নে? পাশাতে কেউ কোনোদিন আপন ভাইকে ধরতে শুনেছ? তারচেয়ে বরং দ্রৌপদীকে–

যুধিষ্ঠির : না মামা, আপন ভাইদের উপর যতটুকু দাবি রাখা যায়, অন্যের উপর ততটুকু রাখা যায় না।

শকুনী : ঠিক আছে। (খেলা ও কৌরব জয়ী)

যুধিষ্ঠির : আমি ভিন্ন অন্য কিছুই যে নেই মামা। এবার নিজেকেই পণ করিলাম।

শকুনী : হে হে হে ভুল করলে কুন্তির কুমার। ঠিক আছে। (খেলা ও কৌরব জয়ী)

যুধিষ্ঠির : হেরে গেলাম, সবকিছু হারিয়ে নিজেও হেরে গেলাম। হায় গোবিন্দ তুমি কোথায় দেবো, আমি যে আজ সবকিছু হারিয়ে–

শকুনী : দ্রৌপদীতো এখনো আছে হে কুন্তির কুমার। তাকে না হয় পণ করে নিজেকে উদ্ধার করে নাও।

যুধিষ্ঠির : তা কি কখনো হয় মামা, রূপেতে লক্ষ্মী, গৃহকাজে সুনিপুণা, গুণেতে সরস্বতী না যায় বর্ণনা। তথাপি আজ আমি তাকেও পণ করিলাম।

শকুনী : ধন্য বাবা ধর্মের নন্দন। চেয়ে দেখো পাশা আমি করিলাম অর্পণ (খেলা ও কৌরব জয়ী)

যুধিষ্ঠির : হায় গৌবিন্দ একি হলো ঠাকুর? (কান্না)

দুর্যোধন : এতই যদি কান্নাকাটি করতে হয়, তাহলে পাশা না খেলাই উচিত ছিল। ঠিক আছে, তোমার সর্বস্ব ফিরিয়ে নাও।

শকুনী : তা কি কখনো হয় ভাগ্নে। আমি মাতুল। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। ও মুখে যা বলে, পৃথিবী তিনখান হয়ে গেলেও তা আর পাল্টাবে না। হে হে হে তার মতো ধর্ম প্রতিজ্ঞ–

www.pathagar.com

দুর্যোধন : ঠিক আছে, উঠা যাক। কাল প্রভাতে ওদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : হে প্রভু, কোন পাপকর্মের ফলে আমাকে আজ সর্বস্ব হারাতে হলো? যাকে সর্বদাই ঘৃণা করে এসেছি, তার ছলনাতেই নকুল গেল, সহদেব গেল, অর্জুন গেল, ভীম গেলে, দ্রৌপদী গেল। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেও হেরে গেলাম। এখন আমি কি করব ঠাকুর? কার কাছে গিয়ে শান্তনার বাণী পাব? আমি যে আজ অন্ধ হয়ে গেলাম ঠাকুর, আমি যে অন্ধ হয়ে গেলাম। (বলিতে বলিতে প্রস্থান)।

শকুনী : হে হে হে আমি মাতুল। এবার আমি বুঝিয়ে দেব আমার হাত কতটুকু পাকিয়েছি। হে হে হে গোবিন্দ হে সবই তোমার ইচ্ছা প্রভু। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
স্থান : রাজপ্রাসাদ

[দুর্যোদনের প্রবেশ]

দুর্যোধন : হা হা হা। কোথায় তোমাদের দাম্ভিকতা? এখন রাজা, মুহূর্তে প্রজা। হা হা। কোথায় থাকবে তোমাদের গৌরব? আজীবন দাসত্বের বোঝা বয়েই চলতে হবে। হা হা হা, কোথায় দুঃশাসন–

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা। কি বাসনা জেগেছে তব, বলুন আমায়, পালন করিব তড়িত।

দুর্যোধন : যাও ভাই দুঃশাসন, কুলাঙ্গার পঞ্চ পাণ্ডবকে রাজসভায় আসতে বলো।

দুঃশাসন : ঠিক আছে দাদা, এক্ষুনি পঞ্চ পাণ্ডবকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। (প্রস্থান)

দুর্যোধন : হা হা হা হা হা। কোথায় সতীসাধ্বী পাঞ্চালী, কোথায় লুকাবে তোমার নারীত্ব? আজ হতে তুমি হবে আমার পদসেবিকা, আর আমি হা হা হা।

[পঞ্চপাণ্ডবসহ দুঃশাসনের পুনঃপ্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা, তব আজ্ঞামতো করেছি কাজ, বলুন কি দেবো তাদের সাজ?

দুর্যোধন : আমি জানতে চাই, দাসত্ব স্বীকারে তোমাদের প্রতিবাদি কণ্ঠ আছে কি নেই? যদি থাকে তাহলে বলতে পার। নতুবা আমার আদেশ মতো এই বাড়িতে তোমাদের সশ্রম দাসত্ব করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।

দুঃশাসন : ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মুখে যা বলেন, কাজেও তাই। অতএব এতে প্রতিবাদের কোনো হেতু আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

ভীম : শুনো দুঃশাসন, আমাদের আলোচনায় তোমার কর্ণপাত না করাই উচিত।

দুর্যোধন : তা কি আর হয় শক্তির সম্রাট। যত বড় ক্ষমতার অধিকারীই হউন, আজ তোমরা একজন অনাথের চেয়েও অধম। হা হা হা। শুনো আমার আদেশ। ইচ্ছে হয় পালন করবে, নতুবা সত্য লঙ্ঘন করে স্বস্থানে ফিরে যাবে।

ভীম : সময়ের সৎ ব্যবহার এভাবে করে না কৌরব জ্যেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির : আহা, থেমে যাও বৃকোদর। যার দিন যেভাবে যাওয়ার তা প্রভু পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে অনুশোচনা করার কি দরকার ভাই।

দুঃশাসন : দাসত্ব স্বীকার করলে মান সম্মান, লজ্জা ক্রোধ সর্বস্বই ত্যাগ করতে হবে।

www.pathagar.com

দুর্যোধন : আহা ভাই দুঃশাসন, তোমার বচনের সমাপ্তি টান। শুনো পঞ্চ পাণ্ডব, আজ থেকে কে কি কাজ করবে তা আমি নির্ধারন করে দিচ্ছি। পাণ্ডু জ্যেষ্ঠ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির খুবই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাই তাকে তাম্বুলি সাজানোর কাজে নিয়োজিত করলাম।

ভীম : দাদা। এত বড় অপমান? যে দুবাহুতে বৃক্ষকে তৃণসম উপড়িয়েছি, যে পদাঘাতে পর্বতকে দু'খান করেছি, আজ সামান্য কৌরবের হেন কটুক্তি! দাদা–

অর্জুন : রাগ সংবরণ করো ভাই। যে চোখের নিমিষে ত্রিলোক্য জিতিতে পারে, তার কাছে কৌরব শক্তি কি বিষয় বস্তু হতে পারে? শুধু দাদার মুখপানে চেয়েই যে, আমাকে নীরব থাকতে হচ্ছে।

ভীম : দাদা কথা বলো দাদা। আদেশ দাও দাদা। দাদা–

যুধিষ্ঠির : হায় গোবিন্দ, একি দৃশ্য আমি দেখছি ঠাকুর। না না ভীমার্জুন আমি যে সত্যে আবদ্ধ ভাই। আমাকে তাম্বুলি সাজানোর কাজই করতে হবে।

দুর্যোধন : করতে হবে হা হা হা। এইতো ধার্মিকের বচন। শুনো বৃকোদর, তবসম শক্তিশালী মম অগোচর। শুনো, আজ থেকে কৌরব বংশের যে যেথায় যেতে ইচ্ছুক, স্কন্ধে করে তুমি তথাস্থানে নিয়ে যাবে।

ভীম : দাদা দাদা তুমি চুপ করে থেকো না। রথের কাজ করব আমি?

দুর্যোধন : অনুতাপের বিষয় নয়। শুনো মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব, আজ থেকে রাজসভায় চামর বিতরণে নিজেকে নিয়োজিত রেখো। কাজ করার অনুতাপ নেই। রসনার যোগান দিতে হলে, একটু আধটু কাজ করতেই হয়। হা হা হা। শুনো দুঃশাসন, এক্ষুনি প্রবেশ করে অন্তঃপুরে, নিয়ে এসো পাঞ্চালীকে সভাস্থলে।

দুঃশাসন : আমি এক্ষুনি যাচ্ছি দাদা। (প্রস্থান)

নকুল : দাদা, যে সতীসাধ্বী নারী কোনো দিন অন্দরের বাহিরে যায়নি, তাকেও আজ রাজসভায় আসতে হবে?

সহদেব : চুপ করে থেকো না দাদা, নিরবতাই ধ্বংসের লক্ষণ। দাদা তুমি–

দুর্যোধন : দাদা আর কি বলবে সহদেব? যাও এবার অন্তঃপুরে, নিজকর্মে প্রবেশ করো রাজবেশ ত্যাগ করে। কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম হয়। (দ্রুত প্রস্থান)

ভীম : মৃত্যু, মৃত্যু কোথায়? কোথায় যমদূত? আমাকে তুমি অব্যাহতি দাও। আমি কারো বোঝা থাকতে চাই না।

অর্জুন : অনুতাপ করে কি লাভ ভাই, যে জ্যেষ্ঠজনার আদেশে শত সহস্র দাস-দাসী অনবরত শ্রম দিচ্ছে, আজ থেকে তাকে তাম্বুলী সাজানোর কাজে নিয়োজিত করা হলো। সে যদি করতে পারে, আমরা কেন পারব না ভাই? জ্যেষ্ঠজনা যদি দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত করে, তাহলে আমরা কোন মুখে সুখের প্রার্থনা জানাতে পারি।

নকুল : আমার মতে কৌরবদের সমূলে নিপাত করা উচিত। অবশ্য এতে যদি দাদার আদেশ থাকে–

www.pathagar.com

সহদেব : আমি আমার শাস্ত্রমতে যতটুকু দেখেছি, কৌরবদের ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে আসছে। বুধ ওদের পক্ষে ঠিকই কিন্তু শনি ও রাহু উভয়ে ওদের চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করছে।

ভীম : রাখো তোমার পাঞ্জিকথা। উপযুক্ত পদাঘাতেই ওদের বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল উত্তম। কিন্তু দাদা–

যুধিষ্ঠির : শাস্ত্রের লিখা একেবারে অনর্থ নয় ভাই। যে সহে, সে রহে। যার দিন যেভাবে যাওয়ার সে ভাবেই যাবে। শুধু মনের বিকারে অনুতাপ আসে। অসৎপ্রাণা মুখে যা বলে, তাই যদি করতে পারত তাহলে সৃষ্টি এতদিনে বিনাশ হয়ে যেত। এ কখনও সম্ভব নয় বলেই সৃষ্টি এখনও ঠিকে আছে। যখন উত্থান পতনের সময় হয়, তখনই অনুচিত কাজ অনুচিত বাণী মুখে আসে। পারলে থাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে হয়, না পারলে রাগ করতে নেই, অন্য কারো সাহায্য নিতে হয়। ঠিক আছে ভাই, এসো, দেখি গোবিন্দ কি লিখেছেন? (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য
স্থান : অন্তঃপুর

[দ্রৌপদী ও দুঃশাসনের প্রবেশ]

দ্রৌপদী : এ মত বার্তা আমি কভু নাহি শুনি। রাজপুত্র হারিয়েছে আপনগৃহিনী। পঞ্চ পাণ্ডব সম্বন্ধে আমি ভালোভাবেই অবগত আছি। জিজ্ঞেস করে এসো পাণ্ডুজ্যেষ্ঠ ধর্মের নন্দনকে। পাশায় আমায় হারিয়েছে আগে না নিজেকে?

দুঃশাসন : তব বার্তা বাহকের ভূমিকা পালন করতে আমি আসিনে পাঞ্চালী। কৌরব জ্যেষ্ঠের আদেশ, তোমাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে। তুমি যাবে কিনা তাই জানতে চাই?

দ্রৌপদী : তুমি হয়তো জানো না নরাধম, রুখিলে পাণ্ডব, রক্ষা নাহি জীবন। যাও তুমি–প্রাসাদে ফিরে, জিজ্ঞাসা করো কৌরব জ্যেষ্ঠেকে, এ বংশের কোন কুলবধূ কি কখনও প্রকাশ্য পরপুরুষের সম্মুখে গিয়াছে?

দুঃশাসন : রাখো তোমার হিতবাণী, যাবে কিনা এই আমি শুনি?

দ্রৌপদী : বার্তা বাহকের কাছে এর বেশি বলা প্রয়োজন মনে করি না।

দুঃশাসন : আমি শুধু বার্তা বাহক নিয়ে এখানে আসিনে পাঞ্চালী। দুর্যোধন কি আদেশ দিয়েছেন তা তুমি শুনবে?

দ্রৌপদী : না, শুনতে আমি চাই না।

দুঃশাসন : না চাইলেও তোমাকে আমার শুনাতেই হবে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় সেখানে না করিবে পর্দাপণ, কেশ ধরে যথাস্থানে লবই এইক্ষণ।

দ্রৌপদী : দুঃশাসন।

দুঃশাসন : রাখো তোমার দাম্ভিকতা। কৌরব জ্যেষ্ঠের পুঁজিবে চরণ, এক স্বামী ভজে তুমি রবে অনুক্ষণ।

দ্রৌপদী : সরে যা পাপিষ্ঠ লম্পট। আজি হতে তুই জানিলে নিশ্চয়, শিয়রে উপনিত মৃত্যু মহাশয়।

www.pathagar.com

দুঃশাসন : তাহলে তুমি যাবে না?
দ্রৌপদী : না কিছুতেই যাব না।
দুঃশাসন : তবে রে নষ্টানারী, আমি তোকে– (ধরিতে উদ্যত)
দ্রৌপদী : সরে যা, সরে যা কুলাঙ্গার। সরে যা বলছি।
দুঃশাসন : তোমাকে না নিয়ে গেলে যে আমার শির স্কন্দে ঠেকবে না। অতএব তোমাকে আমি (ধরিয়া) হা হা হা চলে এসো।
দ্রৌপদী : না না ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলছি, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।
দুঃশাসন : যাবে না? হা হা হা। আটকাবে কে? চলে আয় নষ্টানারী।
দ্রৌপদী : ওগো, কে কোথায় আছ, বাঁচাও আমাকে বাঁচাও–
দুঃশাসন : বাঁচাও। হা হা হা। দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচানোর কেউ নেই নষ্টানারী। চলে এসো। (টানতে লাগিল)
দ্রৌপদী : না না আমাকে ছেড়ে দে–
দুঃশাসন : ছেড়ে দিব? হা হা হা। চলে এসো। (টানিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান)।
[দুর্যোধনের প্রবেশ]
দুর্যোধন : এখনও যে ফিরছে না। তোমারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে দুঃশাসন। শূন্য হাতে এলে ফিরে মৃত্যুর নাহি রক্ষণ। কোথায় কে আছিস? (দ্রৌপদীকে টানিয়া দুঃশাসনের পুণঃপ্রবেশ)
দুঃশাসন : প্রণাম তব পদে ভ্রাতা। এই দেখুন চেয়ে, নিয়ে এসেছি পাঞ্চালীরে–
দুর্যোধন : হেঠমন্ডু হয়ে থেকে আর কি লাভ সুন্দরী? স্বামী তব পঞ্চ পাণ্ডব, দাসত্বেও কাজে নিয়োজিত সব। শুনো দুঃশাসন, এক্ষুনি নিয়ে এসব পাণ্ডব পঞ্চজন।
দুঃশাসন : ঠিক আছে দাদা। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)
দ্রৌপদী : তাহলে আমি অন্তঃপুরে চলে যাই?
দুর্যোধন : অন্তঃপুর হা হা হা। খুব যে সতী সতী ভাব দেখাচ্ছ। শুনো সুন্দরী, সতী আমি বলি তারে, এক স্বামী সেবে যেবা আজীবন ভরে। দু-স্বামীতে দ্বিচারীনি আর পঞ্চ স্বামীতে হয় বেশ্যা।
দ্রৌপদী : না, না, এ আপনি কি বলছেন? হায় গোবিন্দ, একি আমি শুনছি ঠাকুর। তুমি কি অন্তরনিহিত হয়েছে? হায় কৃষ্ণ–
দুর্যোধন : স্তব্ধ হও নষ্টানারী। পাপিষ্টা মুখে কৃষ্ণকে আর জড়াতে হবে না। পাশায় যুধিষ্ঠির তোমায় হারিয়েছে, তুমি কি বলতে চাও, তোমার উপর কোনো অধিকার নেই? শুনো নষ্টানারী কৃষ্ণা, পদসেবা করে মম জোড়াও তব তৃষ্ণা। হা হা হা।
দ্রৌপদী : হায় গোবিন্দ, তুমি কি নেই ঠাকুর? স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের মুখে আজ আমাকে হেন কথা শুনতে হলো? হায় ঠাকুর, এমনি পোড়া কপালে আমায় সৃষ্টি করেছ? তুমিও জেনে রাখো কৌরব জ্যেষ্ঠ, সত্য থেকে তুমি আজি হলে ভ্রষ্ট।
দুর্যোধন : ভ্রষ্ট? হা হা হা। ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে নারী। এক্ষুনি তার প্রতিউত্তর দিলে রক্ষা করার কে আছে তোমার? যাও তুমি অন্তঃপুরে, পদসেবা করিবে মম আজীবন ভরে হা হা হা।

www.pathagar.com

দ্রৌপদী : ধ্বংসের সময় নিকটেই উপনিত কৌরব জ্যেষ্ঠ। এখনও সংযত হওয়ার চেষ্টা করো। নতুবা–

দুর্যোধন : শান্ত হও নারী। তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ? আমি এক্ষুনি তার প্রতিউত্তর দিব।

[পঞ্চপাণ্ডবসহ দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা। দেখুন স্বচক্ষে চেয়ে, নিয়ে এসেছি পঞ্চ পাণ্ডবেরে।

দুর্যোধন : শুনো দুঃশাসন, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে করিও গমন। আমি পিতার সঙ্গে আলোচনায় যাচ্ছি। (প্রস্থান)

দ্রৌপদী : প্রভু, এহেন অপমান আজ আমাকে সইতে হলো। কোনো দিনতো শুনিনে স্ত্রীর বর্গসহ, পাশাতে হারিতে কেহ। রজঃস্বলা হয়ে একবস্ত্রে আমি বসেছিলাম। হেন সময় কেশে ধরে, রাজসভায় আনিল মোরে। হায় গোবিন্দ, এর চেয়ে আমার কেন মৃত্যু হলো না। (কান্না)

ভীম : দাদা, পরস্ত্রীকে দাসী হিসাবে নিয়োগ করা যায়, তাই বলে কামিনী–

দুঃশাসন : স্তব্ধ হও বৃকোদর। তাম্বলী সাজকের কোন আদেশ আজ আর কার্যকর হবে না। হা হা হা। বলো যুধিষ্ঠির পাশায় তুমি এই বেশ্যা নারীকে হারিয়েছ কি না?

নকুল : ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দুঃশাসন। বংশ ধ্বংস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে বলে দিচ্ছি। দাদা–

দুঃশাসন : কি, আমার সেবক আর আমাকেই এত বড় কথা? দেখাচ্ছি মজা। চলে আয় নষ্টা নারী, চলে আয় বলছি। (কাপড় টানতে লাগল)।

ভীম : দাদা–। তুমি চুপ করে থেকো না দাদা।

দ্রৌপদী : ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। হায় কৃষ্ণ, স্বামীগণের বর্তমানে আজ পরপুরুষের হাতে হেন অপমান। আমায় নিষ্কৃতি দাও প্রভু। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। মাতা বসুমতি তব গর্ভে আমায় স্থান দাও মা।

অর্জুন : দাদা একবার শুধু বলো, আমি তব কাছে দু-হাত পেতে ভিক্ষা চাচ্ছি। তুমি একবার বলো দাদা, আমি এর উপযুক্ত প্রতিউত্তর এক্ষুনি দিতে চাই।

সহদেব : শাস্ত্রের লিখা না যায় খণ্ডন। যার যে কর্মে পতন হওয়া, সে কর্ম ঘটলে যে তার পতন হয় না।

ভীম : রাখো তোমার শাস্ত্রের কথা। পদাঘাতে এক্ষুনি চৌখান করিতাম মাথা। শুধু দাদা–

দুঃশাসন : যে মেঘ হুংকারে গর্জে, তার শুধু গর্জনই সার। যবনিকায় কিছুই নেই হা হা হা। কি আছে তোমাদের শক্তি? নিজ স্ত্রীকে সভাস্থলে কেশে ধরেছি, যদি বলো তাহলে উলঙ্গও করতে পারি।

ভীম : স্তব্ধ লম্পট (হুংকার করিয়া)

দুঃশাসন : লম্পট হা হা হা। এই চেয়ে দেখ পাণ্ডুর নন্দন, চক্ষের সামনে খুলিব বসন। (দ্রৌপদীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল) হা হা হা।

দ্রৌপদী : ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে–

www.pathagar.com

ভীম, অর্জুন ও নকুলঃ দাদা, আদেশ দাও দাদা?
যুধিষ্ঠির : প্রভু, একি দৃশ্য আমি দেখছি ঠাকুর।
দ্রৌপদী : ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।
দুঃশাসন : ছেড়ে দিব? হা হা হা–
দ্রৌপদী : কোথায় প্রভু, কোথায় কৃষ্ণ– (কাপড় ছাড়িয়া দিয়া)
দুঃশাসন : কৃষ্ণ? হা হা হা। বস্ত্রখানি ছেড়ে দিয়েছে? হা হা হা এ্যাঁ, একি!
[গীত কণ্ঠে প্রসন্নের প্রবেশ]
প্রসন্ন : (গীত)

ওরে পাষান, ওরে অবুঝ, রাখলে না তার খুঁজ।
নিজের হাতে মন মজালে, নিলে না তার খুঁজ ॥
অর্ধমেতে মন মজালে, কি হবে তোর পরকালে।
ভাবলে না তুই একটি বারে, ভেঙে যাবে কঠিন ভূজ ॥
চিনলো না তুই এই নারীকে, বাণ বসালে নিজেই বুকে।
থাকবে না ধন অহং তোমার, হবেই তার সুজ ॥

প্রসন্ন : পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তোমাকে একদিন ভুগতেই হবে। সময়ের জন্য তৈরি থেকো বলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)
দুঃশাসন : প্রায়শ্চিত্ত? হা হা হা। কথা দাও পাঞ্চালী, তুমি আমার হবে?
দ্রৌপদী : না-না-না–
দুঃশাসন : না? হা হা হা। (আবার ধরিতে উদ্যত্ত) তবে রে নষ্টা নারী–
দ্রৌপদী : হায় কৃ–ষ্ণ–
[শকুনীর প্রবেশ]
শকুনী : একি করছ দুঃশাসন? আমি মাতুল। আমার বর্তমানে তোমার এ কাজ শোভা পায়নি বাবা। ছেড়ে দাও বাবা দুঃশাসন।
দুঃশাসন : মামা, যখন তখন তোমার প্রবেশ করা উচিত হয়নি।
শকুনী : পাগল ছেলে। মা লক্ষ্মী, তুমি মনে কিছু করো না মা।
দ্রৌপদী : হে ঠাকুর, আমার আর বাঁচার সাধ নেই প্রভু। আমাকে তুমি মুক্তি দাও ঠাকুর। যার সেবায় শত সহস্র দাসদাসী অর্হনিশি নিয়োজিত ছিল, যার স্থান ছিল পুরীর অন্দরে, যার মুখ পঞ্চজনা ভিন্ন অন্য কেহ কোনোদিন দেখেনি, তাকে আজ প্রকাশ্য রাজসভায় অপমান। হায় গোবিন্দ (উচ্চস্বরে কান্না)।
শকুনী : মা লক্ষ্মী, দুঃখ করো না মা। আমি মাতুল। বিধি যার কপালে যা লিখেছেন তা ঘটবেই। অনুতাপ করো না মা।
দ্রৌপদী : মামা (কান্না) আমি না সতী নারী। লোকমুখে আমি না সাধ্বী? সতীর কপালে প্রভু এমন লিখতে পারেন না মামা। জীবনে এমন কোনো পাপ কর্ম করেছি, তা আমার অগোচরে। স্বামীগণ ভিন্ন জীবনে অন্য কোনো পর পুরুষের মুখ দর্শন করেনি। তাহলে কেন আজ আমার এমন হলো? মামা জ্যেষ্ঠজনা কি কোনো দিন স্পর্শ করতে শুনেছ? ধরাতে যা কোনদিন হয়নি, আজ আমার জীবনে তাও হলো। আমার আর বাঁচার মূল্য কোথায়?

www.pathagar.com

শকুনী : মা লক্ষ্মী, আমি মাতুল। আমি তোমার বুড়ো ছেলে মা। আমার দিকে চেয়ে তুমি মনের কালিমা দূর করো মা।
দ্রৌপদী : মামা- মামা-(কান্না)
শকুনী : হে মা। আমি মাতুল। তুমি রাগান্বিত হলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে মা। মা পাঞ্চালী-
দ্রৌপদী : মামা-
শকুনী : তুমি আমার কাছে যা চাবে আমি তাই দিব মা। আমি মাতুল। কি চাও মা-
দুঃশাসন : মামা এ আপনি কি বলছেন মামা?
শকুনী : দুঃশাসন (চোখ ইশারা)। বলো মা, কি কামনা তোমার-
দ্রৌপদী : মামা-
শকুনী : হে মা, বলো কি তুমি চাও?
দুঃশাসন : রসালাপের সময় আমার হাতে নেই মামা। যাচ্ছি আমি অন্তঃপুরে নিমিষে পাঠিও সেথা পাঞ্চালীরে। (দ্রুত প্রস্থান)
শকুনী : হে হে হে পাগল ছেলে। মনে কিছু করো না মা। আমি মাতুল। ওদের ক্ষমা না করলে আমি দুঃখ পাব মা। বল তুমি কি চাও?
দ্রৌপদী : বর আমি তব কাছে অন্য কিছু না চাই। দাসত্ব গুছিবে পাণ্ডব অন্য ভাবনা নাই।
শকুনী : তথাস্তু মা তথাস্তু। পঞ্চ পাণ্ডবকে আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। আমি মাতুল। পাণ্ডবেরা এ বাড়িতে দাসত্বের কাজে নিয়োজিত থাকলে, কুখ্যাতির অন্ত থাকবে না মা।

[দুঃশাসনের পুনঃপ্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম মামা। অন্তঃপুরের সংবাদ-
শকুনী : একটু পরে শুনছি তোমার সংবাদ। মা লক্ষ্মী একবর তোমার যোগ্য নয়। আরেক বর চাও মা।
দ্রৌপদী : আমার স্বামীগণের দাসত্ব মোচন করতে পেরেছি? এর অধিক আর কি চাওয়ার আছে মামা?
দুঃশাসন : নাহি দেখি, নাহি শুনি লোকবদনে। স্ত্রী হইতে স্বামীর মুক্তি হয়েছে ভুবনে। তাহলে নিশ্চই দুর্যোধনের মন যোগিয়েছে পাঞ্চালী-
ভীম : স্তব্ধ হও লম্পট। শুধু দাদার মুখপানে চেয়ে নিজেকে সংবরণ করেছি। নতুবা কৌরব বংশ, পদাঘাতে করিতাম ধ্বংস।
শকুনী : যাও তুমি অন্তঃপুরে, বলো কৌরব জ্যেষ্ঠরে, পাণ্ডবসহ সব ফিরিয়ে দিয়েছি।
দুঃশাসন : প্রণাম মামা। আমি এক্ষুণি দাদার কাছে সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। (প্রস্থান)
শকুনী : মা পাঞ্চালী, এবার বলো দ্বিতীয়ে কি তোমার অভিপ্রায়? আমি মাতুল। তোমার সব বাসনাই আমি পুরণ করব মা।
দ্রৌপদী : তাই যদি হয়, তবে সশস্ত্র বাহন আর সৈন্যগণ, দ্বিতীয়ে আমি এই চাচ্ছি রাজন।
শকুনী : তথাস্তু মা, তথাস্তু। এবার তুমি তৃতীয় বর চাও মা। যদি এই বুড়ো ছেলের শির আগলিয়ে নিতে চাও, তাও আমি দিব মা। আমি মাতুল।
দ্রৌপদী : না মামা, অধিকে লোভ আসে, লোভে আসে পাপ। আর পাপ থেকেই ধ্বংসের সৃষ্টি হয়। আমি আর কিছুই চাহি না মামা। শাস্ত্রে শুনেছি বৈশ্য চায় এক, ক্ষত্রিয় লবে দুই, দ্বিজ লবে তিন। তা জানা সত্বেও আপনি-

www.pathagar.com

শকুনী : ঠিক আছে মা লক্ষ্মী। তোমরা এবার স্বস্থানে গমন করতে পারো। আমি মাতুল। আমি কি তোমাদের অমঙ্গল কামনা করতে পারি?
দ্রৌপদী : (প্রণাম করে) সত্যি মামা, এত মহৎজন আমি আর দেখিনে।
শকুনী : যাও বাবা যুধিষ্ঠির। তোমাদের স্বস্থানে তোমরা গমন করো (সবাই প্রণাম করে হেঁঠমুন্ডে প্রস্থান) হে হে হে এবার দু-নম্বর চাল চালাব। তোমরা আমাকে যত বড় ভেবেছ, ঠিক তত বড় আঘাত আমি তোমাদের দিব। আমি মাতুল।

[দুর্যোধনের প্রবেশ]

দুর্যোধন : মামা দুঃশাসনের কাছ থেকে যে সংবাদ পেলাম তা কি সত্যি?
শকুনী : হে বাবা দুর্যোধন। আমি মাতুল। আমি যা করি, সবই তোমার মঙ্গলের জন্যই।
দুর্যোধন : হিতোপদেশ শুনতে আমি এখানে আসিনে মামা–
শকুনী : আহা, মাথা গরম করলেই বিপদ ঘটে। পাণ্ডবেরা এখানে থাকলে কখন কি হয় বলা যায় না বাবা। ভীম বেটা রেগে গেলে সমূলে নিপাত হওয়ার আশংকা আছে। আমি মাতুল। তাই আমি স্থির করেছি–
দুর্যোধন : কি স্থির করেছেন?
শকুনী : এখনও পাণ্ডবেরা নিজ স্থানে পৌঁছায়নি। তাই ভাবছি, দূত পাঠিয়ে ওদের রাজসভায় ফিরিয়ে আনব।
দুর্যোধন : তারপর–
শকুনী : তারপর আবার হবে পাশা, পাঠাতে হবে বনে, কোন সংশয় না থাকিবে মনে।
দুর্যোধন : এখনতো ওরা নাও আসতে পারে?
শকুনী : একশোবার আসবে। আমি মাতুল। আমার সংবাদ পেলে ওরা যায় কোথায়।
দুর্যোধন : ঠিক আছে মামা, কোথায় কে আছিস?

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা। কি জন্য আমাকে স্মরণ করেছেন?
দুর্যোধন : যাও দুঃশাসন তড়িতে, পাণ্ডবদের গিয়ে বল পুনঃশ্চ পাশা খেলিতে।
দুঃশাসন : যথা আজ্ঞা ভ্রাতা। আমি এক্ষুনি সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। (প্রস্থান)
দুর্যোধন : পাশা কোথায় রেখেছ মামা?
শকুনী : হে হে হে (পাশা বের করে) এই তো বাবা। আমার সঙ্গেই এনেছি। আমি মাতুল। সবদিক চিন্তা করে, তারপর তোমাকে পা বাড়াতে হয়। তাইতো আমি ওদের বনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

[দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবসহ দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা। তব অজ্ঞাতমতো, পাণ্ডবেরে এনেছি ত্বরিত। যাচ্ছি নিজ স্থানে আসিব প্রয়োজনে। (প্রস্থান)
যুধিষ্ঠির : কি জন্য পুনঃশ্চ ডেকেছ দেব?
শকুনী : বাসনা জেগেছে মনে, পুনঃশ্চ পাশা খেলিতে তব সনে।
যুধিষ্ঠির : গুরুজনের আদেশ আমি কোনোদিন অমান্য করিনে আর করবও না।
ভীম : পাশা নাহি খেলা হবে আবার, ইচ্ছে হয় যুদ্ধে এসো, দেখি কত শক্তি কার। মোর পদঘাত, খেলে প্রাণপাত। নতুবা বাহুতে ধরে–

www.pathagar.com

অর্জুন : না ভাই, কৌরব জিনিতে অন্যের নাহি হবে যেতে। চোখের নিমিষে ত্রিলোক করেছি জয়। এক্ষুণি দিতে চাই মম পরিচয়।

যুধিষ্ঠির : যুদ্ধ জীবের শান্তি দিতে পারে না ভাই।

ভীম : আর পাশা?

যুধিষ্ঠির : তাও সর্বনাশা।

দুর্যোধন : আর গুরুজনের বাক্য অমান্য করা?

যুধিষ্ঠির : তাতেও পাপ।

ভীম : পাপ পুণ্যি বুঝার সাধ আমার নেই। ইচ্ছে হয়, আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে–

শকুনী : তা কি হয় বাবা ভীম। আমি মাতুল।

সহদেব : দেখিলাম মাতুল শাস্ত্র বিচারিয়া, জিতিবে কৌরব পাণ্ডব হারিয়া। ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য যাবো মোরা বনে, মৃত্যুর জন্য তৈরি হবে বসে সিংহাসনে।

নকুল : নাহি প্রয়োজনে খেলা, নাহি দিব রণ। সবিনয় হলে মোরা করিব গমন।

যুধিষ্ঠির : তা হয় না নকুল। একেতো আহ্বান তদুপরি গুরুজনের আদেশ। ধার্মিক যতই ক্লেশ পাক, তথাপি ধর্মকে ছাড়ে না।

শকুনী : শুনো বলি ধর্মের নন্দন, কৌরব আজ্ঞা করে খেল করি পণ। যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে রবে। অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্ত ভাবে থাকবে। অজ্ঞাত বৎসরে যদি ব্যক্ত হয়। পুনরূপি বনবাস আর অজ্ঞাত উভয়।

দ্রৌপদী : মামা, আপনি পূজনীয় ব্যক্তি। আপনাকে উপদেশ দেওয়া কি আমার শোভা পায়? চরণে ধরি আমি বলি যে আপনাকে, নিষ্কৃতি দাও মোদের ফেলিয়া পাশাকে।

দুর্যোধন : বা বা, চমৎকার সুন্দরী। লোকে বলে পাঞ্চালী সম সতী নাহি হয়, আদেশে মামাকে আজ দিলে পরিচয় হা হা হা।

ভীম : স্তব্ধ হও লম্পট। তোমার হেন চিন্তা ত্যাগ করো।

দুর্যোধন : আমাকে আদেশ দেওয়ার তুমি কে?

অর্জুন : আদেশ নয় কৌরব জ্যেষ্ঠ। তুমিও জেনে রাখো অধঃপতনের দ্বার খুলে দিয়েছ। তার যবনিকা আর বেশি দূরে নয়।

যুধিষ্ঠির : তর্ক নয় ভাই, গুরু বাক্য আমাকে পালন করতে হবে।

শকুনী : তাতো অবশ্যই। এজন্যইতো তোমার দেশময় সুখ্যাতির অন্ত নেই। আমি মাতুল। তাহলে পণ ঠিকই রইল কেমন?

দ্রৌপদী : এ্যাঁ না, মানে আমি বলছিলাম–

যুধিষ্ঠির : বলাবলি করে আর লাভ নেই কৃষ্ণা। আপনি খেলা শুরু করুন মামা।

ভীম : দাদা বনে গেলে আমরা খাব কি?

যুধিষ্ঠির : আমি যা খাব, তোমরাও তাই খাবে। মামা, আপনি খেলা শুরু করুন।

শকুনী : ঠিক আছে বাবা, আমি এক্ষুনি খেলা শুরু করে দিচ্ছি। গোবিন্দ হে, সবই তোমার ইচ্ছা। আমি মাতুল।

যুধিষ্ঠির : সবাই বলে পাশা অনর্থের মূল। অধর্ম করিয়া তুমি না জিন মাতুল। তব পদে আমার শুধু এই মিনতি মামা।

www.pathagar.com

শকুনী : কি যে বলো বাবা যুধিষ্ঠির। বসো তুমি, মন করো স্থির। যার ভাগ্যে যা লিখা হইয়াছে, তাই এখন প্রমাণ হবে। (খেলা শুরু ও কৌরব জয়ী) কি হলো বাবা, তবে কি তোমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছ?

ভীম : আমার প্রথমেই বাঁধা ছিল দাদা।

দ্রৌপদী : সে চিন্তা করে আর লাভ কি? যার কপালে দুঃখ আছে তাকে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। এতে অনুতাপের কি আছে?

যুধিষ্ঠির : না, আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব না। কৃষ্ণা তুমি–

দ্রৌপদী : আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব।

দুর্যোধন : যাবেতো অবশ্যই। মুর্খ পিতা যাজ্ঞ সেন যখন ক্লিবের হাতে তুলে দিয়েছে, তখন আর কি করবে? তবে, আমি যা বলছি তা তুমি শুনবে?

দ্রৌপদী : নারী পিশাচের কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না।

দুর্যোধন : না চাইলেও তোমার হিতের জন্য আমাকে বলতেই হচ্ছে। বনে দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই। তার চেয়ে কৌরব বংশের যে কোনো একজনকে ভজে দিব্যি আরামে অন্তঃপুরে থাকাই তোমার শোভা পায়–

অর্জুন : ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন কৌরব জ্যেষ্ঠ। আজি আমি করিলাম পণ, সবংশে মম হাতে হইবে নিধন।

ভীম : পদাঘাতে নিশ্চিহ্ন করিব মস্তক, একথা মনে রেখ জ্যেষ্ঠ কৌরব।

নকুল : এবারের পাশায় যদি দাদা না থাকিত, মম হাতে তোমাদের প্রাণ চলে যেত।

যুধিষ্ঠির : আহা কার বিরুদ্ধে এত বলা হচ্ছে ভাই? ওরাও যে আমাদেরই।

সহদেব : আমিও তাই বলছি। পরাজয় বরণ করে হেন প্রতিজ্ঞা শোভা পায়নি। আগে বনবাস মুছন হোক, তারপর–

যুধিষ্ঠির : এসো ভাই, প্রভু যার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তা ঘটবেই। সত্যে অটল থাকলে কে আমাদের ক্ষতি করবে? চল ভাই, দেখি সমুদ্রের তীর কোথায়? ভাই কৌরব জ্যেষ্ঠ, প্রজাদের সুখে রাজার কাজ। সর্বদা প্রভুকে স্মরণ রেখো, রাষ্ট্র পরিচালনায় মোটেই বিশৃঙ্খলা ঘটবে না। প্রজারা সুখে থাকলে, প্রভুরও আনন্দের সীমা থাকে না। তুমি বিশেষজ্ঞ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার শোভা পায়নি। মামা, আপনি শ্রদ্ধেয় পুঁজনীয় ব্যক্তি। বিশেষে আপনার সমতুল্য জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিনে। বনে চলে যাব, প্রজাদের দুঃখ হলে সেখানে থেকেও শান্তি পাব না। তাই বলছি–

শকুনী : তা কি আর বলতে হয় বাবা? আমি মাতুল। প্রজারা সুখে থাকুক, তোমরা সুখে থাক, এইতো আমি চাই। মঙ্গলমতেই ফিরে এসো বাবা, আমি ঠাকুরের কাছে এই কামনা করি।

যুধিষ্ঠির : আসি মামা (প্রণাম করিয়া)

দ্রৌপদী : (গান)

হস্তিনাও সুখে থাকো, থাকো দিবানিশি
হস্তিনাও ছাড়ি আজি হব বনবাসী ॥
বনে যাব ফল খাব থাকব বন মাঝে।
যত দুঃখ কষ্ট আসুক, যাব কৃষ্ণ ভজে ॥

www.pathagar.com

দ্রৌপদী : স্বামী–
যুধিষ্ঠির : দুঃখ করে লাভ নেই দ্রৌপদী। আসি মামা। দ্রৌপদী–
দ্রৌপদী : স্বামী–
যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী (আলিঙ্গন)। এসো ভাই অর্জুন। (পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রস্থান)
[গীত কণ্ঠে প্রসন্নের প্রবেশ]
প্রসন্ন : নাই নাই রাজলক্ষ্মী জেগে নাই।
পশুপাখি সব করে কলরব,
কোথা গেলে শান্তি পাই ॥
অর্ধমের বাণ ডেকেছে,
ধর্ম বুঝি আর নাই,
হে নিঠুর দয়াল,
কাঁদি ফিরে হায়,
বল কোথায় যাই ॥
প্রসন্ন : স্বধর্ম সর্বগুণে শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। তদ্রুপ পরধনে লোভ করা গুরুতর অপরাধ। তাই বলছি সময় থাকতে সাবধান। (প্রস্থান)
শকুনী : হে হে হে আমি মাতুল। দূরহ অপদার্থ। এবারের চালটা কেমন হলো দুর্যোধন?
দুর্যোধন : কিন্তু মামা, ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ সীমান্তের কথা চিন্তা করেছ?
শকুনী : শেষ সীমান্ত হে হে হে। আমি মাতুল। এর শেষ ওরা খুঁজেও পাবে না।
দুর্যোধন : খুঁজেও পাবে না–
শকুনী : সেটা হবে আমার তিন নম্বর চাল। আমি মাতুল। আমি কি জানিনে যদি ওরা ফিরে আসতে পারে, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে? চল বাবা এবার বিশ্রাম করা যাক। আমি মাতুল। (প্রস্থান উদ্যত)
[ধর্মের প্রবেশ]
ধর্ম : শুনো হে কৌরব জ্যেষ্ঠ, তব কারণে সবার হবে কষ্ট। নিক্ষত্রা হবে ধরা ভীমার্জুনের ক্রোধে, সবাই মরিবে তব অপরাধে। (অদৃশ্য)
শকুনী : একি–!
দুর্যোধন : সে চিন্তার প্রয়োজন নেই মামা। চলুন এবার শান্তিতে বিশ্রাম করা যাক।
শকুনী : হে, তাই চলো বাবা। আমি মাতুল।

দ্বিতীয় অংক
প্রথম দৃশ্য
স্থান : মৎসদেশের রাজবাড়ি

[বিরাট ও কিচকের প্রবেশ]
কিচক : দূত মুখে প্রকাশ, দ্বাদশ বৎসরের তরে পাণ্ডব বনবাস।
বিরাট : সংবাদটা কি তুমি শুভ মনে করেছ? যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁর শাসনে প্রজারা সুখে দিনাতিপাত করত। আর দুর্যোধন, বংশের কুলাঙ্গার। রাজ্যের ক্ষমতা যখন হাতে পেয়েছে, এতে সৎ ব্যবহার না হয়ে, অসৎ ব্যবহারই হবে।

www.pathagar.com

কিচক : অসৎ আছে বলেই তো সত্যের মূল্যায়ন। আমার ভাষায় দুর্যোধনকে অসৎ বলা যায় না।

বিরাট : তোমার আবার ব্যক্তিগত ভাষা আছে নাকি?

কিচক : তাতো একশবার। পণ করে পাশা খেলা হয়েছে, এতে পাণ্ডবেরা হেরে গেল। তাতে অসৎ পন্থাটা কোথায়?

বিরাট : আমি তা বলিনে, কথাটা হচ্ছে যুধিষ্ঠির ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ইচ্ছাকৃত ভাবে উনি পাশা খেলবেন না। হয়তো কেনো সংকটে পড়ে–

কিচক : সে যাই হোক, খেলা তো হয়েছে। ইচ্ছাকৃত হোক, আর সংকটে পড়েই হোক, বিষয়তো ঘটে গেল। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। আমার যতদূর সম্ভব, দুর্যোধনও সহানুভূতির দৃষ্টি দেখিয়েছিল।

বিরাট : দেখালে কি আর বনে আসতো? একজন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্নিবেশ পাওয়া যে কি তা তুমি–

কিচক : আমি বুঝব না। হা হা হা।

বিরাট : তুমি হাসছ? পরশ পাথরের সংস্পর্শে লোহাও সোনা হয়। আর ধর্মের প্রভাবে অধর্মের পতন ঘটবে না?

কিচক : তা যা ঘটবে বলে শেষ করার নয়। সাজ সজ্জায় কতজনে দেখাচ্ছে সাধুতা, তদন্ত করিলে মিলে শতেক রক্ষিতা।

বিরাট : এ হচ্ছে তোমার চিন্তাধারার কথা। পাণ্ডব সম্বন্ধে এমন কোনো রটনা রটেনি যা রটেছে কৌরবদের সম্বন্ধে। আসলে ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এলে, হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না।

কিচক : তা আমি মানিনে মৎস্যাধিপতি। আপনিওতো একজন রাজা, যে ধর্মের গুণকীর্তনে মগ্ন। সৈন্যসামন্ত বিদায় করে দিন রাত শুধু ঠাকুর দেবতার নাম জপতে থাকলে, রাজ্যটা কি টিকিয়ে রাখতে পারবেন? এতে কি আপনি বলতে পারুন অধর্মের সৃষ্টি হয়েছে?

বিরাট : হবে না মানে, সৈন্যদের বিদায় করে দেওয়াই তো অধর্ম। যে কোনো একটি রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গইতো হচ্ছে সেনাবাহিনী।

কিচক : আর সৈন্যদের রেখে অন্যদের ধমকিয়ে রাখার নাম ধর্ম?

বিরাট : তা যদি বুঝতে, তাহলে তোমার নাম কিচক না হয়ে অন্য নামই হতো।

কিচক : তাতো অবশ্যই। নামটিতো আর আমি রাখিনে। মাতাপিতা যেহেতু নির্বাচন করেছেন, অতএব–

বিরাট : এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। উত্তরকে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য তোমাকে ডেকেছি। আমি এক্ষুনি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

কিচক : পাণ্ডব বনবাস হা হা হা। তাহলে পরমা সুন্দরী দ্রোপদী, অবশ্যই তুমি কৌরবদের অধীনে আছো। বা বা কি চমৎকার ভাগ্য কৌরবদের। হা হা হা।

[উত্তরের প্রবেশ]

উত্তর : পিতৃ আদেশ মতো–

কিচক : কে, উত্তর? আচ্ছা ভাগ্নে স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রী কোথায় আশ্রয় পেতে পারে?

উত্তর : কেন মামা, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে।

www.pathagar.com

কিচক : আত্মীয়? হা হা হা। আত্মীয়।
উত্তর : কি হয়েছে মামা? তুমি হাসছ কেন?
কিচক : এ্যাঁ! না, মানে, দ্রৌপদী তাহলে–
উত্তর : দ্রৌপদী কে মামা?
কিচক : এ্যাঁ! দ্রৌপদী। মানে সতী সাধ্বী পরমা সুন্দরী এ্যাঁ! না, থাক বাবা
উত্তর : না মামা, তুমি বলো, আমি শুনতে চাই দ্রৌপদী কে?
কিচক : এমন একটা সুন্দরী যদি আমার হাতের মুঠোয় পেতাম। (স্বাগত)
উত্তর : মামা–
উত্তর : দ্রৌপদী কে মামা?
কিচক : দ্রৌপদী হা হা হা। থাক এসব কথা। যখন বড় হবে তখন বুঝবে বাবা। এখন এসো

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য
স্থান : বন

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : (গান) কি লিখিল বিধি মোর, কে বা তাহা জানে?
রাজবস্ত্র পরিত্যাগে, বাস করি বনে ॥
নাহি পাইও রাজভুগ, থাকি মেঘে শীতে
এ নিদানে ডাকি প্রভু, ত্বরাও নিজগুণে ॥

[ভীম ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : দুঃখ করে কি লাভ কৃষ্ণা। শ্রীরামচন্দ্রও তো অযোধ্যাপতি ছিলেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য সীতা ও অনুজ লক্ষ্মনসহ বনে পর্দাপন করেছিলেন।
দ্রৌপদী : তাতে আমার দুঃখ নেই স্বামী। শুধু বলি কপটে হারিয়ে দুর্যোধন আমাদের বনে পাঠাল। তিল পরিমান করুণাও সে আমাদের দেখায়নি। সভায় অবর্ণনীয় অপমান, তাতেও আমার দুঃখ লাগেনি। দুঃখটা শুধু–
যুধিষ্ঠির : দুঃখ করে কি লাভ কৃষ্ণা?
দ্রৌপদী : লাভ-লোকসানের প্রশ্ন নয়। যে পুষ্পশয্যায় সুখে নিদ্রা যেত। রাজভুগ উদর ভরে খেত, রাজ কর্মচারীরা অর্হনিশি যাকে বেষ্টন করে থাকত, তাকে আজ কুশবনে ঘুমাতে হচ্ছে। খেতে হচ্ছে ফলাদি, আর বেষ্টন করে আছে জঠাধারী সন্ন্যাসী।
যুধিষ্ঠির : তাতে দুঃখ করতে নেই কৃষ্ণা–
দ্রৌপদী : একজন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যা থাকা প্রয়োজন, তোমাতে তা একান্তই অনুপস্থিত। ক্ষত্রিয়ের ক্রোধই হচ্ছে অলংকার। কিন্তু তোমাতে–
ভীম : তুমি ঠিকই বলেছ কৃষ্ণা। আঘাতের বদলে আঘাত, পদাঘাতের বদলে পদাঘাত। অস্ত্রের বদলে অস্ত্র আর অপমানের বদলে প্রতিশোধ নেওয়াই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।
যুধিষ্ঠির : ক্রোধসম পাপ আর জগতে নেই ভাই। ক্রোধে বশিভূত হলে গুরুলঘু জ্ঞান থাকে না। ক্রোধে আত্মা বৈরী হয়। অঙ্গে অস্ত্র মারে, নতুবা পানিতে ডুবে

www.pathagar.com

মারা যায় কিংবা বিষপানে আত্মহত্যা করে। ক্রোধে যে বিরত থাকে সেই ইহলোক ও পরলোক থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। ক্ষমাসম ধর্ম ত্রিলোকে আর নাই ভাই। তাই ক্রোধ থেকে বিরত থাকলে–

ভীম : সপরিবারে বৃক্ষের নীচে কালাতিপাত কার যায়, তাইতো?

যুধিষ্ঠির : বলতে না বলতেই তোমার রাগের উদ্ভব ঘটে। ক্রোধান্বিত হলে সৃষ্টি ধ্বংস করা যায়, কিন্তু রক্ষা করা যায় না।

ভীম : তা না যাওয়ারই কথা। যত অনিষ্টের মূল শুধু তুমি। নতুবা কৌরবেরা যে ব্যবহার দ্রৌপদীকে করেছে, তখনই তার সমুচিৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম ত্যাজ দেখাইবে, ভূজ বলে রিপু জিনি পৃথিবীতে ভুঞ্জীবে।

যুধিষ্ঠির : তোমাকে যে কি বলে–

ভীম : বলার কি আছে তোমার? নিজের রাজ্য ত্যাগ করে অন্যের রাজ্যে থাকতে লজ্জা করে না তোমার?

যুধিষ্ঠির : আহা বৃকোদর।

ভীম : বৃকোদর-হাতিদর-গদাদর যা খুশি বলো, সারাদিন যায় ক্ষিদে শরীর কাঁপে, রাত যায় অনিন্দ্রায়। এত কষ্ট, তারপরেও বলতে চাও ক্রোধান্বিত হওয়া পাপ?

যুধিষ্ঠির : ভাই বৃকোদর (হাসি মুখে)

ভীম : হাসতে পারছ, তোমার মুখে হাসি আছে?

দ্রৌপদী : থাক, এতে ক্রোধান্বিত হলে কি হবে? যা হওয়ার তাতো হয়েই গেল।

যুধিষ্ঠির : প্রথমবারের খেলায় হেরে গেলাম, ক্রোধাভাবে একের পর এক পণ করিতে লাগিলাম। তাতে ফল কি দাঁড়াল? ক্রোধের সমান শত্রু ত্রিলোকে আর নেই ভাই। দ্বিতীয়ে দ্বাদশ বৎসর পণ করে বনে এলাম। এখন কোন মুখে আবার ফিরে যাবে? বনে রাগান্বিত হওয়া তোমাদের যদি ইচ্ছাই ছিল, তা সেখানেই করা উচিত ছিল। তখন যদি তোমরা বলতে আমরা যাব না তখন আমি একাই আসতাম। সময়ের কর্ম সময়ে না করলে অসময়ে করলে কি লাভ হবে? এক্ষুণি প্রাণ আমি ত্যাজিবারে পারি। তথাপি সত্য আমি ছাড়িবারে নারি। রাজ্য পাওয়ার লোভে সত্য লঙ্ঘন করলে কুখ্যাতির অন্ত থাকবে না।

ভীম : থাক, অনেক হয়েছে। দ্বাদশ বৎসর এভাবেই কাটাতে হবে। কিন্তু একটিবারও যে ভাবিনি, অজ্ঞাতে আমরা লুকাব কোথায়? এ পৃথিবীর কে না চিনে আমাকে? কোথায় লুকাবে অর্জুন নকুল সহদেব কিংবা দ্রৌপদী? কোথায় তুমি নিজেকে গোপন করবে? একটিবারও কি তোমার চিন্তা করা উচিত ছিল না? প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ, তা নাহি হইবে মোচন জীবাত্মা দেহে থাকবে যতক্ষণ।

যুধিষ্ঠির : (চিন্তা করে) যা বলেছ ভাই বৃকোদর, তা কখনও সম্ভব নয়। অধর্মের জয় কখন হতে পারে না।

দ্রৌপদী : ক্রোধান্নিত হয়ে আর লাভ নেই। চলো, খাওয়ার দেখি কি করা যায়।

যুধিষ্ঠির : হে, তাই চলো। (সকলের প্রস্থান)

www.pathagar.com

[অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন : ভ্রাতৃ আদেশ পালিবারে আসিলাম হেথা, কোথায় পাইব শিব, দূর করিতে মম ব্যথা।

[ধর্মের প্রবেশ]

ধর্ম : তুমি কে বালক? ধেনুর্বান নিয়েতো কেহ এখানে আসেনি। এ পর্বতে নিষ্কামীদের বাস। তুমি কি চাও হে বালক?

অর্জুন : এখানে ধনুর্বানের কোনো প্রয়োজন নেই। ত্রিলোচনকে জয়ী করতে পারলে সব হয়। (অদৃশ্য)

অর্জুন : (প্রণাম) একি! কোথায় গেল? হ্যাঁ এ্যাঁ! একি বরাহ যাচ্ছে; (ধেনু হাতে তীর মারল) পড়েছে–(প্রস্থান উদ্যত)

[ধর্মের পুনঃ প্রবেশ]

ধর্ম : শান্ত হও বালক।

অর্জুন : কে তুমি আমার সিদ্ধান্তের বাঁধা। ত্রিলোকে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমার বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সরে যাও তপস্বী।

ধর্ম : বালক

অর্জুন : বালক নই তপস্বী, আমার শিকারে যখন বাঁধা দিয়েছ, তখন আমি দেখতে চাই কত বড় শক্তি তোমার।

ধর্ম : তথাস্ত বালক।

অর্জুন : পুনরায় বালক?

ধর্ম : এর অধিক তোমাকে কি বলব? ঠিক আছে, তোমার যত শক্তি আছে দেখাও আমাকে।

অর্জুন : শান্ত হও ভণ্ড তপস্বী। ত্রিলোকের সবাই আমার নামে কম্পিত। আর তুমি–

ধর্ম : আমি তোমাকে ঘৃণা করি বালক।

অর্জুন : তপস্বী–

ধর্ম : বালক–

অর্জুন : আত্মরক্ষার চেষ্টা করো তপস্বী। (বাণ মারিবে) আমার সর্বশক্তি প্রয়োগে তোমাকে আমি–(ধেনু দ্বারা আঘাত করতে গিয়ে ধনু হাত থেকে পড়ে গেল) এঁকি, এ্যাঁ! না না তপস্বী, তোমাকে আমি (মল্লযুদ্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ) এ্যাঁ! কোথায় শিব নারায়ণ, কোথায় ত্রিলোচন–

ধর্ম : বালক, এত কাছে পেয়েও তুমি–

অর্জুন : এ্যাঁ! প্রভু–

ধর্ম : আমার সঙ্গে যুদ্ধ করা মানুষ্যদেবতার মধ্যে নেই, যা করেছে তুমি আজ। তব বীরত্বে আমি গর্বিত বালক। তুমি আমার দিকে থাকাও, এক্ষুণি দিব্যচক্ষু ফুটিয়ে দিচ্ছি–

অর্জুন : (করজোরে) প্রভু, আমার অপরাধ–

ধর্ম : এসো বালক, আমার কাছে এসো (আলিঙ্গন) বালক, বলো তুমি কি চাও?

অর্জুন : কৃপা যদি হয় দেব, তবে পশুপাত বাণ–

www.pathagar.com

ধর্ম : তথাস্তু বালক। তুমি ছাড়া এ শক্তি অন্য কারো শোভা মিলবে না। কোথায় শক্তি?

[শক্তির প্রবেশ]

শক্তি : দেব (করজোরে)

ধর্ম : আজ থেকে তুমি ঐ বালকের আজ্ঞা মতো কাজ করবে।

শক্তি : যথা আজ্ঞা দেব। প্রণাম তব শ্রীচরণে। (অদৃশ্য)

ধর্ম : এবার মন্ত্রটা শিখে নাও বালক।

অর্জুন : বলুন দেব–

ধর্ম : বীজ থেকে বৃক্ষসম স্ফুলিঙ্গ থেকে অরুণ, তিল বারিধারা থেকে জলাদি সম, হউক বিরাট মূর্তি। যাও অস্ত্র ধেয়ে, শত্রু নিপাতের তরে, আমার মন্ত্র যদি লড়ে, ঈশ্বর মহাদেবের জঠা ভূমণ্ডলে পরে। (অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করবে) এই মন্ত্র যতবার জপ করবে, শক্তি তত সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাবে। তোমার হাতেই এ ধরার শত্রু নিধন হবে।

অর্জুন : দেব–

ধর্ম : অসুর নিদনে তুমি স্বর্গে চলে যাও। দেবগণ সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। (অদৃশ্য)

অর্জুন : দেবগণ সবাই শত্রুর কবলে হিমশিম খাচ্ছে। কোথায় শত্রু, আমি তার শেষ দেখতে চাই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
স্থান : বন

[যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর প্রবেশ]

ভীম : দাদা, দেখতে দেখতে যে পাঁচ বৎসর চলে গেল। অর্জুন যে এখন ফিরছে না। তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য না জানি কোথায় রয়েছে একা। যদি তার কোনো অমঙ্গল ঘটে, তবে শুনা মাত্রই প্রাণ ত্যাজিব। যে ভাইয়ের ত্যাজে আমরা ত্যাজিয়ান, যার কাছে মানুষ্যদেবতা পরাজিত, আর বিহনে কি জীবন রাখার হেতু আছে দাদা?

যুধিষ্ঠির : যা বলেছ তুমি তার সকলই প্রমাণ, কিসে আপদ যার সখা ভগবান। আমার মন বলছে অর্জুন যেখানে আছে সুখে শান্তিতেই থাকবে। যথা ধর্ম, তথাই কৃষ্ণ, আর তথাই বিজয়।

দ্রৌপদী : তারপরেও এতদিন ধরে তার অনুপস্থিতি আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে স্বামী। অর্হনিশি আমার মনে কি যেন এক দুঃশ্চিন্তা বিরাজ করছে।

নকুল : তোমার আদেশ পালন করতে আমরা সবকিছু ত্যাগ করতে পারি দাদা। কিন্তু তুমিতো একটিবার আমাদের কথা চিন্তা করে দেখনি। আজ এতদিন হলো, কোথায় আছে, কি খাচ্ছে, কি–

সহদেব : আমার জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী আমি যা দেখতে পাচ্ছি, এতে বিপদের কোনো আশংকা নেই। শাস্ত্র পর্যবেক্ষন করে দেখতে পাচ্ছি, অর্জুন ইন্দ্রপুরে আছে। ক্ষণিকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

ভীম : হয়েছে, বেশ হয়েছে। এবার বইখানা আমার হাতে দাও। আমি এটাকে অনলে দগ্ধিভূত করে–

যুধিষ্ঠির : আহা বৃকোদর। আমি আর পারছি নে ভাই। জ্যোতিষ শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হয় না। তাছাড়া–

[অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন : প্রণাম দাদা–

যুধিষ্ঠির : এ কি, অর্জুন! দেখো ভাই, বলতে না বলতেই অর্জুন এসে গেল। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই?

অর্জুন : হিমালয় থেকে ইন্দ্রালয়ে। সেখানে দেবতারা অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

দ্রৌপদী : আর তুমি গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আমাদের সম্মুখে বীরত্বের পরিচয় দেখাচ্ছ এইতো?

অর্জুন : শুধু এই নয় দ্রৌপদী, পশুপাত অস্ত্রসহ লক্ষাধিক অস্ত্রও আমি পেয়েছি।

দ্রৌপদী : তাতো ভালোই হয়েছে। গরু-ছাগল আর–

যুধিষ্ঠির : সবসময় হেয়ালী রুচিকর নয় কৃষ্ণা। চলো বিশ্রাম করিগে। এসো ভাই অর্জুন।

অর্জুন : হে তাই চলো দাদা। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য
স্থান : হস্তিনার প্রাসাদ

[শকুনী ও দুর্যোধনের প্রবেশ]

দুর্যোধন : মামা দেখতে দেখতে যে দ্বাদশ বৎসর কেটে যাচ্ছে।

শকুনী : তাতো যাচ্ছেই বাবা। আমি মাতুল। অজ্ঞাতে তাদের কিভাবে সন্ধান করতে হবে, তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাদের চিনতে পারে না। তাছাড়া, আমার যতদূর অনুমান হচ্ছে, বনে ওরা ভীমের খাদ্য জোগাড় করতে পারবে না। আমি মাতুল।

দুর্যোধন : তারপর–

শকুনী : খাদ্যাভাবে ভীম হয়তো ইতিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। আর তার অভাবে–

দুর্যোধন : তার অভাব–

শকুনী : তারা হয়তো একে একে সবাই–

দুর্যোধন : না মামা, যদি ওরা বেঁচে থাকে, তাহলে এক বৎসর পরেই ওরা সগৌরবে হাজির হবে, তখন–

শকুনী : তাহলে রাজ্যময় সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হউক, যে বা যারা পাণ্ডবদের সন্ধান দিতে পারবে, তাদের এই হস্তিনার অর্ধাংশ দান করে দেওয়া হবে। আমি মাতুল।

দুর্যোধন : এটাই উত্তম যুক্তি মামা। কোথায়, কে আছিস–

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম ভ্রাতা। কি হেতু আজ্ঞা হয়েছে তব, বলুন আমায়, পালন করিব তড়িত।

www.pathagar.com

দুর্যোধন : যাও ভাই দুঃশাসন, রাজ্যময় সংবাদ পৌছে দাও, যে বা যারা পাণ্ডবদের সন্ধান দিতে পারবে, তাদের অর্ধরাজ্য সম্প্রদান করা হইবে।

দুঃশাসন : যথা আজ্ঞা ভ্রাতা। এক্ষুনি আমি রাজ্যময় সংবাদ পৌছানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

দুর্যোধন : মামা, আমি ভাবছি, যদি কেহ ওদের সন্ধান দিতে না পারে?

শকুনী : জীবিত থাকলে অবশ্যই ওদের সন্ধান মিলবে। আর যদি না মিলে, তবে জেনে রাখো, ওরা আর ইহজগতে নেই। আমি মাতুল।

দুর্যোধন : জীবিত থাকার পরেও যদি ওদের সন্ধান না মিলে–

শকুনী : তা কোনো প্রকারে সম্ভব নয়। যদি দৈবাৎ ঘটেই যায়, তবে বিনাযুদ্ধে ওদের সূচাগ্র ভূমি দেওয়া যাবে না। আমি মাতুল। বড় বড় যোদ্ধা এই সবাই হস্তিনায় বাস করছে।

দুর্যোধন : তাই করতে হবে মামা। যে রাজ্য আমার হাতের মুঠোয়, তা ফিরিয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা করব। তারপর হা হা হা।

শকুনী : পাণ্ডব বংশ করিব ধ্বংস। হে হে হে আমি মাতুল। রাজ্য পরিচালনা করা আমার বংশগত অধিকার। এসো বাবা বিশ্রাম করা যাক।

দুর্যোধন : হ্যাঁ, তাই চলুন মামা। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অংক
প্রথম দৃশ্য
স্থান : বন

[দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : তৃষ্ণায় যে বুক ফেটে যাচ্ছে ভাই, এই অরণ্যের কোথায় পাব জল? ভাই বৃকোদর কোথায় আছে জল আনহে সত্বর। ভিতরটা যে আমার শুকিয়ে যাচ্ছে।

ভীম : একটু অপেক্ষা করো দাদা, আমি এক্ষুণি জল এনে দিচ্ছি। (দ্রুত প্রস্থান)

সহদেব : দ্বাদশ বৎসর যে অতিক্রমের পথে দাদা। আজ নিশি শেষ হলেই আমাদের অজ্ঞাতের ব্যবস্থা করতে হবে।

নকুল : আমি যে এর কোনো সিদ্ধান্তই পাচ্ছি না দাদা। একদিন নয়, দু দিন নয়, পাক্কা একটি বৎসর নিজেদের আত্মগোপন করে–

যুধিষ্ঠির : একদিন থাকতে পারলে এক বৎসর থাকা যায় ভাই। তাছাড়া ধর্মে অটল থাকলে মহাসমুদ্রও পদব্রজে–

অর্জুন : পার হওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ যদি ডুবে যায়?

দ্রৌপদী : আমিও তাই বলি। দৈবাৎ ভুলক্রমে সত্য পরিচয়টা যদি প্রকাশ পায়–

যুধিষ্ঠির : তা কখনও সম্ভব নয় কৃষ্ণা। যদি কে আঁকড়ে ধরে কোনো কাজে কৃতকার্য হওয়া যায় না। একনিষ্ঠ ভাবে যদি বলি, আমাকে এক বৎসর অজ্ঞাত ভাবে থাকতে হবে, তা হলে এক বৎসরকে একদিনের চেয়েও কম মনে হবে। যাক, ভীম যে এখনও ফিরছে না। তাহলে–

www.pathagar.com

অর্জুন : হয়তো জলের কথা ভুলে কোথাও মল্লযুদ্ধে মেতে উঠেছে। তাহলে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি দাদা। (দ্রুত প্রস্থান)

সহদেব : আমি যতদূর দেখতে পারছি। ভীম বিকট সংকটে পড়েছে।

দ্রৌপদী : অসম্ভব, এ বনে এমন কোনো শক্তি নেই, যা ভীমের সংকট ঘটাতে পারে।

নকুল : তোমার পাঞ্জিপুঁথি এবারে গাট্টি বেঁধে গঙ্গায় বিসর্জন দাও।

যুধিষ্ঠির : আহা এদিকে তোমরা তর্কবিধ সাজ, ওদিকে যে ভীমার্জুন যে ফিরছে না, সে কথা ভেবে দেখেছ?

নকুল : ভাবার কি আছে, এখন না হয় তখন এক সময়তো ফিরবেই।

দ্রৌপদী : রাগ করে লাভ হবে না। বিপদ উপনিত তখন তার সমাধানতো করতেই হবে।

নকুল : ঠিক আছে যদি তাদের খুঁজে না পাই তবে আমিও আর ফিরছি না। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : দেখলে সহদেব, সবাই তোমার উপর রাগান্বিত। আমি–

দ্রৌপদী : আবার দুঃখ প্রকাশ করো না। বড়দের উপর সবাই রাগ দেখাতে পারে। বড়কে ধৈর্য ধরতে হবে, সান্ত্বনা দিতে হবে। তা যদি না পারা যায়, তাহলে বড় না হওয়াই উচিত ছিল।

যুধিষ্ঠির : এ তুমি বুঝবে না দ্রৌপদী। পাশা খেলা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শুধু অভিমান আর অভিমান। আমারও তো রক্তে মাংসে গড়া এ দেহ। কথায় কথায় রাগ দেখান, পদাঘাতে কৃতী চুরমার করে দিবে। এ বলার কোন হেতু আছে? নকুলের কর্কশতা, সবকিছু মিলিয়ে আমাকে–

সহদেব : দাদা, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা বনে এলাম। তুমি যেভাবে ঘুমাচ্ছ, আমরাও সেভাবেই ঘুমাচ্ছি। তুমি যা খাচ্ছ, আমরাও সেভাবে খাচ্ছি। কাঠফাটা রোদে পথিকেরা গাছের ছায়া খুঁজে, আমাদের একমাত্র স্থানতো তুমিই দাদা। ভীম যদিও কথায় কথায় রাগান্নিত হয়, তবুও সে তোমার আজ্ঞামতো কাজ করে।

দ্রৌপদী : হয়েছে, বেশ হয়েছে। আমি যাচ্ছি তাদের অন্বেষণে।

সহদেব : না কৃষ্ণা, এ হয় না আমিই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

দ্রৌপদী : ছোটদের উপর রাগ করতে আছে বুঝি?

যুধিষ্ঠির : এ তুমি বুঝবে না কৃষ্ণা। একটু রাগ না দেখালে ওরা হঠাৎ আকাশের চাঁদ চেয়ে বসবে।

দ্রৌপদী : তাই বুঝি? তুমি একটু চুপচাপ বসো, আমি এক্ষুণি ওদের নিয়ে আসছি। (প্রস্থান উদ্যত)

যুধিষ্ঠির : না কৃষ্ণা। এ হয় না, আমি নিজেই যাচ্ছি। (প্রস্থান উদ্যত)

দ্রৌপদী : তা কি কখনও হয়? তৃষ্ণার্থজনা কি কখনও জল চেয়ে নিজে খুঁজে এনে খায়? একটু বসো, আমি এই যাব আর আসব। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : ভীম গেল, অর্জুন গেল, নকুল গেল, সহদেব গেল, শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীও গেল। কিন্তু ফিরে না আসার কারণ কি? হে গোবিন্দ, তুমিই জানো ঠাকুর। আহা তৃষ্ণায় যে বুক ফেটে যাচ্ছে। একি! দেখতে দেখতে বেলা যে ঘনিয়ে এল, ওরা যে ফিরছে না। তাহলে কি সবাই বিপদগ্রস্ত? শেষটায় আমাকেও যেতে হবে দেখছি। গোবিন্দ, তুমিই একমাত্র ভরসা প্রভু। দেখি, কোথায় কি ঘটেছে। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম : বা কি সুন্দর সরোবর। দাদা তৃষ্ণার্থ, এ থেকেই জল অন্বেষণ করতে হবে।

[বকরূপী ধর্মের প্রবেশ]

ধর্ম : বলি শুন ও হে মতিমান। সমস্যা পুরণে করো জল পান। নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জল পানে। সমস্যা পুরণ করো আমার বচনে। কিবা বার্তা, কি আশ্চর্য, পথ বলি কারে? কোনজন সুখি হয়, এই চরাচরে।

ভীম : রাখো তোমার আধ্যাত্মিকতা। আগে জল পান করি, তারপর তোমার উত্তর। (জলপান ও বিকট শব্দে মৃত্যু) দাদা–

[অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন : বা কি সুন্দর সরোবর। যাক, ভীমকে পরে দেখা যাবে। একটু তৃষ্ণা নিবারণ করে নিই। (নামতে উদ্যত)

ধর্ম : আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে, তারপর জল স্পর্শ করো।

অর্জুন : হয়েছে, বেশ হয়েছে, তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আর উনি চাচ্ছেন প্রশ্নের উত্তর। আগে জল পান করি, তারপর তোমার উত্তর।

ধর্ম : স্পর্শ মাত্রই তোমার মৃত্যু হবে বৎস।

অর্জুন : ভণ্ড তপস্বী জীবনে কম দেখিনে। (পানিতে নেমে) একি! ভীম! এই সরোবরে! হে, আমাকেও তাই করতে হবে। (জল পানে মৃত্যু) দাদা–

[নকুলের প্রবেশ]

নকুল : অনেক খুঁজেও তোমাদের পাওয়া গেল না। যদি তোমাদের না পাই, তবে অবশ্যই এ দেহ ত্যাগ করিব। বা কি সুন্দর জলাশয়। তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

ধর্ম : শুনো ওহে নকুল বীর, মম প্রশ্নের উত্তর কর স্থির। তবেই তুমি জলপান করিতে পারো। নতুবা মৃত্যু তব অনিবার্য।

নকুল : রাখো তোমার প্রশ্ন! একি! ভীম, অর্জুন, সরোবরের জলে ভেসে রয়েছে?

ধর্ম : প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াতেই তাদের এ অবস্থা।

নকুল : না, না আমি শুনতে চাই না। তুমি ভণ্ড, তুমি প্রতারক। যে ভ্রাতৃদ্বয়ের বলে আমরা বলিয়ান, তারা আজ সরোবরে, হে হে আমিও যাব (জলপানে মৃত্যু) দাদা–

ধর্ম : একি শুরু হলো? যুধিষ্ঠির এখনও আসছে না কেন?

[সহদেবের প্রবেশ]

সহদেব : তাইতো, এদিকেই তো ভীমের পদচিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। ঐ তো, বা, কি সুন্দর সরোবর। যাক আগে তৃষ্ণাটা মিটিয়ে নেই। তারপর (নামতে উদ্যত)।

ধর্ম : শান্ত হও পাণ্ডুর নন্দন, মম প্রশ্নের দেহ বিবরণ। নতুবা স্পর্শ মাত্রই নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে। আত্মঘাতী বলে রটনা ধরাতে রটিবে।

সহদেব : আত্মঘাতী! এ্যাঁ, ভাতৃবর্গ সরোবরের ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে যাচ্ছে, তাহলে তারা কি আর নেই?

ধর্ম : অহং ত্যাগ করো সহদেব। তবেই তুমি রক্ষা পাবে।

www.pathagar.com

সহদেব : না, আমি আর বাঁচতে চাই না। আমিও যমালয়ে যেতে চাই (জল পান ও মৃত্যু)। দাদা–

ধর্ম : একি! সবাই বলে যুধিষ্ঠির মহাজ্ঞানী। সে কেন আজ আনভোলা হয়ে গেল?

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অস্থিরতায় ভুগছে পাণ্ডু জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। কোথায় পাব জল? একি! বা কি সুন্দর সরোবর। একি! ভীমার্জুন–

ধর্ম : প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জল স্পর্শ করলে তোমারও এ অবস্থা হবে পাঞ্চালী।

দ্রৌপদী : না, আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি না সতী নারী। তবে কেন আজ আমার স্বামীগণ মৃত্যুর কূলে ঢলে পড়েছে? আপনিই বলুন, আমি সধবা না বিধবা? হে ঠাকুর (কান্না)

ধর্ম : আহা শান্ত হও পাঞ্চালী।

দ্রৌপদী : আমি পঞ্চমুখে বলতাম আমার মতো সতী নারী– (কান্না)

ধর্ম : দ্রৌপদী–

দ্রৌপদী : (গান) একি দৃশ্য দেখছি আমি ওগো নিরঞ্জন।
আমার সিঁথের সিদুর কি হইবে, কি করি এখন ॥

দ্রৌপদী : আমার স্বামীগণ যেভাবে যে পথে গিয়াছেন, আমিও ঠিক সেই পথ ধরব (জল পান ও মৃত্যু) স্বামী–

ধর্ম : একি! তাহলে যুধিষ্ঠির?

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : হে, এদিকে তো ভীমের পদচিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। বা কি সুন্দর সরোবর। একি! ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী সবাই জলের উপর ভেসে আছে। একি হলো ভাই অর্জুন (উচ্চস্বরে কান্না) একি আমার অদৃষ্টে ছিল ঠাকুর। হায় কৃষ্ণ তুমি কোথায় সখা? এ সংকটের সময় আমায় একবার দেখে যাও প্রভু। এ যে মৃত্যুবর তৈরি হচ্ছে তা ভাবতেই পারিনে সখা। একের পর এক আদেশ পেয়ে হায় কৃষ্ণ (উচ্চস্বরে কান্না) বাল্য অবস্থায় পিতা গেলেন, আজ ভ্রাতৃবর্গসহ দ্রৌপদী গেল। জতুগৃহ থেকে যাদের আগলিয়ে এনেছিলাম, বনবাসে এত দুঃখকষ্ট সহ্য করেও, যাদের টেনে নিয়ে এত শান্তি পেতাম, তারা আজ আমাকে একা রেখে চলে গেল। হে, এই সরোবরে আমি প্রাণ ত্যাজিব।

[গীত কণ্ঠে প্রসন্নের প্রবেশ]

প্রসন্ন : (গান) বিধিরে একি তোমার লীলা, একি তোমার খেলা।
সবংশেতে সরোবরে খেলছে মৃত্যুর খেলা।
একে একে সবাই গেল, খুঁজতো নিল না।
অসার দেহে সইতে হবে, না হও আপন ভোলা ॥

প্রসন্ন : শান্ত হও, ধৈর্য ধরো। জয় তোমাদের হবেই। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : না না আমি যে ধৈর্যের বাধ হারিয়ে ফেলেছি। আমি আত্মঘাতী হব।

ধর্ম : আত্মঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন, অধোগতি হয় তার বেদের বচন। ধৈর্য ধরো পাণ্ডুর নন্দন।

www.pathagar.com

যুধিষ্ঠির : ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার। পিতা গেলেন, ভীমার্জুন গেল, নকুল-সহদেব গেল, শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীও গেল। আমার যে আর কিছুই নেই। অনিত্য এই সংসারে, দেহটার মূল্যায়ন করে লাভ কি?

ধর্ম : মরতে চাও, তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাও, আমার চার প্রশ্নের উত্তর আগে দাও।

যুধিষ্ঠির : প্রশ্ন! ঠিক আছে, বলুন কি আপনার অভিপ্রায়?

ধর্ম : কি বা বার্তা, আশ্চর্য, পথ বলি কারে, কোন জন সুখী হয়, এই চরাচরে?

যুধিষ্ঠির : (চিন্তা করে) হে। শুনুন আপনার প্রশ্নের উত্তর। প্রথম প্রশ্নের উত্তর–মোহময় সংসারে কঠাহে কালকর্তা, ভুতগণে করে পাক এই শুনো বার্তা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমরাতো চিরজীবি নাহি হব ক্ষয়, এ হতে কি আশ্চর্য কহ মহাশয়। তৃতীয়ে কে জানে নিগুঢ় ধর্মতত্ত্ব নিরুপণ, সেই পথ গ্রাহ্য, যেথা যায় মহাজন। শেষ উত্তরে অপ্রবাসে ঋণ বিনা যার কাল যায়। যদ্যপি মধ্যাহ্ন কালে শাক ভাত খায়, সেই সুখী এই চরাচরে।

ধর্ম : শুনো পাণ্ডু জ্যেষ্ঠ, তোমার সংলাপে আমি হয়েছি তুষ্ট। তুমি কি চাও বল? তোমার যে কোনো একজন ভাইকে যদি–

যুধিষ্ঠির : আপনার যদি কৃপা হয়, তবে আমার এই আশীষ করুন, সতত যেন ধর্মে মন থাকে। তথাপি যদি অনুগ্রহ হয়, প্রাণদেহ সহদেবে বিমাতৃ তনয়।

ধর্ম : ওরে মুর্খ, সৎভাই কি ভাই হতে পারে? বাঁচিয়ে নাও তুমি ভীম বা অর্জুনেরে।

যুধিষ্ঠির : না দেব, আমা হতে মম মাতামহগণ পিণ্ড পাবেন। কিন্তু সহদেবের মাতামহগণ–

ধর্ম : তোমার ধর্ম জানিবারে করিয়া মনন। এই সরোবর আমি করিয়াছি সৃজন। ধন্যবাদ তোমার মাতার। এমন সন্তান কয়জন গর্ভে নিতে পারে? ধর্মে সর্বদা স্থির থেকে, জয় তোমাদের হবেই। ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা (কুণ্ডলী থেকে জল ছিটা দেওয়াতে সবাই প্রাণ ফিরে পেল এবং ধর্ম অদৃশ্য)।

ভীম : একি দাদা, আমরা এখানে কেন এলাম?

অর্জুন : তাইতো, আমি ভেবেই পাচ্ছি না।

যুধিষ্ঠির : ধর্ম চালনা করে আমাদের পরীক্ষার জন্য এখানে এই মনোরম সরোবর সৃজন করেছিলেন।

সহদেব : এ্যাঁ! হে, মনে পড়েছে, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য–

নকুল : এ পর্বটা এখন বাদ দেওয়া যাক। দ্বাদশ বৎসর যে কেটে গেল মনে আছে?

সহদেব : (পাঞ্জি দেখে) ঠিকইতো দাদা, কালই আমাদের অজ্ঞাতে থাকতে হবে।

যুধিষ্ঠির : হে, তাই চলো, দেখি অজ্ঞাতের কি করা যায়। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য
স্থান : মৎস্য রাজ প্রাসাদ

[বিরাট ও কিচকের প্রবেশ]

বিরাট : সবাই বলে আমার রাজ্যে না আছে শীত না আছে গরম। ফল বৃক্ষে ফলের অভাব নেই, রবি শস্য প্রচুর। দুগ্ধবতী গাভী–

www.pathagar.com

কিচক : দুগ্ধ বিতরণ করে যাচ্ছে কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন, এই কিচক যদি সদয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার অবস্থা কি দাঁড়াবে?

বিরাট : তোমার প্রশংসাতো আমি রাজ্যময় করেই বেড়াচ্ছি।

কিচক : তাতো অবশ্যই।

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : জয় মৎস্যাদিপতী। রাজ্যময় শান্তি বিরাজ হোক।

বিরাট : একি! তোমাকে তো আমার রাজ্যে আগে দেখিনে?

কিচক : হয়তো কোন রাজ্যদ্রোহী হতে পারে। আমাকে আদেশ দিন, এক্ষুণি এর সমুচিৎ শিক্ষা–

বিরাট : থাক, আর শিক্ষা দিতে হবে না। বলো আগন্তুক, কি হেতু তুমি এখানে এসেছ, ক্ষত্রিয় হও, দ্বিজ হও, যেই হও, তব বাসনা আমি পূরণ করব। বলো, কি তোমার অভিপ্রায়? তোমাকে দেখিয়া মম, হেন মনে লয়। যা মাগিবে তাই দেব জানহ নিশ্চয়।

যুধিষ্ঠির : বৈরাঘ্র্য গোত্র মম কংক নাম ধরি। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নিত্য পাশাখেলা করি। শত্রু রাজ্য নিল, পঞ্চ ভাই বনে চলে গেল। তাই তাঁর সম পাশায় নিপুণ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কিচক : তাহলে আপনার আর চিন্তা নেই সমানে সমানে–

বিরাট : রসিকতা সব সময় রুচিকর নয় কিচক।

কিচক : আমাকে কিচক বলবেন না বলে দিচ্ছি। আমি শুধু আপনার শ্যালকই নই, প্রধান সেনাপতিও বটে।

বিরাট : থাক, বেশ হয়েছে। এবার থেকে সেনাপতিই বলব। হে আমি এরকম একজন লোকই খুঁজছি। আমার ধন সম্পদ সব কিছুই তোমাকে অর্পণ করলাম। আমার সমান হয়েই তুমি এখানে থাকো।

যুধিষ্ঠির : ধন সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। হরিষ্য ভূজন করি, শয়ন ভূমিতে, তার চেয়ে অধিক কিছু না চাই পাইতে।

বিরাট : তথাস্ত। তুমি যে ভাবে থাকতে চাও, আমি সে ভাবেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কিচক : কিচক তাহলে প্রস্থান করুক। (প্রস্থান)

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম : প্রণাম মৎস্যাদিপাতি।

বিরাট : একি! এ আকৃতির মানুষতো আমি কখনও দেখিনে। তুমি দেখেছে কংক?

ভীম : মহারাজের জয় হোক। চতুর বর্ণ শ্রেষ্ঠ জাতিতে ব্রাহ্মণ। গুরু উপদেশ পারি করিতে রন্ধন। আমার সম রন্ধনেতে নাহি সুপাকার, মল্লভ্যাস কিছু আছেয়ে আমার।

বিরাট : অসম্ভব। তোমাকে দেখে সুপাকার মনে হচ্ছে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তোমাতে পৃথিবী শাসন করার ক্ষমতা রয়েছে।

ভীম : এ আপনার ভুল চিন্তাধার মৎস্যাদিপতি। যুধিষ্ঠির মহারাজ্যের ছিলাম সুপাকার। আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার। সিংহ, ব্যাঘ্র্য, বৃষ আর মহিষ বানর।

www.pathagar.com

যাহা সহ বুঝাইবে করি না যে ডর। বল্লভ আমার নাম, রাখে মহারাজ। তাহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবী মাঝ।

বিরাট : ঠিক আছে, যাও তুমি রন্ধনশালে, সুপাকার যত আছে থাকো সবার উপরে।

ভীম : ঠিক আছে। প্রণাম মৎস্যাদিপতি। (প্রস্থান)

বিরাট : কংক–

যুধিষ্ঠির : বলুন–

বিরাট : একি শুভাশুভের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কংক?

[অর্জুনের প্রবেশ]

অর্জুন : শুভাগমনে মহারাজের জয় হোক।

বিরাট : একি! তুমি একি ছদ্মবেশ ধারণ করেছ? তুমি মানুষ নও, তুমি–

অর্জুন : নৃত্যগীতে মম সম, নাহিক ভূবনে। শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে। যুধিষ্ঠির মহারাজের অন্তঃপুরে আমি অহর্নিশি গান শিখিয়েছি। শত্রু রাজ্য নিল, তারা বনে প্রবেশিল। আমি নপংশক রাজা, নাম বৃহন্নলা। নৃত্যগীতি বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা।

বিরাট : ঠিক আছে বৃহন্নলা। উত্তরাদি কন্যা যত আছে মমপুরে, নৃত্যগীতে বিশারদ করহ সবারে।

অর্জুন : মহারাজের জয় হোক। (প্রস্থান)

বিরাট : কংক–

যুধিষ্ঠির : বলুন–

বিরাট : তার জীবনের কি কোনো মূল্য আছে?

[নকুলের প্রবেশ]

নকুল : এই কি সেই মৎস্যাদিপতি, যার গুণকীর্তন দেশান্তরে থেকেও শুনতে পাচ্ছি?

বিরাট : কে তুমি বৎস?

নকুল : অশ্ব চিকিৎসক নাম গ্রান্থিক আমার। জীবিকার্থে আসিলাম আপনার আগার।

বিরাট : তারপর–

নকুল : যুধিষ্ঠির মহারাজের অশ্ব চিকিৎসক ছিলাম আমি। কাড়িয়ালি দেই আমি যে ঘোড়ার মুখে। কোনো কালে দুষ্ট ভাব তার নাহি থাকে।

বিরাট : তথাস্তু। আমার যত ঘোড়া আছে, সবই তোমার কাছে অর্পণ করলাম। এক্ষুনি তুমি তথায় গমন করো।

নকুল : মহারাজের জয় হোক। মহারাজের জয় হোক। (প্রস্থান)

বিরাট : অনাশ্রিতকে ফিরিয়ে দেওয়া গুরুতর অন্যায়। তাইতো আমি–

যুধিষ্ঠির : যেজন অতিথিকে স্থান দেয় সাদরে। অধর্ম না স্থান পায় রাজ্যের ভিতরে।

বিরাট : আজ যে আমি ভেবেই পাচ্ছি না কংক। ভগবান কি আমায় পরীক্ষা করার জন্য–

[সহদেবের প্রবেশ]

সহদেব : প্রণাম মৎস্যাদিপতি–।

বিরাট : একি শুরু হচ্ছে কংক? আমি যে এর কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে। কে তুমি, কি তোমার নাম, সত্য পরিচয় দাও বৎস?

www.pathagar.com

সহদেব : যুধিষ্ঠির মহারাজের অগণিত গাভীর রক্ষণ ছিল আমার কাজ। তাছাড়া জ্যোতিষ শাস্ত্রেও আমি পারদর্শী। মহারাজ আমার নাম রেখে ছিলেন তন্ত্রিপাল। শত্রু হস্তে রাজ্য গেল, তারা সবাই বনে প্রবেশিল। সেই হেতু তব কাছে আগমন।

বিরাট : ঠিক আছে বৎস। অনাস্রিতকে আশ্রয় দেওয়াই যে আমার কাজ। যাও তুমি গোশালায়, সবার উপরে দিলাম তোমার স্থান।

সহদেব : আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। প্রণাম তব পদে। (প্রস্থান)

বিরাট : এবার চলো কংক। অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম করা যাক।

যুধিষ্ঠির : তাই চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : (গান) সৈরেন্দ্রীও সাজিলাম, থাকি পরবাসে।
এত দুঃখ কেন বিধি, দিল লোক মাঝে ॥
নাহি পারি কাঁদিবারে, না পারি হাসিতে।
দুঃখ কষ্টে এক বৎসর, থাকিব অজ্ঞাতে ॥

দ্রৌপদী : আরও একটি বৎসর এভাবে কাটাতে হবে। রাজরানী হয়ে আজ আমি সুদেষ্ণার পদ সেবিকা। গোবিন্দ, জীবনে কি আমি এতই পাপ করেছিলাম, যার জন্য আমাকে এত গঞ্জনা সইতে হচ্ছে। প্রভু তাহলে কি ধর্মের জয় হবে না? (দ্রুত ডাকিতে ডাকিতে কিচকের প্রবেশ)।

কিচক : দিদি–দিদি একি! তুমি, তোমাকে তো ইতিপূর্বে কখনও দেখিনে? বা কি সুন্দর রূপের লাবণ্য। হরিণীর ন্যায় দুচোখ ছলছল করছে। কিন্তু এ বেশ ভূষাতো তোমার শোভা পাচ্ছে না। তাহলে তোমার সুভাগ্যই বলতে পারো। দেখিয়া তোমাকে মন মজিল আমার। কামবাণে দহে প্রাণ করো হে উদ্ধার। শত সহস্র মোর আছে নারীগণ। দাসী হয়ে সেবিবে তোমার চরণ। সবার উপরে তুমি রাজরানী হয়ে থাকবে। আর যদি আমার আবেদন না রাখো, তবে এক্ষুনি মম প্রাণ ত্যাজিব।

দ্রৌপদী : সৈরেন্ধ্রীর কাজে আমি এ বাড়িতে আছি। আমাকে এমন বলা তোমার মোটেই শোভা পায়নি। তোমার কুল ভার্য্যাগণকে এ বাণী শুনালে বংশ বৃদ্ধি পাবে, থাকবে কল্যাণে। পরস্ত্রীতে লোভ করলে মঙ্গল হয় না। জীয়ন্তে কুখ্যাতি রটে। নরক থেকে উদ্ধার হওয়া যায় না। তাই বলছি পাপদৃষ্টি সরিয়ে নাও। নতুবা গন্ধর্বেরা দেখলে রাজাসহ যমালয়ে পাঠাবে।

কিচক : স্তব্ধ হও নারী। পঞ্চ গন্ধর্বের ভয় আমায় দেখিও না। শত সহস্র গন্ধর্বকে আমি ভয় করিনে হা হা হা। নষ্টা নারীকে আমি ভালোভাবেই চিনি। শুনো ব্যাভিচাররিণী নারী, আমি ইচ্ছে করলে দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারি। আর তুমি হা হা হা সামান্য একটা নষ্টা নারী। শুনো, কাল আবার আসব হা হা হা। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

দ্রৌপদী : (গান) কি শুনিলাম কানে আমি, কি করি উপায়।
কি মতে রাখিব মান, আবার যদি আয় ॥
স্বামীগণের বর্তমানে, আমি চাকরানী।
এ সংকটে প্রভু আমায়, বাঁচাও আপনি ॥
হায় গোবিন্দ, এই অভাগিনীকে আর কত সইতে হবে ঠাকুর। হাস্তিনায় প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিতা হয়ে বনে এলাম। সেখানেও জয়দ্রুতের হাতে কম গঞ্জনা সইতে হয়নি। তারপর এখানে স্থান পেয়েছি। এখানেও আমার পোড়া কপালে আবার লাঞ্ছনা শুরু। আমি যে আর সইতে পারছি না প্রভু। নারী হয়ে জন্ম নিয়ে কি আমি এতই অপরাধ করেছি? আমাকে নিঃস্কৃতি দাও প্রভু, আমাকে নিঃস্কৃতি দাও। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
স্থান : সেনাপতির কক্ষ

[কিচকের প্রবেশ]

কিচক : (পায়চারী করতে করতে) একি, এখনও সে আসছে না (আবার পায়চারী)।

[বাটি হাতে দ্রৌপদীর প্রবেশ]

কিচক : বা স্বাগত হে সুন্দরী কমলিনী মনহরা নারী। তোমার অপেক্ষাতেই আমি সেজে আছি। আমি জানতাম তুমি আসবে। এই হীরা, মানিক, জহরত, যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, সবই তোমার জন্য।

দ্রৌপদী : আমি হীরা, মানিক নিতে এখানে আসিনে। সুধা নিতে সুদেষ্ণা–

কিচক : সুধা হা হা হা। হাসালে সৈরেন্দ্রী, তোমার আজ্ঞায় অন্যজন সুধা নিবে। এখন তোমার সুখের সময়। এসো এসো কাছে এসো। এই রত্ন সিংহাসনে আমরা দুজনে বসে অনেক বড় স্বপ্ন দেখব। হা হা হা এসো নারী।

দ্রৌপদী : না, কিছুতেই আসব না সুধা নিতে–

কিচক : সুধা হা হা হা। এখনও অভিমান? তা কি আর হয়? (ধরিতে উদ্যত)

দ্রৌপদী : না না, আমাকে স্পর্শ করো না।

কিচক : আবার না, হা হা হা। তবেরে নষ্টা নারী (ধরিতে উদ্যত)

দ্রৌপদী : বাঁচাও বাঁচাও– (বাটি ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান)

কিচক : এ্যাঁ! চলে গেল হা হা হা কোথায় যাচ্ছে? ও রাজসভায়। হা হা হা। তুমি ভেবেছ সভাস্থলে আমি কিছুই করতে পারব না। শিকার যায় কোথায় হা হা হা। ঠিক আছে, দেখা যাক। (প্রস্থান)

[বিরাট, যুধিষ্ঠির, উত্তর ও ভীমের প্রবেশ]

বিরাট : (পাশা খেলতে খেলতে) সবাই বলে আমার রাজ্যে আনন্দের সীমা নাই। গোয়াল ভরা গাভী, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, কোনো দ্রব্যেরই অভাব নাই।

উত্তর : পিতা।

www.pathagar.com

বিরাট : কি বলতে চাও পুত্র?
উত্তর : আপনার সেনাপতি আজকাল কি যেন অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছেন।
বিরাট : তার প্রমাণ–
উত্তর : প্রমাণ অবশ্যই পাবেন।
[আগে দ্রৌপদী পাছে কিচক দৌড়িয়ে প্রবেশ]
দ্রৌপদী : বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঁচাও।
কিচক : বাঁচাও হা হা হা। (চুলের মুঠি ধরে লাথি দিয়ে ফেলে দিবে)
ভীম : অসহ্য–
যুধিষ্ঠির : বল্লভ–
উত্তর : সেনাপতি!
কিচক : সেনাপতি? হা হা হা। খুব যে বলতে শিখেছিস ভাগ্নে?
উত্তর : থামুন, এ মুখে ভাগ্নে বলতে লজ্জা করে না?
দ্রৌপদী : (উঠিয়া) প্রভু, একি আমার আজ হলো ঠাকুর। অনাশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে এমন ব্যবহার তো কার কপালে তুমি লিখনি। রাজার বর্তমানে আজ আমাকে (কান্না) গোবিন্দ।
উত্তর : পিতা এ রাজসভা বাস্তব না অলীক? বিনা অপরাধে একজন অনাথা আশ্রিতাকে তব বর্তমানে পদঘাত। আর তুমি চেয়ে দু নয়ন ভরে দেখছ?
বিরাট : হয়তো অভ্যন্তরীন কোনো দ্বন্দ্ব ওদের মধ্যে ঘটেছে। ভবিষ্যতে যেন এমন আর না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।
কিচক : চমৎকার। শুনলে তো নষ্টা নারী, মৎসদেশে এমন কোনো শক্তি নেই, যা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হতে পারে। হা হা হা চলি (প্রস্থান)
উত্তর : পিতা এ মনোবল নিয়েই তুমি রাজ্য পরিচালনা করেছ? ধিক্ পিতা, এমন রাজক্ষমতাকে আমি ঘৃনা করি–
বিরাট : স্তব্ধ হও পুত্র। সাগরের কাছে নদীর কি মূল্য হতে পারে? তা জানা সত্ত্বেও–
উত্তর : এমন রাজক্ষমতার মুখে আমি আগুন দেই।
বিরাট : এ হচ্ছে তোমার রাজদ্রোহিতা।
উত্তর : সত্য বলা যদি রাজদ্রোহিতা হয়, সেটা হবে তোমার অভিধানে। অন্য কেহ এমন বলবে না। (প্রস্থানে)
বিরাট : তুমি যাও সৈরেন্দ্রী। আমি এর বিহিত ব্যবস্থা করব।
দ্রৌপদী : এই তোমার বিচার? পঞ্চ গর্ন্ধবেরা–
যুধিষ্ঠির : এসব কথা থাক সৈরেন্দ্রী এতে দুঃখ করো না। পুনরায় যদি এমন হয়, তখন যেন গর্ন্ধবরা তাকে ক্ষমা না করে। আত্মপাপে দুঃখ পেলে কার কি করার আছে?
দ্রৌপদী : নিজের দোষে আজ আমার এমন হয়েছে? সবই এই পোড়া অদৃষ্টের দোষ। আমি কাউকে অনুতপ্ত হতে বলব না। কোনদিন বলব না। (প্রস্থান)
বিরাট : তাকে নিয়ে আমি বিরাট অসুবিধায় আছি কংক। একদিকে আত্মীয়তা, অন্যদিকে তার শক্তির বলেই আমি শক্তিশালী।

www.pathagar.com

ভীম : আমার হাতে ছেড়ে দেখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।
যুধিষ্ঠির : থাক এসব কথা । চলুন অন্তঃপুরে। দেখা যাক শান্তনার বাণী শুনিয়ে লাভ হয় কি না। [বিরাট ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান]
বিরাট : অসহ্য, এ দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শুধু দাদাই যত অনিষ্টের মূল্য। নতুবা পদাঘাতে তক্ষুণি তার যবনিকা টেনে দিতাম। ঠিক আছে, এক মাঘে শীত যায় না। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য
স্থান : হস্তিনার রাজপ্রাসাদ

[দুর্যোধন ও শকুনীর প্রবেশ]
দুর্যোধন : মামা–
শকুনী : কিছু বলবে ভাগ্নে?
দুর্যোধন : দেখতে দেখতে অজ্ঞাতের সময় যে ঘনিয়ে এলো মামা। আজ পর্যন্ত কোনো সন্ধানই ওদের পাওয়া গেল না। তাহলে কি–
শকুনী : না ভাগ্নে, আমি মাতুল। তাদের সন্ধান পাওয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়।
দুর্যোধন : তাতো পূর্বেও শুনেছি। এবার কথা বলুন। মাত্র আর কটা দিন বাকি।
শকুনী : তাতে হয়েছে কি? আমি মাতুল। পৃথিবীর এমন কোনো কাজ নেই যা শকুনী করতে পারে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকবে সেই দেশে না থাকবে শীত না থাকবে গরম। প্রজাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গাভী থাকবে। হে হে হে আমি মাতুল।
দুর্যোধন : যে স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা স্বর্গ ছাড়া মর্তে কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না।
[দুঃশাসনের প্রবেশ]
দুঃশাসন : প্রণাম তব পদে ভ্রাতা।
দুর্যোধন : কি সংবাদ নিয়ে এসেছ দুঃশাসন?
শকুনী : আমাদের পর্যালোচনার সময় তোমার উপস্থিত বাধা সৃষ্টি করেছে দুঃশাসন। আমি মাতুল। সংবাদ যদি উত্তম না হয়–
দুঃশাসন : উত্তম সংবাদ নিয়েই এসেছি মামা। মৎস্যদেশে পাণ্ডবদের কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
দুর্যোধন : তুমি যাও দুঃশাসন। যদি তত্ত্ব নির্ভুল হয় তবে তোমাকেই আমি অর্ধরাজ্য হস্তান্তর করব। আর যদি রাজ্যের লোভে তুমি মিথ্যা সংবাদ দাও, তবে তার সমুচিৎ শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে।
শকুনী : ভবিষ্যতের চিন্তা করে, কাজে পা বাড়িও। আমি মাতুল। কৌরবদের সুখে আমি সুখি, আর আমার সুখে তোমরা এটাই চিরাচরিত নিয়ম।
দুঃশাসন : ঠিক আছে, নির্ভুল সংবাদই আমি পৌছিয়ে দিব। আসি দাদা– (প্রস্থান)
শকুনী : সংবাদ নিছক মিথ্যা নাও হতে পারে। একমাত্র মৎসদেশের প্রজাদের মনে কোনো দুঃখ নেই। আমি মাতুল।

www.pathagar.com

দুর্যোধন : তাদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত যে আমার শান্তি হচ্ছে না মামা। তারা যদি অজ্ঞাত থেকে ফিরে আসে, তাহলে আমাদের নির্ঘাত মৃত্যু হবে।

শকুনী : হে হে হে। আমি মাতুল। যেহেতু আমি তাদের বনে পাঠাতে পেরেছি, সেই হেতু তাদের ফেরার পথও বন্ধ করে দিব। আজই প্রজাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চামার, মেথর, পাশাবিধ, ধনুর্বিধ, মুষ্ঠিযোদ্ধা, শাঁখারি, সুপাকার, গোরক্ষক, অশ্বরক্ষক ইত্যাদি পরিচয়ে মৎসদেশে পাঠাতে হবে। নিশ্চয়ই এর একটা না একটা কর্ম করে ওরা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আমি মাতুল। হস্তিনার অমলঙ্গ কি আমি কামনা করতে পারি?

দুর্যোধন : তাই করতে হবে মামা। আর এদিকে আমার যোদ্ধাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকার নির্দেশও দিয়েছি। যেমন করেই হউক, তাদের সন্ধান করাটা আমার চাই-ই। আসুন দেখি কি করা যায়। (প্রস্থান)

শকুনী : হে হে হে । আমি মাতুল। দায়ে পরে এখানে বসবাস করছি। নতুবা আমার কি প্রাচুর্যের অভাব নাকি? হে হে হে গোবিন্দ হে সবই তোমার ইচ্ছা। (প্রস্থান)

চতুর্থ অংক
প্রথম দৃশ্য
স্থান : ভীমের শয়ন কক্ষ

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম : সুপাকার কাজই করি দু-বেলা তো পেট ভরে খেতে পাচ্ছি। একটু বিশ্রাম করা যাক। (নাক ডাকিয়ে ঘুমাবে)।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : (গান) ওঠো ওঠো প্রাণনাথ, আঁখি মেলে দেখ।
জনম দুঃখিনী কৃষ্ণার, এ মিনতি রাখ ॥
আজিকে আসিবে শত্রু, হরিতে সম্মান।
তুমি ছাড়া এ নিদানে, নাহি পরিত্রান ॥

দ্রৌপদী : (পায়ে ধাক্কা দিয়া) ওগো, কথা শুনছ, বলি কথা শুনছ? (ধাক্কা)

ভীম : উ. কে? (জেগে) ও কৃষ্ণা! এত রাত্তে এখানে এসেছ কেন? কে আবার দেখে ফেলে–

দ্রৌপদী : দেখে ফেলাটাই তোমার সব? আর আমি বুঝি কেহ নই?

ভীম : আহা, মাত্র আর ক-দিন বাকি; এ-কটা দিন একটু দুঃখ কষ্ট করে কোনো রকম কাটিয়ে দাও।

দ্রৌপদী : আসার পথেই ভেবেছিলাম, তোমার দ্বারাও আমার কাজ হবে না। তোমরা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমার কেশে ধরে পদাঘাত করল। যুধিষ্ঠির আমাকে তিরস্কার করে অন্দরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি তার আদেশ অমান্য করিনে। আজই আবার এখানে আসবে। আমি তাকে বারবার পঞ্চ গন্ধবের

www.pathagar.com

ভয় দেখিয়েছি। আজ যদি তার একটা বিহিত না হয়, তবে জেনে রেখো সূর্য উঠার আগেই নদীতে–

ভীম : আহা দ্রৌপদী । আত্মহত্যা না মহাপাপ? আমি তখনই তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতাম, যদি দাদা না বাঁধা দিত। তাছাড়া এখনও পারি। যদি দাদা–

দ্রৌপদী : কেন, উনি তো সেদিনই বলেছেন, আর যদি এমন হয়, তবে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। তুমি পুরুষ নও, তুমি কাপুরুষ–

ভীম : আহা কৃষ্ণা। কাপুরুষ কথাটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাও তুমি স্বস্থানে, এবার এলে বলে দিও সন্ধ্যায় যেন নৃত্যশালায় যায়। সেখানেই একমাত্র জনশূন্য আভাস।

দ্রৌপদী : দেখো, আপন ভোলার মতো এই চির অভাগিনীর কথা যেন ভুলে যেও না। জন্ম নেওয়ার পর থেকেই জ্বলে অঙ্গার হয়ে আছি। তারপরেও কি আমাকে আর জ্বলতে হবে? (কান্না)

ভীম : আহা কৃষ্ণা। কান্নার অবসান তোমার ঘটবেই। এসো, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

দ্রৌপদী : তাই চলো, হে গোবিন্দ, তুমিই একমাত্র ভরসা প্রভু। (উভয়ের প্রস্থান)

[কিচকের প্রবেশ]

কিচক : হা হা হা একি! সৈরেন্দ্রী গেল কোথায়? এ্যাঁ ঐ তো ঐ তো আসছে। না এসে যাবে কোথায় হা হা হা।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

কিচক : জানো সৈরেন্দ্রী, তোমাকে প্রথমটা না পেয়ে আমি নিজেকে খুবই নিরাশ মনে করেছিলাম।

দ্রৌপদী : এখন তো কাছে পেয়েছ?

কিচক : পেয়েছ, হা হা হা। এইতো কি সুন্দর বলতে শিখেছ। বা বা কি সুন্দর তোমার কণ্ঠস্বর। কেন কপটতা করে রাজসভায় গিয়েছিলে? বিরাটের কি ক্ষমতা আছে আমাকে শাসন করার?

দ্রৌপদী : তবুও প্রথমটা মনে করেছিলাম–

কিচক : কি মনে করেছিলে?

দ্রৌপদী : মৎসরাজের ভয়ে তুমি থেমে যাও কিনা। কিন্তু–

কিচক : কিন্তু–

দ্রৌপদী : এখন দেখলাম বাহুতে তোমার অপর্যাপ্ত শক্তি জমিয়েছে।

কিচক : তাই নাকি হা হা হা। এ দেখেই তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? আমি কিনা করতে পারি। যাকগে এসব কথা। আসল ব্যাপার তাহলে চলুক।

দ্রৌপদী : আসল আর নকল কি? কাল তুমি যে লাথি দিয়েছ–

কিচক : তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি প্রিয়ে। বলো তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?

দ্রৌপদী : ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। কিন্তু–

কিচক : কিন্তু কি?

দ্রৌপদী : আমি পঞ্চ স্বামীর ঘর করি, তা তুমি জান?

কিচক : অবশ্যই জানি।

www.pathagar.com

দ্রৌপদী : তাই এমন একটা জনশূন্য স্থানের প্রয়োজন, যেখানে রাতে কেহ যায় না।
কিচক : রাতে কেহ যায় না। (চিন্তা করে)
দ্রৌপদী : কেন, নৃত্যশালা। এটাই একমাত্র উত্তম স্থান।
কিচক : চমৎকার হা হা হা। তাহলে আমি আর দেরি করিনে। আসি সুন্দরী (প্রস্থান)
দ্রৌপদী : লম্পট, নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে এনেছিস। তোর জানা নেই এ নারী কত ভয়ংকর। গোবিন্দ, তুমিই একমাত্র ভরসা প্রভু।
[কাপড় হাতে ভীমের প্রবেশ]
ভীম : একি কৃষ্ণা, সন্ধ্যা যে হওয়ার পথে। তুমি তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পরিয়ে দাও। (কাপড় দিয়া)
দ্রৌপদী : সোজা হয়ে দাঁড়াও। আমি পরিয়ে দিচ্ছি। (কাপড় পরাইয়া) একি! তোমার মোচ রয়ে গেল।
ভীম : আরে থাক, মোচ দেখার সময় পাবে নাকি? ঠিক আছে, তুমি কেটে পড়ো।
দ্রৌপদী : প্রভু, তুমিই একমাত্র ভরসা ঠাকুর। আসি। (প্রস্থান)
ভীম : ঐ তো আসছে, এখনই ঘটবে তোমার জীবনের সমাপ্তি। (বসে পড়বে)
[কিচকের প্রবেশ]
কিচক : বা বা হা হা হা। আমার কি সৌভাগ্য। পূর্বজন্মের পুণ্যির ফলেই আজ তোমার মতো পরমা সুন্দরী নারী পেয়েছি।
ভীম : (নারী কণ্ঠে) আমারও বড় ভাগ্যের গুণে তোমার মতো স্বামী বিধি মিলিয়েছেন। কিন্তু তোমার পদাঘাতে প্রাণটাই শুধু আছে। দেহটা যন্ত্রনায় ফেটে যাচ্ছে।
কিচক : সৈরেন্দ্রী, এতই যদি তোমার লেগে থাকে, তবে এই আমি মাথা পেতে দিচ্ছি, তোমার ইচ্ছামতো আমাকে পদাঘাত লাগিয়ে দাও।
ভীম : ঠিক আছে। (পদাঘাত করিবে)
কিচক : একি! তুমি–
ভীম : স্তব্ধ হও লম্পট–
কিচক : লম্পট হা হা হা তবে আয় দেখি, কার কত বড় শক্তি।
ভীম : তাই হোক।
[উভয়ের মল্লযুদ্ধ এবং কিচক বধ]
ভীম : যা শালা। কৃষ্ণার মোহে মোহিত হয়ে কামবাণ দেখাবে যে জন, বিরাট হোক, ইন্দ্র হোক, তাকে আর জীবিত রাখব না। অজ্ঞাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। থাক তুই এখানে পড়ে, দেখুক তোর আত্মীয়েরা দু-নয়ন ভরে। (প্রস্থান)
[বিরাটের প্রবেশ]
বিরাট : কংকের মতো এমন মানুষই হয় না। দেবতুল্য ব্যবহার। একি! মৃত লাশ! একি কিচক! একি হলো আমার।
[উত্তরের প্রবেশ]
উত্তর : পাপীদের বিনাশ না ঘটলে সৃষ্টি যে বিনাশ হয়ে যাবে পিতা।

www.pathagar.com

বিরাট : তাই বলে আমার প্রধান সেনাপতির এমন অপমৃত্যু? যার শক্তির বলে আমি বলিয়ান, যার ক্ষমতার কোনো পরিমাণ ছিল না, তার আজ এমন অবস্থা।

উত্তর : তার জন্য চিন্তা করে কোনো ফল হবে না পিতা। নিজের জীবন কিভাবে বাঁচানো যায়, সে চিন্তাই এখন করুন। এদিকে আপনার সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ পৌঁছামাত্র সুশর্মা স্বসৈন্য গোধন নিয়ে যাচ্ছে। সৈরেন্দ্রীতে বাদ করাতে শুধু কিচকই নয়, স্ববংশে তাদের পতন ঘটেছে।

বিরাট : তাহলে এখন উপায়? সাজাও সৈন্য বাজাও বাদ্য। কোথায় কংক, কোথায় বল্লভ, আমার এ সংকট সময় একটু সাহায্য করো। কোথায় ধনুর্বাণ জয় আমাদের হবেই হবে। (দ্রুত প্রস্থান)

উত্তর : বল্লভকে যখন সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, তখন জয় আমাদেরই হবেই।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : কে কোথায় আছ? কৌরবেরা গোধন নিয়ে যাচ্ছে। একি উত্তর! শীঘ্রই এর বিহিত ব্যবস্থা করো।

উত্তর : এ আবার কি সংবাদ পেলে সৈরেন্দ্রী। সর্ব সৈন্যে পিতা সুশর্মাকে প্রহিত করতে গিয়াছেন। রাজ্যে যে এখন আমি ব্যতিত অন্য কেহ নেই।

দ্রৌপদী : তাহলে এখন উপায়। আমার মন বলছে গোধন নিয়েই ওরা থেমে যাবে না। রাজধানীও আক্রমণ করবে।

উত্তর : তোমাকে কি শুনাবো সৈরেন্ধ্রী? বীরত্বে আমার সমান নাহি আছে ত্রিভুবনে। কুরুসৈন্যের ক্ষেত্রে আমি একাই যথেষ্ট ছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত সারথী পাব কোথায়?

দ্রৌপদী : কেবল মাত্র সারথীর অভাবে তুমি–

উত্তর : উপযুক্ত সারথী থাকলে জয় নিশ্চিত সৈরেন্ধ্রী।

দ্রৌপদী : তাহলে তোমার ক্ষেত্রে বৃহন্নলাই উপযুক্ত সারথী। সে অর্জুনের রথের সারথী ছিল। এক রথে ত্রিজগৎ জয় করার সময় বৃহন্নলাই ছিল অর্জুনের সারথী। তা হলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমি বৃহন্নলাকে সংবাদটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি। (প্রস্থান)

উত্তর : কৌরব জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন, তুমি আমার বীরত্ব দেখনি। আজি তার পরিচয় পাবে তুমি। দুর্যোধন– (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য
স্থান : মাঠ

[শকুনী ও দুর্যোধনের প্রবেশ]

শকুনী : আমি ভাবছি গোধন নিয়ে ওরা চলে যাক। আর আমরা এদিকে রাজধানী আক্রমণের ব্যবস্থা করি।

দুর্যোধন : এত সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার পরেও আমি যেন শান্তি পাচ্ছি না। মামা। কি যেন একটি আতংক মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : দাদা দাদা–

দুর্যোধন : কি হলো দুঃশাসন?

দুঃশাসন : ওদিক থেকে কারা যেন রথে করে আসছে। রথের গতিবেগ তেমন সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না দাদা।

দুর্যোধন : মামা, আর দেরি করা চলে না। এক্ষুনি যুদ্ধের নির্দেশ দিতে হবে। তাড়াতাড়ি চলো ভাই দুঃশাসন।

[দুঃশাসন ও দুর্যোধনের প্রস্থান]

শকুনী : হে হে হে আমি মাতুল। আমি যেখানে যাই, সেখানেই আমার সোনার থালায় ভাত। দেখি, গোবিন্দ কত নম্বর চাল চালিয়েছেন। (প্রস্থান)

[উত্তর ও অর্জুনের প্রবেশ]

উত্তর : একি বৃহন্নলা, তুমি রথ কোথায় এনেছ? চৌদিকে যে শুধু জলাশয় মনে হচ্ছে।

অর্জুন : এ জলাশয় না রাজপুত্র। এ হচ্ছে কুরুসৈন্য। ধবল আকৃতির যা কিছু দেখা যাচ্ছে, এ হচ্ছে তোমাদের গোধন। আর ঐ যে দেখতে পাচ্ছ, ঐ গুলি মাতঙ্গমণ্ডল। আর ঐ যে শব্দ ভেসে আসছে, এ হচ্ছে কুরুসৈন্যের কোলাহল।

উত্তর : আমার বিশ্বাস হচ্ছে না বৃহন্নলা। আর যদি সৈন্যই হয়ে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে লড়া মানুষের ক্ষমতা নেই।

অর্জুন : তুমি না যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী?

উত্তর : তাই বলে এত সৈন্য, তাতো আমার জানাই ছিল না। শীঘ্রই চলো বৃহন্নলা, এখানে আর এক মুহূর্তও না।

অর্জুন : তুমি না প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলে? এখন যদি শূন্য হস্তে যাই, তাহলে জীয়ন্তে কুখ্যাতি রটবে।

উত্তর : দোহাই বৃহন্নলা, তোমার পায়ে পরি বৃহন্নলা। তুমি যা চাইবে আমি তাই দিব। তবুও ফিরে চলো বৃহন্নলা।

অর্জুন : তোমার সঙ্গে এসে, আমার সর্বস্ব নষ্ট হওয়ার পথে। আগে যদি জানতাম তুমি কাপুরুষ–

উত্তর : তুমি যা বলবে আমি তাই স্বীকার করছি বৃহন্নলা। তবুও ফিরে চলো, নতুবা ঝাঁপ দিয়ে ভূমিতে পড়ে যাব। এত সৈন্যের মধ্যে আমি, না না বৃহন্নলা–

অর্জুন : উত্তর, যুদ্ধা বিনে আজ ফিরছি না। তুমি ক্ষত্রিয়। ভয় ত্যাগ করে সগৌরবে ধেনু হাতে তুলে নাও।

উত্তর : তুমি নপুংশক। জন্মমৃত্যু উভয়ই তোমার কাছে সমান। আমাকে বাঁচতে হবে, এই আমি চললাম। [প্রস্থান উদ্যত]

অর্জুন : (ধরে ফেলে) দাঁড়াও। যাবে কোথায়?

উত্তর : ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও, আমি হেঁটেই চলে যাব।

অর্জুন : শান্ত হও উত্তর। যুদ্ধ আমি করব। তুমি শুধু সারথী হয়ে আমাকে সাহায্য করবে। চালাও রথ–

[দুর্যোধন ও শকুনীর প্রবেশ]

www.pathagar.com

দুর্যোধন : একি শুরু হচ্ছে মামা? মেঘ নেই গর্জন নেই, অথচ চতুরদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। একি! রক্তবৃষ্টি।

শকুনী : হে হে হে আমি মাতুল। ভয়ের কোনো কারণ নেই ভাগ্নে। শাস্ত্রেই আছে, মামা ভাগ্নে যেখানে বিপদ নাই সেখানে। সৈন্যগণ তোমরা সবাই তৈরি থেকো।

[দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুঃশাসন : প্রণাম দাদা।

দুর্যোধন : কি সংবাদ দুঃশাসন।

দুঃশাসন : আমার মন বলছে, এই রথে অর্জুন আছে। যদি তাই হয় তবে উপায় কি হবে দাদা?

দুর্যোধন : তাহলেই তো ভালোই হলো। যাদের সন্ধানের জন্য দুঃশ্চিন্তার কোনো অন্ত ছিল না, তাদের যদি হাতের কাছে পাই, তবে যে আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়।

শকুনী : অজ্ঞাতবাস যে শেষ হয়ে এলো দুর্যোধন। তা এবার অর্জুন হলেও যা ভীম হলেও তাই।

দুর্যোধন : তাহলে যুদ্ধ। যুদ্ধ ছাড়া এখন আর কোনো পন্থা নেই। যাও দুঃশাসন, সৈন্যদের তৈরি হতে বলো।

দুঃশাসন : যথা আজ্ঞা ভ্রাতা আমি এক্ষুনি সংবাদ পৌছে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

দুর্যোধন : তোমার উপর ভরসা রেখেই আজ আমার এমন হলো।

শকুনী : আহা এ নিয়ে তর্ক বাঁধালে চলবে না। আমি মাতুল।

দুর্যোধন : না, তুমি মাতুল নও। তুমি বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। তুমি নরাধম।

শকুনী : দুর্যোধন–

দুর্যোধন : না, আমি আর কোনো কথাই শুনতে চাই না। আগে তাদের একটা হেস্তনেস্ত করি, তারপর তোমার চিন্তা– (দ্রুত প্রস্থান)

শকুনী : আমার উপর চোখ রাঙানি। আমি মাতুল। তোমার উপকারের জন্য আমি পাশায় অবৈধভাবে চাল চালিয়েছিলাম। আর আজ, তুমিই আমাকে ছুঁবল দিতে চাও। ঠিক আছে, আমার নামও শকুনী। (প্রস্থান)

[অর্জুনের ও উত্তরের প্রবেশ]

অর্জুন : ঐ ঐ দিকে রথটা নিয়ে যাও উত্তর।

উত্তর : সৈন্যদের ভিতরে?

অর্জুন : যুদ্ধে বাহির ভিতর সব সমান। বাণ বিঁধলে, বাহির ভিতর সব স্থানেই মরতে হয়। এ্যাঁ একটু আস্তে চালাও উত্তর।

উত্তর : ঐ ঐ যে তারা দেখে ফেলেছে।

অর্জুন : শান্ত হও উত্তর। সম্মুখ যুদ্ধেই আমি লড়তে চাই। তৈরি হও লম্পট–

[দুর্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ]

দুর্যোধন : শেষ করে দাও দুঃশাসন।

দুঃশাসন : বলতে হবে না দাদা। (বাণ মারিতে উদ্যত)

অর্জুন : জয় শিব (যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পলায়ন)

www.pathagar.com

দুর্যোধন : কি এত বড় সাহস? এসো আমার সঙ্গে।
অর্জুন : ঠিক আছে, জয় শিব– (উভয়ের যুদ্ধ ও দুর্যোধনের পলায়ন)
উত্তর : তুমি মানুষ নও বৃহন্নলা। তোমার সত্য পরিচয়–
অর্জুন : পরিচয় একটু পরে দিচ্ছি চলো ফেরা যাক। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
স্থান : মৎস্যরাজ বাড়ি

[যুধিষ্ঠির ও বিরাটের পাশা খেলা]

বিরাট : না। বালক ছেলেকে এ অবস্থায় পাঠানো উচিত হলো কংক? গোধন নিয়ে যাচ্ছে যাক।

যুধিষ্ঠির : এ নিয়ে আর চিন্তা করে লাভ নেই। বরং মঙ্গল মতো যেন ফিরে আসে, সে জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা।

বিরাট : সে আর বলতে হবে না কংক। পুত্র মঙ্গলমতে ফিরে আসুক, তা কে না চায়? ঠিক আছে চাল চালিয়ে যাও।

যুধিষ্ঠির : (পাশা ছেড়ে) চক্কা'প। (আবার চাল) আট।

বিরাট : (পাশা ছেড়ে) ধে, এবারও চাল চালালাম, একটিবারও উঠেনি। না, খেলা বন্ধ করে দাও কংক। আজ আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : দূতমুখে প্রকাশ, তারা জয়ী হয়ে ফিরছে।

বিরাট : এ্যাঁ। তাই নাকি? কত দূর আছে আমার উত্তর? দেখেছ কংক, আমার উত্তর কত বড় যোদ্ধা হয়েছে। কুরুসৈন্য ছিনিয়ে গোধন নিয়ে আসছে, আনন্দে যে আর ধরছে না।

যুধিষ্ঠির : বৃহন্নলা যেহেতু সঙ্গে গিয়াছে, অতএব জয় তো হবেই।

বিরাট : আহা ও তো সারথী ছিল মাত্র।

যুধিষ্ঠির : হোক সারথী। তবু আমার মনে বলছে, বৃহন্নলার দ্বারাই এ যুদ্ধের জয় লাভ।

বিরাট : এ তুমি কি বলছ কংক? নপুংশক জীবনে একমাত্র নৃত্য পরিবেশন ছাড়া সে আর কি জানে? রাজ রক্তে গড়া আমার উত্তর। অতএব যুদ্ধবিদ্যা তার জন্মগত অধিকার।

যুধিষ্ঠির : সেই যাই বলুন, আমার মন বলছে বৃহন্নলা সারথী হয়ে না গেলে, প্রাণ নিয়ে আসাই সমস্যা ছিল।

বিরাট : দেখো কংক, তোমাকে অগাধ স্বাধীনতা দেওয়াতেই আমার মুখের উপর কথা বলতে সাহস পেয়েছ। শুনো, আর যদি বৃহন্নলার প্রশংসা করো, তবে আশ্রিত বলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।

দ্রৌপদী : জয় যখন হয়েছে, তখন এ তর্কে আর কি লাভ?

যুধিষ্ঠির : এ তুমি বুঝবে না সৈরেন্ধ্রী। মিথ্যা দিয়ে সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে।

বিরাট : তারপরেও তুমি বলতে চাও, বৃহন্নলার দ্বারাই এ কাজ সমাধান হয়েছে?

www.pathagar.com

যুধিষ্ঠির : সত্য বললে কি আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে?
বিরাট : থেমে যাও কংক–
যুধিষ্ঠির : আমি বললাম তো, বৃহন্নলা দ্বারাই–
বিরাট : কি (পাশা দিয়ে আঘাত) এত বড় স্পর্ধা তোমার?
যুধিষ্ঠির : আহা–
দ্রৌপদী : একি হলো। সর্বনাশ, গোবিন্দ। (নিকটস্থ বাটিতে রক্ত ধারণ)
[উত্তরের প্রবেশ]
উত্তর : পিতা, বৃহন্নলা না থাকলে আজ ফিরাই সমস্যা ছিল। সে মানুষ নয়, পিতা।
[অর্জুনের প্রবেশ]
অর্জুন : একি। একি হচ্ছে সৈরেন্ধ্রী। আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছিনে। কে এমন করেছে? স্বর্গ-মর্ত-পাতাল যেখানেই থাকুক, তাকে আমি ক্ষমা করব না। আমার প্রতিজ্ঞা–
দ্রৌপদী : না বৃহন্নলা, একবিন্দু শোণিতের ফোটা আমি ভূমিতে পড়তে দেইনি।
অর্জুন : না সৈরেন্ধ্রী, আমি আমি–
যুধিষ্ঠির : থাক বৃহন্নলা, ক্রোধে বিরত থাক। এবার বিশ্রাম নেওয়া থাক। তারপর আলোচনা হবে।
[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য
স্থান : রাজসভা

[পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রবেশ]
যুধিষ্ঠির : শুনলাম যুদ্ধে অনেক সৈন্য মারা গেল। অন্যের জন্য কেন জ্ঞাতি বধ করতে গেলে ভাই?
অর্জুন : সাধে কি আর বধ করেছি। দুর্যোধনের দোষেই এত সৈন্য মারা গেল। অনুমানে বোঝা গেল যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্য ছাড়বে না।
যুধিষ্ঠির : তারা কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?
অর্জুন : অবশ্যই।
যুধিষ্ঠির : এ বলো কি? অজ্ঞাতের না জানি আর কতদিন রয়েছে। সহদেব শীঘ্রই পঞ্জিকাটা খুলে দেখতো ভাই। অজ্ঞাতের যদি আরও কিছুদিন থাকে, তবে যে আবার বনে যেতে হবে। এ তুমি কি করলে ভাই অর্জুন?
সহদেব : অজ্ঞাতের দিন শেষ হয়েছে দাদা।
যুধিষ্ঠির : শেষ হয়েছে? দেখতো ভাই, শুভ দিনটা কবে?
সহদেব : বলি আমি শুনো জ্যেষ্ঠ, দিয়া তব মন। আষাঢ় পূর্নিমা তিথি, দিন শুভক্ষণ। নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া, ইন্দ্র নামে যোগ। বৃহস্পতি বাসরেতে মাস অর্ধ ভোগ।
যুধিষ্ঠির : তাহলে আমাদের দুঃখের দিন শেষ হলো। (সিংহাসনে বসবে এবং অন্যরা শ্রেণি বিশেষে দাঁড়াবে)।

www.pathagar.com

[দ্রুত বিরাট ও উত্তরের প্রবেশ]

বিরাট : একি, কংক! তুমি আমার সিংহাসনে? ধর্মজ্ঞ বুদ্ধিমান বলে, আমি নিকটে বসিয়েছি। প্রথমে বলেছিলে আমি ব্রহ্মচারী ভূমিতে শয়ন আমার ফলমুলাহারী। কোনো দ্রব্যে তোমার লোভ নেই। পরস্ত্রীকে নিয়ে আমার সিংহাসনে বসেছ। আর তুমিই বা কেন জোড় হাতে দাড়িয়েছ বৃহন্নলা? একি! বল্লভ, গ্রন্থিপাল, তন্ত্রীপাল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

উত্তর : পিতা (জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে)।

বিরাট : একি পুত্র! কংকের এখানে কেন জোড় হাত করে আছ? কুরুসৈন্য জিনে গোধন আনার পর থেকেই তোমাতে পরিবর্তন লক্ষ করছি। যে আমার আসনে–

অর্জুন : তোমার আসন কংকের যোগ্য নয় মৎস্যাসিপতি। যাঁর আসনে ত্রিভুবনে সবাই নমস্কার জানায়। ইন্দ্র, যম, বরুণাদি সবাই যাঁকে ভয় পায়, তাঁর কি এই ক্ষুদে সিংহাসনে শোভা মিলে? পাশাতে রাজ্য দিয়ে দ্বাদশ বৎসর বনে কাটাল হেন রাজা যুধিষ্ঠির কি এ সিংহাসনে বসা উচিত হয়?

বিরাট : একি বলছ বৃহন্নলা? উনি যদি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তবে উনার অন্য চার ভাই কোথায়? কোথায় কৃষ্ণা গুণবতী?

অর্জুন : এই যে সুপাকার বল্লভ যে তোমার শ্যালক কিচকে নিধন করেছে, সেই তো ভীম। অশ্ব আর গোরক্ষক এই যে দুজন তারাইতো মাদ্রীর তনয় নকুল ও সহদেব। যার ক্রোধে শত ভাই কিচক গেল, এক বৎসর যে জনা সৈরেন্ধ্রী বেশে ছিল, এই সেই পাঞ্চাল রাজ্যের কন্যা দ্রৌপদী। আর আমি অর্জুন।

উত্তর : তোমার ভাগ্যই বলতে হবে পিতা। তোমার আজ্ঞা বাহক হয়ে তারা এক বৎসর এই মৎসস্যদেশে কাটালো, অথচ চিনতেই পারেনি।

বিরাট : এ আমি কি করলাম পুত্র। আমি যে মহা অপরাধের অপরাধী।

অর্জুন : এ আপনি কি বলছেন?

যুধিষ্ঠির : অহেতু ভেঙে পড়ার কোনো মানে হয়? তুমি আমাদের আশ্রয় দাতা।

বিরাট : তাই যদি মনে করুন, তবে আমার একটি মাত্র বাসনা, বিবাহ যোগ্য মেয়ে আমার উত্তরা, তাকে মহাবীর অর্জুন–

অর্জুন : এ হতে পারে না মৎস্যাধিপতি। এক বৎসর আমি তাদের শিক্ষা দিয়েছি। দীক্ষাশিক্ষা জন্মাদাতা একই সমান। বরং আমার পুত্র অভিমুন্য–

যুধিষ্ঠির : তাই করা হোক। অভিমুন্য সমান যুদ্ধে নাহি বর্তমানে, অশেষ আনন্দ পাবে কন্যা সম্প্রদানে। এক্ষুণি সংবাদ হস্তিনায় প্রেরণ করা হোক।

অর্জুন : হে, তাই চলুন, ব্যবস্থা করতে হবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অংক
প্রথম দৃশ্য

[প্রসন্নের প্রবেশ]

প্রসন্ন : যথা ধর্ম তথা জয়, এ কথা জানিও নিশ্চয়।

www.pathagar.com

প্রসন্ন : (গীত)
মহাভারতের কথা, অমৃত সমান।
শ্রবণে অধর্ম নাশে, ব্যাসের বচন ॥
একনিষ্ঠ হয়ে যেবা, শ্রবে মহাভারত।
পরকালে পাইবে, সুধা অমৃত ॥
সাধুগণ মনপ্রাণে, করে যে শ্রবণ।
অমূল্য বাণী যে তাতে, শুনো শ্রোতাগণ ॥
মহাভারতের কথা, সুধার চেয়েও সুধা।
শ্রবিলেই নিবৃত্তি হবে, সাধু মনের ক্ষুধা ॥
এসব বাণী নিয়ে, পালা হইল রচন।
অজ্ঞাতে পঞ্চ পাণ্ডব, রচে নিবারণ ॥
এই পর্যন্ত পালাখানি, সমাপ্ত হইল।
করজোড়ে ব্যাস চরণ, স্বাক্ষী যে রইল ॥

পালাগান/লম্বা কিস্‌সা

পালাগান এবং কিস্‌সা গানের প্রচলন পুরো সুনামগঞ্জ জেলাজুড়ে রয়েছে। 'কিস্‌সা' গানকে আঞ্চলিক উচ্চারণে অনেকে 'কিচ্ছা গান'ও বলে থাকেন। এ অঞ্চলে পেশাদার কিস্‌সা-গায়কের পাশাপাশি অসংখ্য বাউল ও মালজোড়া গায়কেরাও বিভিন্ন আসরে কিস্‌সা পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় নামসংকীর্তন আসরে ভক্তপ্রবর মানুষের সামনে পালাকারেরা নানা ধর্মীয়কাহিনি নির্ভর পালাগান পরিবেশন করেন। এগুলো গ্রামীণ পরিমণ্ডলে লোকনাট্যের ধারা হিসেবে পরিচিত। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার তাড়ল ইউনিয়নের উজানধল গ্রামের প্রয়াত বাউলসাধক শাহ আবদুল করিমের পরিবেশিত বিভিন্ন 'কিস্‌সা' গান এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাঁর ভাবশিষ্য এবং বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে প্রচারের বদৌলতে শাহ আবদুল করিমের অসংখ্য কিস্‌সা গ্রামীণ নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরে। শাহ আবদুল করিমের পরিবেশিত 'জঙ্গলে মঙ্গল : গাজি কালু ও চম্পাবতীর কিচ্ছা' শীর্ষক একটি কিস্‌সা তাঁর ছেলে শাহ নূরজালালের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিস্‌সাটি নিম্নরূপ :

[ছন্দে]
আচ্ছা-বা কিচ্ছা হুনবার অইলে ধার ভিড়িয়া বও।
বন্দনার গানটা পয়লা হকলে মিলিয়া কও ॥

[বন্দনা]
আল্লার নামে করি
প্রথম বন্দনা।
নাম স্মরণে শমন পলায়
রয় না ভব যন্ত্রণা ॥

[কথায়]
গাজি কালু দুই ভাই তো বনবাসী হইয়া গেলাগি, এর বাদে হুন
তারা কিতা করলা :

www.pathagar.com

[ছন্দে]
সন্ন্যাসী ফকির হইয়া বন জঙ্গলে ঘোরে।
রাইত দিন দুই ভাই আল্লার জিকির করে ॥
বনের যত দেও-দানব আর পরিস্তানের পরি।
মুরিদ হইল তারা গাজির পায়ে ধরি ॥
গাজি আমার কলির পির কেবা নাহি জানে।
পানির কুম্ভীর বনের বাঘে গাজির দোহাই মানে ॥
জঙ্গল পথে দুইভাই হইলা রওয়ানা।
পথের মাঝে হইল এক আজব ঘটনা ॥
সাত ভাই আইছে তারা কাইট্যা নিত খড়ি।
ওই জঙ্গলার ধারো আছিল তারার বাড়ি ॥
আইজ তারা সাতভাই খড়ি কাটা আইয়া।
বড় খুশি হইল তারা পির দুইজন পাইয়া ॥
পিরের পায়ে সালাম করে আনন্দিত হইয়া।
মুরিদ হইল গাজির মহামন্ত্র লইয়া ॥
সাত ভাইয়ে কয় বাবা কথা যদি রাখো।
দয়া করিয়া একদিন আমরার বাড়িত থাকো ॥
গাজিরে লইয়া তারা সাত ভাই চলিল।
কালু কয় দেখো একটা ভেজাল যে বাড়াইল ॥
বাড়িতে নিয়া তারা কোন কাম করিল।
এক ঘর খালি করি আসন পাতি দিল ॥
দিন গত হইল যখন রাইত গেল হইয়া।
ঘর ভরিয়া বইল তারা সকলে মিলিয়া ॥

[কথায়]
এমন সময় গাজি সাহেব উপদেশ স্বরূপ একটা গান ধরলা।

[গান]
দমে দমে পড়ো জিকির
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা
নাম ছাড়া দম ছাড়ো যদি
ঠেকবে হিসাবের বেলা ॥
একূল সেকূল দুজাহানে,
ত্বরে যাবে নামের গুণে
টের পাইয়াছে আশেকগণে
কোন কালে খেলে মৌলা ॥

[ছন্দে]
পরের দিন গাজি সাহেব আসনেতে বইয়া।

www.pathagar.com

দেও-দানব হক্কলরে আনিলা ডাকিয়া ॥
গাজি সাহেব দেও-দানবরে কইলা বুঝাইয়া।
রাইতে রাইতে ঘর-দরজা দেও বানাইয়া ॥
হুকুম পাইয়া তারা হক্কল দানব গেল।
রাইতে রাইতে দালানকোটা বানাইয়া দিল ॥
এই সব দেখিয়া কালু মনে মনে কয়।
হকল নাম তো গাজির হইল আমি তো কিছু নয় ॥

[কথায়]
কাজ দিয়া তো কাজি, আর না হইলে গায় মানে না আর
আমি মনে মনে মোড়ল হইলে কী কাম হইব।

[ছন্দে]
হইত যদি সোনার বৃষ্টি গাঁওখান জুড়িয়া।
আসমান হইতে সোনা পড়িত ঝরিয়া ॥
আল্লায় যদি এই দয়া আমারে করিত।
মনের মানস পুরা আমার হইত ॥
কালু আছলা বাক্যসিদ্ধা যখন গেলা কইয়া।
আকাশ হইতে সোনা পড়িল ঝরিয়া ॥
জীবন ভরা হুনিয়া আইছ ময়মুরব্বির বুলি।
সোনারগাঁও সোনা পড়ল ফকির আর ফকিরানী খালি ॥
মনে মনে হাসইন গাজি এইসব দেখিয়া।
কালুর যে কীর্তি-কাণ্ড গেলেন বুঝিয়া ॥
তারপরে দুইভাই খুশি মনে বইয়া।
রাখিলা এই দেশের নাম সোনাপুর বলিয়া ॥
সোনাপুরে আছেন দুই ভাই আনন্দিত মনে।
কোন কলে খেলে মৌলা নিজেই তাহা জানে ॥
দুই ভাই ঘুমাইছইন একদিন দুই পালঙ্কেতে।
আইছে ঐ দিন ছয় পরি পরিস্তান হইতে ॥
লাল পরি, সাদা পরি আর কালা পরি।
চান পরি, নীল পরি, ছোটোলার নাম নূরী ॥
এই ছয় পরি তারা সকলে মিলিয়ে।
আইল তারা সোনাপুরে রথ চালাইয়া ॥
যে ঘরে গাজি কালু শুইয়া নিদ্রায় যায়।
রথ লামাইল ওই ঘরের সদর দরজায় ॥
দরজা খুলিয়া তারা ঘরের ভিতর গেল।
দেখিয়া গাজির রূপ পাগল হইল ॥
এক পরি বলে, 'আমি জাতিকুল ছাড়িয়া।

www.pathagar.com

সেবিব চরণ গাজির জনম ভরিয়া ॥'
আরেক পরি কয়, 'গো বইন কি বলিব হায়।
ঠিকওই কই তোর মতো আমার মনেও চায় ॥'
পরি হকল আইছিল তারা গাজিরে দেখতো।
অনে তারা পাগল হইছে বিয়া বইয়া থাকতো ॥
দেখিয়া গাজির রূপ আকুল পরান।
আর নাচিয়া নাচিয়া তারা গায় এক গান ॥

[গান]
কী করিব রূপ দেখিয়া পাগল হইলাম গো।
উড়ু উড়ু করে পরান উড়িয়া যাইত গো ॥
আয় না তোরা সবাই মিলে
ঝাপ দেই রূপ সাগরের জলে
কী করিবে জাতিকূলে সব হারাইলাম গো ॥
কেন আইলাম কেন চাইলাম
রূপের পাগল কেন হইলাম
কেন আজ এই রূপের ফাঁদে আটক হইলাম গো ॥

[কথায়]
এক পরিয়ে কয়, গো বইনাইন বেল পাকলে কাউয়ার আশা নাই। আমরা এই আশা করিয়া লাভ হইত নায়। অনে কও গাজির লগে জুড়ি হইত পারে এমন সুন্দরী কন্যানি কেউর দেখা কি জানা আছে। আরেক পরিয়ে কইল, আমার জানা মতো এক কন্যা আছে গো। কন্যার নাম চাম্পাবতী। বাপের নাম মুটুক রাজা। দেশের নাম ব্রাহ্মণনগর। চারদিকে নদী, আর দেশ বড় সুন্দর। আরেক পরিয়ে কয়, অইছে বেটি গাছে আর মাছে গপ্ করিছ না। ই-দামান্দের জুড়ি কোনো কন্যা আছে করি আমার বিশ্বাস হয় না। তে ওই আগের পরিয়ে কয় যদি বিশ্বাস না করো গো তে লও গাজিরে লইয়া যাইগি ঐ কন্যার মন্দিরো। তে ধারাধারি থইয়া হক্কলেই দেখি লাইবায়নে।

[ছন্দে]
এই যুক্তি করিয়া ধরে পালঙ্কের খুরা।
ধরিয়া বাহির করি লইয়া দিল উড়া ॥
চাম্পার মন্দিরো লইয়া গেল পরিগণে।
গাজিরে রাখিল নিয়া চাম্পার ডাইনে ॥

[কথায়]
দেখিয়া তারা কয়, অনে অইছে গো যেমন দুধে আর সপরিকলায়।

www.pathagar.com

[ছন্দে]
পরিগণে চাম্পার ধারো গাজিরে থইয়া।
রাজার বাগানে তারা গেল যে চলিয়া ॥
বাগানেতে পরিগণে ঘুরিয়া বেড়ায়।
কী হইল মন্দিরের মাঝে কই ভদ্র সভায় ॥
ঘুমের ধুন্দে গাজি সাহেব গা মুচড়া দিলা।
আর ঘুম ভাঙিয়া চাম্পাবতী জাগিয়া উঠিলা ॥

[কথায়]
বইয়া দেখইন তান ধারো আরেক পালঙ্কের মাঝে এমন সুন্দর এক পুরুষ। দেখিয়া কন্যা চাম্পাবতী হইলা বেহুশ। হেষে চিন্তা করলা জাগাইতে পারলে তো জানতাম পারলামনে তাইন মানুষ না দেবতা। আর কেমনে আমার মন্দিরো আইলা। এমন সময় গাজি সাহেবের ঘুম ভাঙ্গি গেছেগি। চাইয়া দেখইন এমন সুন্দর এক কন্যা, দেখিয়া তান যেমন তালু-জিহ্বায় লাগি গেছেগি। কইন, আল্লা! ই কিতা আর কোয়াই আইলাম?

[ছন্দে]
চাম্পায় কইন, 'হা রে চোরা কও সত্য করি।
কী নাম তোমার আর কই তোমার বাড়ি ॥
আমার মন্দিরে তুমি কেমনে আইলায় বলো।'
গাজি কইন আল্লায় দেখি ফালাইলা ভেজালো ॥
গাজি কইলা, 'বাপের নাম শাহা সেকান্দর।
রাজত্বি আছে বাবার বৈরাট নগর ॥
এই মিছা দুনিয়ার কাজে মন নাহি বসে।
ফকির হইয়া আমি ঘুরি দেশে দেশে ॥'
গাজিয়ে কইন, 'বুঝলাম আমি তুমি যে চতুর।
আনছো তুমি চুরি করিয়া আর আমারে কও চোর ॥'
অনেক সময় করলা দুইজন কথা কাটাকাটি।
হেষে কন্যা চাম্পাবতী কথায় দিলা ভাটি ॥
এই দুনিয়ার সকলই হয় পিরিতের রোগী।
আগুনের ধারে কিলা ঠিক থাকবো ঘি ॥
চাম্পায় কইন, 'কিলা আইলায় আমি তো বুঝি না।
মন আমার কাড়িয়া নিলায় বানাইলায় দেওয়ানা ॥'
চাম্পায় কইন, 'আমি তোমার দুই পায় ধরি।
তুমিনি আমার হইবায় কও সত্য করি ॥
আমার নৌকায় যদি তুমি হও মাঝি।
তোমার লাগি মরণ অইলে মরতেও আমি রাজি ॥'

www.pathagar.com

গজি বলেন, 'আমি যাইব কেমনে।
তুমি আমার আমি তোমার জীয়নে মরণে ॥'
কেউ কেউরে ছাড়তা নায়–কথা গেলা দিয়া।
হাতের আংটি আর পালঙ্ক লইলা বদল করিয়া ॥
চাম্পার পালঙ্কে শুইলা গাজি মহামতি।
আর গাজির পালঙ্কে শুইলা কন্যা চাম্পাবতী ॥
বাগানে পরিগণ ছিলা যে ভ্রমণে।
হঠাৎ গাজির কথা পড়ি গেল মনে ॥

[কথায়]
এমন সময় এক পরি কইল, 'ওলো বইনাইন গাজিরে থইয়া আইছি চাম্পার মন্দিরো। হিবায়দি রাইত পুয়াই যারগি, কালু যে বেটা হুনছি শাপ দি এক্কেরে ভস্ম করিলাইব। চালায় লও।'
আইয়া দেখে মামলৎ বাজি গেছেগি ইবায়দি, বরিত্ মাছে ধরি লাইছে।

[ছন্দে]
দেরি না করিয়া ধরে পালঙ্কের খুরা।
ধরিয়া বাহির করি লইয়া দিল উড়া ॥
আল্লায় যদি বাঁচায় আইজ পরিগণে বলে।
জাগার মাল জাগাত্ থইয়া তারা গেল চলে ॥
পরিগণ চলিয়া গেল পরিস্তান শহর।
জাগিয়া উঠিলা গাজি হইল ফজর ॥
জাগিয়া দেখইন গাজি আইছইন সোনাপুরে।
চাম্পা চাম্পা করিয়া গাজি কান্দে উচ্চস্বরে ॥
শুনিয়া দেওয়ান কালু উঠিলা জাগিয়া।
কালু দেখইন গাজি গেছইন পাগল হইয়া ॥
কালু কইন, 'কও ভাই তোমার কী হইয়াছে।'
গাজি কইন, 'কালনাগিনী আমারে দংশিছে ॥
আল্লার কুদরত লীলা কে বুঝিতে পারে।
কেমনে গেলাম জানি না ভাই এক কন্যার মন্দিরে ॥
এমন এক সুন্দর কন্যা দেখলাম কালু ভাই।
দেখছি থনে আমি আর আমার মাঝে নাই ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ পাগল হইল মন।
হেষে আমরা দুইজন করিয়াছি পণ ॥
হয়তো কন্যারে পাব নইলে প্রাণ যাবে।
এ জীবনে ছাড়াছাড়ি আর না হইবে ॥
এইভাবে শক্তাশক্তি কথাবার্তা কইয়া।
কন্যার পালঙ্কে আমি রইলাম ঘুমাইয়া ॥

www.pathagar.com

কই রইল চাম্পাবতী আর আমি কই আছি।
বলো এখন কালু ভাই আমি কেমনে বাঁচি ॥'
কালু কইন, 'জ্ঞানী তুমি দেখ বিচার করে।
স্বপনের কথা এইসব মিছা হইতে পারে ॥'
গাজি কইন, 'কিতা কও আমি কি আর বোকা।
দেখ না আংগুটের মাঝে কন্যার নাম লেখা ॥'
কালু কইন, 'হও তুমি আল্লার ফকির।
হিন্দু আর মুসলমানে সবে মানে পির ॥
তুমি তো কিলা তোমার মুখে কও এমন কথা।
রাজত্বি করিতে তবে দোষ ছিল কিতা? ॥
মিছামিছি নাম কেন ফকির ধরিলে,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া যদি না ছাড়িলে ॥'
গাজি কইন, 'কি করিব আল্লায় সব জানে।
কে খণ্ডাইতে পারে যাহা লেখে নিরাঞ্জনে ॥'

[কথায়]
কালুয়ে কইন তুমি ইতা কিতা লাগাইছ-বা এই দুনিয়ার মাঝে কত পির আউলিয়া আইলা তারার কপালো তো ইতা লেখি দিলা না। তুমি চাম্পা চাম্পা কইয়া একেবারে দেওয়ানা হইগেছগি। বেট্রিয়ে কিবা তোমার কথা মনেঅউ করের না। ইতা বাদ দেও। মাইনষে কইব দেখছনি-বা ফকিরির ফল, ফকির তারা দুই ভাই এর মাঝে দুই দল।

[ছন্দে]
গাজি বলেন, 'আমারে আর বুঝাইও না ভাই।
আমারে জানিও তুমি, আমি আর নাই ॥
আমি যাইমু কন্যার খোঁজে আমার পথ ছাড়ো।
তুমি যদি না যাও তবে, তোমার পথ ধরো ॥'
কালু ভাবইন গাজিরে তো বড়টায় পাইছে।
আমি এক সিধা মানুষ আমারে ঠেকাইছে ॥
কী করা যায় না-গেলে তো মনেও বুঝে না।
হেষে তারা দুই ভাই হইলেন রওয়ানা ॥
চাম্পাবতীর খোঁজে তারা চলিলেন দুইজন।
চাম্পাবতীর কথা কিছু কই বিবরণ ॥
ঘুম ভাঙিয়া চাম্পাবতী গাজিরে না পাইয়া।
ছানতা দিয়া পড়ি গেছইনগি গাজি গাজি কইয়া ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ধুলায় গড়ায়।
কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পায় এক গান গায় ॥

www.pathagar.com

[চাম্পার গান]
প্রাণনাথ বন্ধু আমার কই রইল গো।
এ জীবনে ছাড়িবে না কথা দিল গো ॥
কী সন্ধানে কাছে এলো
কী করে যে লুকাইল
কী জাদু করিয়া আমায় পাগল করল গো ॥
সে যদি ছাড়িয়া গেলো
প্রাণ গেলেও হইত ভালো
কী করিব এখন আমার উপায় বলো গো ॥

[ছন্দে]
চাম্পাবতীর কথা এখন এইখানে থইয়া।
গাজি-কালুর কথা কই শুনো মন দিয়া ॥
যাইতে যাইতে সামনে পাইলা সুন্দর এক নগর।
চারিদিকে নদী তার দেখিতে সুন্দর ॥
কালু বলেন, 'কী করিব উপায় বুদ্ধি নাই।'
গাজি কইন, 'মনো হইছে পাইছি কালু ভাই ॥'
হিপাড়ো সুন্দর এক ঘাট দেখা যায়।
ইপাড়ো বইলা দুই ভাই বটগাছের তলায় ॥
কালু কইন, 'কথা একটা আইজ দেও ভাই।
কাইল যদি কন্যার দেখা ঘাটের মাঝে পাই ॥
তবে যাইমু তোমার লাগি বিয়া জুড়তে আমি।
নাইলে চাম্পার নাম ছাড়ি দিবায়, সত্য করো তুমি ॥'
গাজি বলেন, 'কাইল যদি দেখা নাহি পাই,
এই নাম ছাড়িয়া দিমু আল্লার দোহাই ॥'
গাজি যখন এই কথা কইলা সত্য করে।
কালু ভাবইন আল্লা তুমি বাঁচাইলায় আমারে ॥
আল্লা বলি গাছতলায় বইলা দুই ভাই।
চাম্পাবতী কী করিলেন এখন কইয়া যাই ॥
গাজির কথা ভাবতে ভাবতে রইছইন ঘুমাইয়া।
স্বপ্নযোগে কে জানি চাম্পারে যায় কইয়া :
'দিবানিশি যার লাগি কান্দ পাগল হইয়া।
কাইল যাও গাঙ্গের ঘাটো দেখা যাইবায় পাইয়া ॥'

[কথায়]
স্বপন দেখিয়া ওই চাম্পা রাইত থাকতে উঠিয়া বই রইছইন কতখানে রাইত পুয়াইতো। গাঙ্গর ঘাটো যাইতা আর গাজির দেখা পাইতা।

www.pathagar.com

[ছন্দে]
অপেক্ষায় অপেক্ষায় রাইত গেছে পুয়াইয়া।
গাঙ্গের ঘাটো গেলা চাম্পা সাথি সঙ্গী লইয়া ॥
গাঙ্গের ঘাটো গিয়া চাম্পায় নজর করি চায়।
মনচোরারে দেখা যায় বটগাছর তলায় ॥
আকার ইঙ্গিতে তাদের কথাবার্তা হইছে।
কালুয়ে কইন, 'বুঝলাম ভাই আমার সন্দেহ গেছে ॥'
পরের দিন চলিলা কালু ভরসা আল্লার।
বিয়ার আলাপ লইয়া কালু নদী হইলা পার ॥
রাজা বইছইন সিংহাসনো পাত্রমিত্র লইয়া।
কালু গিয়া খাড়া হইছইন সালামালকি দিয়া ॥
রাজায় কইন, 'কিতা চাও বাড়ি তোমার কই।'
কালু কইন, 'আইছি যখন কইমু-বা তালই ॥
আমার এক ভাই আছে গাজি জিন্দাপির।
রাজত্বি ছাড়িয়া ঘুরে হইয়া ফকির ॥
তোমার এক মাইয়া আছে চাম্পাবতী নাম।
কিতা কইতাম করছে যে সর্বনাশা কাম ॥
লোভ নাই, লালসা নাই আমার ভাই সাধু।
কেমনে কেমনে তোমার মাইয়ায় কইরা বইছে জাদু ॥
কাইল গেছিল গাঙ্গের ঘাটো আইছে কিতা কইয়া।
আমি আইছি তালই সাহেব বিয়ার আলাপ লইয়া ॥
বিয়াখান দেওন লাগবো আর বিচারখান করো।
তিনদিন হয় আইছি আমার গাঙের হিপারো ॥'
ইতা হুনিয়া ঠারা-ঠুরি লাগাইদিছে সভার হকলতায়।
ফকিরে যেতা কয় মিছা কথা নায় ॥
শরমে আর গোস্বায় রাজা আগুন গেলা হইয়া।
হুকুম দিলা ফকিররে থও হাত পাও বান্ধিয়া ॥
হুকুম পাইল তারা ধরিলো কালুরে।
কালু কইন, 'কিতা-বা কোয়াই নিতায় আমারে ॥
আমি আইছি বিয়াখানের তারিখ নিবার দায়।
আমার যাওনগি লাগব আইজ থাকতাম নায় ॥
তোমরা কিতা হকলতায় আমারে খালি টানো।
জামাই গাঙের হিপারো, জামাইরে গিয়া আনো ॥
টেকা-পয়সা দিয়াও ইজাত জামাই পাইতায় নায়।
জামাই দেখলে দেখবায়নে গোসা কোয়াই যায় ॥'
কালুর বিপদ গাজি মনেতে জানিয়া।
বাঘ ভাল্লুক দেও পরি আনিলা ডাকিয়া ॥

www.pathagar.com

নদী পার হইলা গাজি বাঘ ভাল্লুক লইয়া।
ভয়ে কাঁপে মুটুক রাজা বাঘ ভাল্লুক দেখিয়া ॥
যুদ্ধে হারিয়া রাজা রাজি গেলেন হইয়া।
বন্দি ছিলেন কালু শাহা–দিলেন ছাড়িয়া।
কম সময়ে বেশি কথা কিলা যাইতাম কইয়া।
গাজির সাথে চাম্পাবতীর হইয়া গেল বিয়া ॥

[ছন্দে]
কোয়াই গেলায় গো সরলা ধার খানো বও।
হকলরে লইয়া এগু বিয়ার গীত কও ॥

[বিয়ার গান]
কেমনে মায়ের মন রাখিবা বান্দিয়া
আদরের জিয়াইরে ঘরের বাইরো করিয়া ॥
সিয়ান করিলা মায়ে পালিয়া-পুষিয়া।
নিজের হাতে দিলা মায়ে পরেরে সঁপিয়া ॥

[ছন্দে]
হুনো গো মাই-বইনাইন যে-যারে চায়।
চাইবার লাকান চাইলে আল্লায় একদিন মিলায় ॥
কই আছলা গাজি সাহেব আর কই চাম্পাবতী।
কেমনে দেখো দুইজনে হইল পিরিতি ॥
ধরিল তাদের দুইজনের প্রেমের গাছে ফল
আইজ হইল জিন্দা গাজির জঙ্গলে মঙ্গল ॥

খ. লোকনৃত্য

কৃষি ও মৎসনির্ভর হাওরাঞ্চলে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' যেন লেগেই থাকে। এসব উৎসব উপলক্ষে নানা আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। পাশাপাশি নানা লোকগানের পরিবেশনাও দেখা যায়। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মালম্বীদের বিয়ে এবং শিশুদের অন্নপ্রাশনের সময় গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণে ধামাইল গান এবং পূজা-অর্চনার অংশ হিসেবে মাঘ মাসে সূর্যব্রত পালিত হয়। ধামাইল গান এবং সূর্যব্রতের গান নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অংশধারা হিসেবে এসব লোকনৃত্য হাওরবাসীর লোকায়ত সংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। নারীরা বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাসন অনুষ্ঠানে যখন ধামাইল গান পরিবেশন করে থাকেন, তখন নৃত্যের তালে তালে এটি পরিবেশন করা হয়। এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতি গবেষক সুমনকুমার দাশ তাঁর সম্পাদিত *বাংলাদেশের ধামাইল গান* বইয়ে লিখেছেন, 'ধামাইল গান পরিবেশনের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে নৃত্য। বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের ধামাইল গানের শিল্পীরা এই গান পরিবেশনের শুরুতে হাত দিয়ে এক থাপা (একবার করতালি দেওয়াকে 'এক থাপা' বলা হয়) দিয়ে এক প্রকার নৃত্য সৃষ্টি করে থাকেন। ধামাইল গান পরিবেশনার সময় এই সূচনার নৃত্যগীতের লয় ধীর হয়ে থাকে। ক্রমান্বয়ে সেই

www.pathagar.com

লয়ে গতি আরোপিত হয়। ধামাইল গানের শিল্পীরা এই গান ও নাচের গতি ক্রমান্বয়ে বাড়াতে চরম পর্যায়ে বা শেষ মুহূর্তে হাতের থাপা বা করতালির পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। এক্ষেত্রে শিল্পীরা দুই থাপা, তিন থাপা, চার থাপা করে করতালির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ধামাইল গান ও নাচ পরিবেশনে গতি এবং বৈচিত্র্য রচনা করে থাকেন।'

গবেষক ও নৃত্যবিদ মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য তাঁর *বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য* গ্রন্থে ধামাইল নৃত্যের পাঁচটি মুখ্য বিষয় শনাক্ত করেছেন। যথা–করতালি, অঙ্গচালনা, পদচালনা, হস্তচালনা এবং শিরচালনা। তিনি ২০ প্রকার ধামাইল নৃত্যের বর্ণনা করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. নৃত্যটি সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণাবর্ত মণ্ডলাকার দলবদ্ধ নৃত্য।

২. মহিলাদের নৃত্য লাস্য ভাবশ্রয়ী হলেও তার মধ্যে বীর রসের উদ্দীপনা বর্তমান বলেই বলিষ্ঠ।

৩. নৃত্যটি মন্থরলয়ে শুরু হয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে গিয়ে পুনরায় ধীর লয়ে ফিরে আসে।

৪. নৃত্যটি ১২ মাত্রা খেমটা তালের ত্রিমাত্রিক ছন্দে অগ্রসর হয়, তবে তাল ফেরতা করে ৮ মাত্রা, ৭ মাত্রা বা ৫ মাত্রায় এনে আবার খেমটা ১২ মাত্রায় ফেরত নিয়ে ধীর লয়ে সমাপ্ত হয়।

৫. বিশেষ করে ত্রিমাত্রিক চারটি বিভাগে মাত্র ৪টি পদক্ষেপ, প্রতি পদক্ষেপে ৩টি করে মাত্রা। ডান পায়ে প্রথম মাত্রায় সামনে ঝুঁকে পদক্ষেপ, অন্য মাত্রাগুলিতে বাম পা ভূমিচ্যুত, পিছনের শরীরে একটা ঝোঁক, ৪র্থ মাত্রায় বামপায়ে পিছনে পদক্ষেপ শরীর আকাশপানে, ৭ মাত্রায় ডান পা পিছনে, পদক্ষেপ শিরদাঁড়া সোজা, বাম পা মাটি থেকে উঠে ১০ মাত্রায় বাম পা-কে টেনে নিয়ে শরীরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ডানে অগ্রসর হয়ে ১২ মাত্রায় পা পড়বে। তার পুনরাবৃত্তি চলবে প্রতি পদক্ষেপে কিংবা আঁড়িতে চুটকি বা শরীরে ঝাঁকুনি থাকবে। এইবার মাত্রার মধ্যেই ডানে সামনে ঝুঁকে পিছনে বাম পায়ে ডান পায়ে বাহির দিকে আবার বাম পায়ে ডান পাশে সরিয়ে নিতে হবে। এই বিশেষ চলনের জন্যই নাচটির বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়।

৬. নৃত্যটি ১২ মাত্রার মধ্যে তাল-লয়-ছন্দ ঠিক রেখে যত বেশি তালি সন্নিবেশ করা যাবে তত বেশি উৎকর্ষের হবে। ৮ মাত্রা, ৭ মাত্রা বা ৫ মাত্রাতেও সেইরূপ তালি প্রয়োগ হবে।

৭. কেবল উদয় ধামাইল গীত-নৃত্যে করতালি সন্নিবেশ হয় না। স্কন্ধ থেকে বাহু, কবজি থেকে হাতের অঙ্গুলি গোটা অংশটাকে এক ঢেউ খেলানো প্রক্রিয়াযুক্ত করা হয়–যা খুব কোমল-লাস্যপূর্ণ।

৮. নৃত্যে করতালির মাঝে মাঝে তালের আঁড়ি বুঝে আঙুল দিয়ে চুটকি বাজানো কৃতিত্বের পরিচায়ক।

৯. দ্রুতলয়ে নৃত্য চলাকালীন ৯ মাত্রার পর ১০, ১১ মাত্রার মধ্যে অঙ্গকে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে এনে 'সম'-এ স্থাপন কৃতিত্বের পরিচায়ক।

১০. নৃত্যটি ১২ মাত্রার প্রতিটি ৩ মাত্রায় ডানে-বাঁয়ে-পিছনে-সামনে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝে একটা প্রস্ফুটিত ফুলের রূপ দেওয়ার কৌশল মাত্র।

১১. করতালি ছাড়াও করতাল সহযোগে অনেক ধামাইল নৃত্য হয়ে থাকে। করতাল বাদ্য হয়ে সহকারে নৃত্যকালীন মুক্ত ছন্দে অঙ্গসঞ্চালন যথেষ্ট কলাকৌশলযুক্ত।

www.pathagar.com

১২. মণ্ডলাকারে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে করতালি দেওয়া, সঙ্গী পরিবর্তন করা তৃতীয় জনের সঙ্গে করতালি দিয়ে ক্রমান্বয়ে নৃত্য প্রদর্শন হয়ে থাকে।

১৩. কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ সামনের দিকে ঝুঁকে ৪ মাত্রায় চুটকি বাজিয়ে সমস্ত শরীরকে মাটি থেকে প্রায় অর্ধফুট উপরে তুলে আবার নাচের শুরুতে যাওয়া এক বিশেষ কৌশল। কর্ম বা অন্য বিষয়ক ধামাইল নৃত্যেই এসব প্রয়োগ হয়।

১৪. মাথায় বরণডালা তাতে নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ জ্বলন্ত একাধিক প্রদীপ স্থাপন করে দ্রুততালে লয়ে নৃত্য করে সবকিছু যথাযথ রাখা এক বিশেষ কলাকৌশল–যা কর্ম বিষয়ক ধামাইল নৃত্যে দেখা যায়।

১৫. কলসি কাঁখে বা মাথায় নিয়ে নৃত্য করা, পদচালনে কোনো পরিবর্তন নেই, শুধু শূন্য কলসি হলে নৃত্যরত অবস্থায় হাত বদল করা, আবার জলভর্তি কলস হলে দুই হাতের অঙ্গুলি দিয়ে ঠুকে ধ্বনি উৎপন্ন করার কৌশল দেখা যায়। তবে জল ধামাইলে তা বেশি প্রয়োগ হয়।

১৬. আঙ্গিনায় বিছানো ধানের তুষ, বালি, সামান্য কাদামাটির মধ্যে দলবদ্ধভাবে কেবল ৮ মাত্রার তিন চার গুণিতক সময়ের মধ্যে নকশা তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করে ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি করে ৫ মাত্রা, ৭ মাত্রা হয়ে মূল নৃত্যে ফিরে যাওয়ায় মাটিতে যে শিল্পরূপ ফুটে ওঠে তা শিল্প ও কলা জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৭. মাথার উপর জ্বলন্ত অসংখ্য প্রদীপ রেখে নৃত্যাবস্থায় মাটি থেকে দেহ তুলে পাশে রাখা কাঁসার থালায় দুই প্রান্তে দুই পা দিয়ে চক্কর কাটা আনুষ্ঠানিক ধামাইল নৃত্যে হয়ে থাকে।

১৮. রথযাত্রা, নৌকা টানা, দেউল ভাসানো উৎসবে এক ধরনের ধামাইল নৃত্য হয়। তবে মণ্ডলাকারে নয়, সন্মুখে অগ্রসর হওয়ার কারণে তাই পদক্ষেপ, করতালিসহ বা নৌকা (প্রতীক) মাথায় নিয়ে দেউলের থালা মাথায় নিয়ে নারারূপ নৃত্যছক তৈরি প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

১৯. কর্ম বিষয়ে ধামাইল গানের সঙ্গে ধামাইল নৃত্য সম্পূর্ণ মুক্তছন্দের হয়। এক্ষেত্রে শারীরিক নানা কৌশলক্রিয়া, ওঠাবসা, হাত ধরে, কোমর ধরে নৃত্য রচনা হয়। করতালি ছাড়াও ঢোলক, চিমটা, যষ্টিদণ্ডও ব্যবহার করা হয়।

২০. কলা গাছের খোল দিয়ে নৌকা তৈরি করে তাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে, আবার কোথাও সুপারি গাছের খোল দিয়ে নৌকা তৈরি করে, আবার কলার পাঁচন দিয়ে বেদির মতো তৈরি করে দেওয়ালির গোধূলিলগ্নে বিজয়ার ভাসানে–সাবিত্রীব্রতের পরে নদীপাড়ে পুকুরপাড়ে বিসর্জনের পূর্বে এক ধরনের ধামাইল নৃত্য হয় তা সমস্তই লৌকিক অনুষ্ঠানের চরম আত্মতৃপ্তির জন্য হয়ে থাকে। অবশ্যই তা অত্যধিক কলাকৌশলগত, আনন্দদান, তৃপ্তিদানের জন্যও হয়।

ধামাইল ও সূর্যব্রত নৃত্য নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপরদিকে বিভিন্ন গ্রামে সন্ধ্যার সময় হিন্দু ধর্মালম্বী পুরুষেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নামসংকীর্তন প্রচার করেন। এ সময় তাঁদের শরীর দুলিয়ে নৃত্যের তালে কীর্তন পরিবেশন করতে দেখা যায়। এছাড়া দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন পূজায় হিন্দু পুরুষেরা আরতিতে (সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো বিশেষ) অংশ নেন। এ সময় ঢোলের বাদ্যে ছন্দময় নৃত্যের তালে অনেকেই আরতিতে অংশ নেন।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

সুনামগঞ্জ জেলায় একসময় নানা ধরনের লোকক্রীড়ার প্রচলন থাকলেও এখন অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। প্রযুক্তির সুবাদে মুঠোফোন প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সহজলভ্য হয়ে পড়ায় এসব লোকক্রীড়ার প্রতি মানুষজন ক্রমশই আগ্রহ হারাচ্ছেন। তবে ছোট শিশুদের মাধ্যমে অনেক লোকক্রীড়া এখনো সজীব ও প্রাণবন্তভাবে চির উদ্ভাসিত হয়ে স্বমহিমায় উজ্জ্বল স্থান দখল করে রেখেছে। এর বাইরে গ্রামীণ মানুষেরা এখনো চিত্তবিনোদনের জন্য কিছু কিছু লোকক্রীড়ার আয়োজন করে থাকেন। এখনো বহু বর্ণিল ও ঘটা করে এসব আয়োজনে জেলার মানুষেরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। দেশে অঞ্চল ভেদে নানা ধরনের লোকক্রীড়ার প্রচলন থাকলেও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় জেলার পার্শ্ববর্তী নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি হাওর অধ্যুষিত জেলার লোকক্রীড়ার সঙ্গে সুনামগঞ্জ জেলার সাদৃশ্য রয়েছে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে হাওরবর্তী গ্রামের শিশু, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ নানা বয়সী মানুষ শ্রেণিমতো বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়ার আয়োজন করে থাকেন। ঘরের ভেতর, বাড়ির উঠোন, গ্রামের পাশের মাঠ, বাড়ির পাশের গোপাট, নদী-খাল-বিল, গাছ, মাঠ-খেতসহ নানা স্থানে লোকক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লোকক্রীড়াগুলো হচ্ছে : বউছি খেলা, শিল্লুক খেলা, পাখি শিকার খেলা, লাঠিখেলা, কুস্তিখেইড়, ঘুড়ি ওড়ানো খেলা, ডাঙুলি, ঠুভাভাতি খেলা, ঘিলা খেলা, মারবেল খেলা, ষোলোঘুঁটি খেলা, কানামাছি খেলা, গাছ খেলা, বাঘবেড় খেলা, বাঙ্যা-ব্যাঙির বিয়ে খেলা, লাই খেলা, নৌকাবাইচ, হা-ডু-ডু খেলা, গোল্লাছুট খেলা, কড়ি খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, লুকোচুরি খেলা, বউ তোলা খেলা, ছক্কা খেলা, তই তই, রস-কষ-সিঙা-বুলবুল খেলা, বাঘবন্দি খেলা ইত্যাদি।

১. মোরগ লড়াই

মোরগ লড়াই সুনামগঞ্জের বালকদের কাছে একটি জনপ্রিয় লোকক্রীড়া। সাধারণত ছয় থেকে ১৪ বছর বয়সী বালকদের কাছে এ খেলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা স্বরূপ বয়স্করাও এ খেলার আয়োজন করে থাকেন। এছাড়া জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মৌসুমভিত্তিক ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নানা প্রতিযোগিতার মধ্যেও এ খেলা অন্যতম স্থান দখল করে রেখেছে। ডান পা-কে ডান হাত দিয়ে কিংবা বাম পা-কে বাম হাত দিয়ে ধরে ভাঁজ মতোন করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে এ খেলায় অংশ নিতে হয়। তবে একটি হাত দিয়ে পায়ে ধরে অপর হাতটি পিঠের দিকে নিয়ে ওই পা ধরা হাতে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এতে করে প্রতিযোগির দুটি হাতই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর হাতের কান্ধ দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে খেলায় টিকে থাকতে হয়।

www.pathagar.com

লাই খেলা

এই ধাক্কাধাক্কির পর্যায়ে যদি কোনো প্রতিযোগির হাত কিংবা পা আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেই প্রতিযোগিকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়তে হয়। এভাবে খেলতে খেলতে যে প্রতিযোগি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে, তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এর বাইরে 'মোরগ লড়াই' নামে আরেকটি খেলার প্রচলন রয়েছে। গ্রামের সৌখিন মানুষেরা এ খেলার আয়োজন করে থাকেন। প্রাণী মোরগের মধ্যে এ লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যে মোরগ লড়াই করে প্রতিপক্ষ মোরগকে হারাতে পারবে, সে প্রাণিটিকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অনেক সৌখিন মানুষ এ লড়াইকে পারিবারিক প্রতিপত্তি এবং বংশ মর্যাদার লড়াই হিসেবেও বিবেচনা করে থাকেন। তাই বছর ধরে একটি মোরগকে পুষে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখেন।

২. লাই খেলা

লাই খেলা সুনামগঞ্জে বালক-বালিকাদের বহুল জনপ্রিয় একটি খেলা। নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর-ডোবা-হাওরের পানিতে এটি খেলতে হয়। নদী কিংবা পুকুরে শুষ্ক মৌসুমে এ খেলা চললেও সাধারণত বর্ষাকালে এ খেলা ব্যাপকতা পায়। খেলা শুরুর কিছু নিয়ম রয়েছে। প্রতিযোগিদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, যতসংখ্যক ইচ্ছা খেলোয়াড় এতে অংশ নিতে পারে। খেলা শুরুর আগে সব প্রতিযোগিরা কোমর সমান পানিতে গোল হয়ে দাঁড়ায়। এরপর একজন একজন করে পানিতে ডান আঙুলের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং অপর আরেকটি আঙুলের যৌথ সমন্বয়ে 'টোকা' দেন। যার 'টোকা' পানিতে টক্ করে শব্দ হয়, তিনি একপক্ষে নির্বাচিত হন। এভাবে যে প্রতিযোগির আঙুলের 'টোকা'য় শেষ পর্যন্ত শব্দ বা ধ্বনির সৃষ্টি না হয়, তাকে একাই অপরদের প্রতিপক্ষ সাজতে হয়। দুইপক্ষের মধ্যে একজন বাদে বাকি সবাই একপক্ষ। ওই নির্দিষ্ট একজনকে বাকিদের হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিজের পক্ষ ভারী করতে হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিযোগিরা স্পর্শের হাত থেকে বাঁচতে ডুব দিয়ে কিংবা সাঁতরিয়ে দূরে অবস্থান করতে থাকে।

www.pathagar.com

ওই নির্দিষ্ট খেলোয়াড় যদি একজনকে স্পর্শ করতে পারে, তাহলে দুইজন মিলে, এভাবে যতজনকে স্পর্শ করা হয়, তাঁদের প্রত্যেকে মিলে অপরদের স্পর্শ করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ খেলোয়াড়টিকে পর্যন্ত স্পর্শ করে যেতে হয়। সব খেলোয়াড়দের স্পর্শ হয়ে গেলে খেলা শেষ বলে গণ্য হয়। তবে যে খেলোয়াড়েরা শেষদিকে স্পর্শের শিকার হন, তারা শক্ত প্রতিযোগি হিসেবে গণ্য হন। হাওরাঞ্চলে 'স্পর্শ' শব্দটিকে আঞ্চলিক ভাষায় 'ছুয়া' অর্থাৎ 'ছোঁয়া' হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এজন্য এ খেলাকে অঞ্চল বিশেষে 'ছুয়াছুয়ি' খেলাও বলা হয়ে থাকে।

৩. নৌকাবাইচ

নৌকা বাইচ হাওরাঞ্চলে অন্যতম লোকক্রীড়া হিসেবে গ্রামীণ মানুষের কাছে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ খেলায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস ঘটা করে পালিত হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ আয়োজন করা হয়ে থাকে। আয়োজকেরা পান-চিনি পাঠিয়ে বিভিন্ন গ্রামের সৌখিন মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সৌখিন ব্যক্তিরা এক নৌকা বাইচের দল তৈরি করেন। বর্ণিল রঙে নৌকাটিকে সাজিয়ে বৈঠা-পাইক নিয়ে নৌকাটি পানিতে ভাসিয়ে একসঙ্গে বৈঠা বেয়ে আয়োজন স্থলে উপস্থিত হন। পরে নৌকাগুলো সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা নানা পর্বে বিভক্ত থাকে। একেক ধরনের নৌকার জন্য একেক প্রতিযোগিতা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : কোষা নৌকা বাইচ। এর মধ্যে বাইচে অংশ নেওয়া নৌকায় যেসব বৈঠাধারীরা থাকেন, তাঁদের নানা নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত নৌকায় অবস্থানকারীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমভাগের তিনি প্রধান হিসেবে নৌকার মূল কাড়ালি ধরে রাখেন, দ্বিতীয় ভাগের এরা সম্মিলিতভাবে বৈঠা টানতে থাকেন এবং তৃতীয় ভাগের এরা ঝান-করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে বৈঠাধারীদের উৎসাহ দেন।

নৌকাবাইচের আগে হিন্দু ধর্মালম্বীরা গঙ্গাদেবীর পূজা করেন এবং মুসলমান ধর্মালম্বীরা খোয়াজখিজিরের মানত করে। উভয়ই লোকিক অধিকর্তা। নৌকাবাইচে বৈঠাধারীরা ছন্দময় তালে তালে নৌকা জোরে বাইতে থাকেন। তাঁদের উৎসাহ দিতে একদল গায়ক ঢোলক-করতাল বাজিয়ে নৌকা বাইচের গান পরিবেশন করতে থাকেন। সুনামগঞ্জের প্রত্যেকটি অঞ্চলেই নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় জগন্নাথপুর উপজেলায় নৌকাবাইচকে কেন্দ্র করে ঝাঁকঝমকপূর্ণ পরিবেশ বেশি চোখে পড়ে। এ উপজেলার নলজুর নদী, কুশিয়ারা নদী এবং নলুয়া, মইয়া ও পিংলার হাওরে নৌকাবাইচ সুদীর্ঘকাল ধরে হয়ে আসছে। জগন্নাথপুর গ্রামবাসীর রয়েছে ময়ূর পংক্ষি নৌকা এবং ইকড়ছই ও হবিবপুর গ্রামবাসীর রয়েছে সুরম্য নানা ধরনের নৌকা। প্রবাসী ব্যক্তিরা কেবল বর্ষামৌসুমে নৌকাবাইচ আয়োজনের জন্য অপরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা ধরনের বাইচের নৌকা তৈরি করে থাকেন। নৌকাবাইচের সঙ্গে অত্যাবশকীয়ভাবে সারি গান জড়িয়ে রয়েছে। হাওরাঞ্চলে নৌকা বাইচের কিছু জনপ্রিয় গান নিম্নরূপ :

১

মহাজনে বানাইয়াছে ময়ূরপঙ্খি নাও
সুজন কাণ্ডারি নৌকা সাবধানে চালাও ॥
বাইচ্ছা বাইচ্ছা পাইক তুলিয়া নাওখানা সাজাও
যুগ বুঝিয়া ছাড়ো নৌকা সুযোগ যদি পাও ॥

www.pathagar.com

অনুরাগের বৈঠা বাইয়া প্রেমের সারি গাও
রঙিলা বন্ধুর দেশে যাইতে যদি চাও ॥
বাউল আবদুল করিম বলে বুঝিয়া নায়ের ভাও
লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বাইও যাইতে সোনারগাঁও ॥

২
নৌকা বাইও সাবধান হইয়া রে মাঝি ভাই
বাইও সাবধান হইয়া
আল্লা নবির নাম রে মাঝি ভাই স্মরণ রাখিয়া ॥
তিন তক্তারই নৌকা রে মাঝি ভাই মধ্যে মধ্যে গোড়া
বিপাকে পড়িলে রে মাঝি ভাই নৌকা যাবে মারা ॥
বাতাসে চালায় রে নৌকা আজবও গঠন
গলইয়ে ভরিয়া রে দিছে অমূল্য রতন ॥
শরিয়তের পাইক রে মাঝি ভাই মারিফতের নাও
মায়া নদীর বাঁকে রে নৌকা উজান বাইয়া যাও ॥
গাব-কালি লাগাইয়া রে নৌকা যত্ন করে বাও
নোনা জলে লাগাইয়া রে তক্তা ভাঙিয়া পড়ে নাও ॥
নায়ের মাঝে আছেন রে মাঝি ভাই নায়ের মহাজন
এ করিম কয় না চিনিলে বিফলও জীবন ॥

৩
কোন মেস্তরি নাও বানাইল কেমন দেখা যায়
ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূরপঙ্খি নায় ॥
চন্দ্র সূর্য বান্ধা রাখছে নায়েরই আগায়
দুরবিনে দেখিয়া পথ মাঝি-মাল্লায় বায় ॥
রঙ-বেরঙের কত নৌকা ভবের তলায় আয়
রঙবেরঙের সারি গাইয়া ভাটি বাইয়া যায় ॥
হারা-জিতার ছুবের বেলা কার পানে কে চায়
মদন মাঝি বড় পাজি কত নাও ডুবায় ॥
বাউল আবদুল করিম বলে বুঝে উঠা দায়
কোথা হতে আসে নৌকা কোথায় চলে যায় ॥

৪
নাও যেন গাঙে ডোবে না
ওরে মাঝি খবরদার
খবরদার হুঁশিয়ার
আছে ছয় ডাকাইতের অত্যাচার ॥
এই ভবের বাজারে আইলায়
হয়ে দোকানদার

www.pathagar.com

কেউ হাসে কেউ কাঁদে
পাগলের বাজার রে ॥
নাম সম্বলে বাও রে তরী
থেকে হুঁশিয়ার
দিন যাইতেছে সামনে আছে
বিষম অন্ধকার রে ॥
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
দেয়ায় মারল ডাক
মধ্য গাঙে গিয়া মাঝির
নৌকায় মারল পাক রে ॥
সামিউন বাসির আল্লা
সব দেখে সব শোনে
যারে করিবে পার
মনে মনে জানে রে ॥
নৌকায় বসে আবদুল করিম
ভাবে মনে মনে
অকূল নদীর কূল কিনারা
পাব কত দিনে রে ॥

৫
নাও বাইও তুমি দাও বৈঠা দিয়া।
সাবধানে বাইও নাও রঙিল পাল উড়াইয়া ॥
মহাজনে বানাইলায় নাও তিনটি তক্তা দিয়া
আগায় মাথায় ছয়জন দাড়ি টানে হেলিয়া দুলিয়া
নাও বানাইয়া তুমি দাড় বৈঠা দিয়া ॥
বাইও বাইও বাইওরে নাও নদীর কিনারা ভিড়াইয়া
মুর্শিদ নামে সারি গাইয়া যাইও দুরবিনে দেখিয়া
নাও বাইওরে তুমি দাড় বৈঠা দিয়া ॥
মুর্শিদ যার ভববাজারে আছে নায়ের কাণ্ডারিয়া
অনায়াসে পার হইয়া যায় ভবনদী দিয়া
নাও বাইওরে তুমি দাড় বৈঠা দিয়া ॥
এ আলম শাহ ঠেকল ভবে সঙ্গী ছয়জন লইয়া
মুর্শিদ পুরের ঘাটে যাব কান্দি পারঘাটায় বইয়া
নাও বাইওরে তুমি দাড় বৈঠা দিয়া ॥

৬
পাক পানি চিনিয়া নাও বাইও রে
ওরে আমার আউশের নাইয়া

www.pathagar.com

ও মন মাঝিরে পাক পানি চিনিয়া নাও বাইও ॥
ডাইনে সালামত উলা বায়ে সফর আলী
মাঝখানে করতালের জোড়া পাইকে লয় ধামালীরে ॥
আরি কোণায় সাঝ কইরাছে, ইশান কোণে বাইও
শরিয়তপুরের লম্বা বাঁকে নাওখানি দৌড়াইও রে ॥
সৈয়দ শাহনূরে কইন চাড়াল পাড়া বইয়া
সুন্দরের লাগিয়া বউয়ের নাইওর করলা মানারে ॥

শ্রাবণ মাসের শেষ দিন হাওরের হিন্দু ধর্মালম্বী অনুসারী প্রতিটি গ্রামের প্রায় বাসিন্দারা সর্পের দেবীখ্যাত মনসা পূজার আয়োজন করে থাকে। এর পরের দিন গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদী কিংবা হাওরের পানি নৌকায় করে দেবী বিসর্জনের পর্ব আয়োজন করা হয়। বিসর্জন শেষে নৌকা নিয়ে গ্রামীণ মানুষেরা নৌকাবাইচ করে থাকেন। এ বাইচ শেষে আরো এক ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এটি প্রচলিতভাবে কোনো ধরনের বাইচের প্রতিযোগিতা নয়, এসব বাইচের নৌকারা গ্রামের ধনাঢ্য বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে গাছের নারকেল প্রার্থনা করে থাকে। এ সময় নৌকায় অবস্থানকারীদের '...বাড়ির...বাবু নারকেল করলেন দান, তার গুণের সীমা নাই' জাতীয় স্তুতিসূচক বাক্য গানের তালে তালে উপস্থাপন করে অন্য বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। কার আগে কোন নৌকার দলটি গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে নারকেল চেয়ে নেবেন সে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠা হয়। এভাবেই শেষ হয় মনসা পূজার নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। নৌকাবাইচের গানগুলোকে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে 'হাইড়গান' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন 'জলনির্ভর লোকঐতিহ্য ও হাইড়গান' শীর্ষক এক লেখায় নৌকাবাইচের নিম্নরূপ গানটি উল্লেখ করেছিলেন :

১

বন্দনা : প্রথমে বন্দনা করি আল্লানবীর নাম
তারপর স্মরণ করি খোয়াজ খিজির।
তারপরে স্মরণ করি গঙ্গাদেবীর।

দিক বন্দনা : পুবেতে বন্দনা করি পুবে ভানুশ্বর
পশ্চিমে বন্দনা যেথায় কাবাঘর
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
দক্ষিণে বন্দনা করি কালীদহ সাগর
সেথায় বাণিজ্য করত চান্দ সদাগর ॥

পাইকস্তুতি : সাবধানে থাকিও পাইক আছো যতগণ
বিপদে আসিলে কইরো মুর্শিদরে স্মরণ
জলে আছে জলকুম্ভির জিতা ধরে খায়
ইশারা বুঝিয়া বাইও দৌড়ের রণতলায় ॥

জলস্তুতি : জলদেবী গঙ্গা, জলপির খোয়াজখিজির
জল গুণে বেঁচে আছে তাবৎ পৃথিবী
জন্ম থেকে লয় জল ছাড়া নয়
জলই আদ্য শক্তি আদিসৃষ্টির পরিচয় ॥

www.pathagar.com

৪. ষোলোঘুঁটি খেলা

ষোলোটি ঘুঁটি দিয়ে খেলা হয় বলে এ খেলাকে ষোলোঘুঁটি খেলা বলা হয়। প্রতিযোগিতায় দুইজন অংশ নেন। আগেকার দিনে মাটিতে লোহা কিংবা চিকন কাঠি দিয়ে ষোলোঘুঁটি খেলার ঘর তৈরি করা হতো। এখন অবশ্য অনেকে কাগজে এ ঘর এঁকে থাকেন। ঘুঁটি হিসেবে ইটের ছোট সুরকি, ছোট পাথর, তেঁতুলের বিচি, শিম বিচি, কাঁঠাল বিচি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। ঘুঁটি মেরে সামনে এগিয়ে প্রতিপক্ষ প্রতিযোগির ঘুঁটি শূন্য করে দিতে পারলে অথবা তাঁর ঘুঁটি চালানোর পথ রুদ্ধ করে দিতে পারলেই খেলায় জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। সুনামগঞ্জের গ্রামে-গঞ্জে এখনও অবসর সময়ে মানুষ ষোলোঘুঁটি খেলে থাকেন।

৫. বউছি খেলা

দুই দলে বিভক্ত হয়ে বউছি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে উভয়েই এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দল নির্বাচনও একটি সুন্দর পন্থায় গঠন করা হয়। জোড়সংখ্যক মানুষ ছাড়া এ খেলা সম্ভব নয়। যতজন খেলায় অংশ নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে, ততজনকে দুইজন দুইজন করে ডাকে অংশ নিতে হয়। আগেই দুই দলের দুইজন প্রধান নির্ধারণ করা হয়। পরে ডাকে অংশ নেওয়া দুইজন ওই দুই প্রধানের সামনে এসে দাঁড়ান। এর আগে ডাকে অংশ নেওয়া দুইজন নিজেরা নিজেদের অন্য দুইটি নাম নির্ধারণ করে আসেন। দলের প্রধানদের সামনে দাঁড়িয়ে তারা বলে, 'ডাক ডাক বেলি'। তখন দুই প্রধান উত্তর দেয়, 'আমরা সবাই খেলি'। এরপর ডাকে অংশগ্রহণকারী দুইজন বলে, 'তোমার অমুক না তমুক?' অর্থাৎ ওরা যে দুইটি নাম আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে, সে দুইটি নাম বলে। তখন নাম শুনে প্রধানদের একজন যে নামের লোকটিকে নিতে ইচ্ছুক সেটির কথা বলেন। এভাবেই প্রত্যেকজন ডাকে অংশ নিয়ে প্রধানদের সামনে দাঁড়িয়ে অনুরূপ কার্য করেন। এভাবেই দুইটি দল তৈরি হয়। পরে দল দুটি মূল বউছি খেলায় অংশ নেয়। বউছি খেলায় মাঠের দুই প্রান্তে দুইটি দল দাঁড়িয়ে থাকে। এক প্রান্তে বিপক্ষ দলের একজনকে 'বউ' বানিয়ে বসিয়ে রাখা হয় এবং তাকে ঘিরে অপর দলের সদস্যরা ঘিরে থাকেন। বিপক্ষ দলের একজন ডাক দিয়ে বউকে মুক্ত করার জন্য যায়। এ সময় সে অপর দলটির সদস্যদের ছুঁয়ার চেষ্টা করে। কাউকে ছুঁয়ে ফেললেই তাকে 'আউট' বলে গণ্য করা হয়। যে ছুঁতে যাবে তাকে সার্বক্ষণিক একটি ছড়াজাতীয় ডাক শব্দ করে আওড়িয়ে যেতে হয়। সেই আওড়ানো বন্ধ হয়ে গেলে তাকে যদি অপর দলটির সদস্যরা উল্টো ছুঁয়ে ফেলতে পারে তবে সেও 'আউট' হয়ে যায়। এভাবেই 'বউ'-কে বিপক্ষ দলটির কাছ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারলেই খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা হয়।

৬. ষাঁড়ের লড়াই

ষাঁড়ের লড়াই গ্রামীণ সৌখিন মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন মহাজনের ষাঁড়ের লড়াইয়ে বিজয়ী ষাঁড়ের মালিককে ওই বছরের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। আবহমানকাল ধরে এ খেলা সুনামগঞ্জে চলে আসছে। সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, শাল্লা, দিরাই, ধরমপাশা, জগন্নাথপুরসহ বিভিন্ন উপজেলায় প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে আশপাশের গ্রামের মানুষেরা এ লড়াই দেখতে হাজির হন।

www.pathagar.com

ষাঁড়ের লড়াই

আগে বিজয়ী ষাঁড়ের মালিককে সাদাকালো টেলিভিশন, রেডিও, সিলসহ নানা পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সময়ের পরিবর্তনে এখন রঙিন টেলিভিশন, এমপিথ্রি, ভিসিডি প্লেয়ার, মোবাইল ফোনসেটসহ অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সাধারণত বৈশাখ, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন বেশি চোখে পড়ে। হাওরের খোলা মাঠে এ খেলার উপযোগী স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আগে টিন বা ঢোল বাজিয়ে ষাঁড়ের লড়াই প্রতিযোগিতায় নাম নিবন্ধনের জন্য ষাঁড়ের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সৌখিন মালিকদের বার্তা পাঠানো হতো। এখন অবশ্য পোস্টার সাঁটিয়ে, লিফলেট দিয়ে কিংবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এ দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হয়।

বড় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আয়োজকেরা ষাঁড়ের মালিকদের কাছ থেকে অগ্রিম ফি নিতেন। যেদিন লড়াই হতো এর আগের ষাঁড়ের মালিকেরা আয়োজনস্থলে পৌঁছতেন কিংবা প্রতিযোগিতার দিন খুব ভোরে বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছতেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ষাঁড়ের গলায় রঙিন কাগজের তৈরি মালা দিয়ে, শিং কিংবা ষাঁড়ের শরীর রং করিয়ে উৎসবস্থলে নিয়ে আসা হতো। ঢাক-ঢোলসহ নানা বাদ্য বাজিয়ে উৎসবস্থলটিকে প্রকৃতই উৎসবমুখর করে তোলা হতো। তবে অনেকসময় ষাঁড়ের লড়াইকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ থেকে খুনাখুনি পর্যন্ত গড়ানোর উদাহরণও রয়েছে। এসব সত্ত্বেও ষাঁড়ের লড়াই প্রতিযোগিতাটি গ্রামীণ মানুষের কাছে অন্যতম বিনোদনের লোকক্রীড়া হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে যুগের পর যুগ ধরে।

৭. পলো বাওয়া

পলো বাওয়া খেলা হাওরাঞ্চলে একটি জনপ্রিয় খেলা। সাধারণত কিশোর-যুবক-অর্ধ বয়স্ক পুরুষ এ খেলায় অংশ নেন। চৈত্র মাসে যখন খাল-বিল-হাওরের পানি প্রায় শুকিয়ে আসে তখন সৌখিন মানুষেরা মাছ শিকারের জন্য নামেন।

www.pathagar.com

পলো বাওয়া উৎসব

গ্রাম এবং আশপাশের কয়েক গ্রামের মানুষ দলবদ্ধভাবে উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে মাছ শিকারে অংশ নেন। প্রত্যেকের হাতেই মাছ শিকারের জন্য থাকে বাঁশের নির্মিত 'পলো' জাতীয় এক ধরনের লোকপ্রযুক্তি। সেই 'পলো' বিল-খাল-হাওরের পানিতে ঝপাৎ ঝপাৎ করে ফেলে মাছ শিকারে মত্ত হয়ে পড়েন শিকারীরা। এভাবে নির্দিষ্ট সময় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মাছ শিকার শেষে সকলে বাড়ি ফেরেন।

৮. কুস্তিখেইড়

পৌরুষদীপ্ত খেলা হচ্ছে কুস্তিখেইড়। শারীরিক শক্তিনির্ভর এ খেলা হাওরাঞ্চলের এক জনপ্রিয় খেলা। বিভিন্ন গ্রামের আয়োজনে ঘটা করে এসব খেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় কুস্তিখেইড় খেলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রায়শই এ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে কুস্তিখেইড় খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আশপাশের গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উপজেলা থেকে মানুষজন এ আয়োজন দেখতে ছুটে আসেন। বৈশাখ মাসের প্রথম কিংবা চৈত্র মাসের শেষে এ খেলা আয়োজনের ধুম পড়ে। ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে নানা গ্রামের মানুষ তাঁদের সমর্থিত কুস্তিগীরদের নিয়ে ময়দানে আসেন। এ খেলায় নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করে যে কুস্তিগীর বিজয়ী নির্বাচিত হন, তাঁকে সে বছরের জন্য 'মাল' পদবি দেওয়া হয়। অতীতে হাওরাঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত উচ্চবর্গের মানুষের বাড়িতে ঝগড়া-ফ্যাসাদ মোকাবেলার জন্য নির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে বেশসংখ্যক কুস্তিগীরকে পোষা হতো।

৯. পাখি শিকার খেলা

সুনামগঞ্জ অঞ্চলে পাখি শিকার খেলা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। আগে হাওরের মাঠে-ময়দানে অসংখ্য পাখি থাকায় এ শিকার খুব ঘটা করে করতেন গ্রামীণ মানুষেরা। এখন সে

www.pathagar.com

পরিমাণ পাখি না থাকলেও কিছু কিছু সৌখিন শিকারীরা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পাখি শিকারে বেরোন। কয়েকজন মানুষ দলবদ্ধভাবে হাওরের বনাঞ্চলে পাখি শিকারে যান। নানা ধরনের লোকপ্রযুক্তির সাহায্যে বনে কিংবা বিলে-হাওরে ফাঁদ পেতে দূরে চুপিসারে শিকারীরা বসে থাকেন। ফাঁদে পাখি আটকা পড়লেই তবে সেখানে গিয়ে পাখিকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করে খাঁচায় পুরেন। পাখির মাংস খাওয়ার জন্য কিংবা পোষার জন্য শিকারীরা পাখি শিকারে যান।

সুনামগঞ্জের শাল্লা, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর ও ধরমপাশা উপজেলায় এখনো অনেক পেশাদার কোড়া পাখি শিকারীদের দেখা যায়। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার লক্ষণছিরী গ্রামের প্রখ্যাত জমিদার বাউলসাধক হাসন রাজার কোড়া শিকারের শখের কথা সর্বজনবিদিত। এ ঐতিহ্য এখনো এ অঞ্চলের কোড়া শিকারীদের মধ্যে প্রবণতা দেখা যায়। কোড়া শিকারীরা হাওরের বনে গিয়ে একটি পুরুষ কোড়াকে খাঁচায় রেখে বন্য কোড়া ধরার ফাঁদ তৈরি করেন। খাঁচায় আবদ্ধ পুরুষ কোড়াটির ডাক শুনে বন্য কোড়ার তার কাছে এসে জালে আটকা পড়ে। এভাবেই হাওর এলাকায় প্রতি বছর বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে অসংখ্য বন্য কোড়া শিকারীদের হাতে ধরা পড়ছে।

১০. গাছ-ছোঁয়া খেলা

সুনামগঞ্জের কিশোরদের মধ্যে গাছ-ছোঁয়া খেলার প্রচলন বেশি। পাঁচ থেকে দশ জনের মতো এ খেলায় সচরাচর অংশ নিয়ে থাকে। তবে এর কমবেশিও হতে পারে। দুই দলে বিভক্ত হয়ে এ খেলা খেলতে হয়। একদল গাছের উপরে এবং অপর দল গাছের নীচে অবস্থান নেয়। এরপর নীচে থাকা দলটি ওপরের দলটিকে প্রশ্ন করে 'ডাঙ ডাঙ গাছে কেনে?'। গাছে থাকা দলটি উত্তর দেয়, 'বাঘের ডরে'। তখন নীচের দলটি পাল্টা প্রশ্ন করে 'বাঘ কই?' পুনরায় ওপরের দলটি বলে, 'গাছের তলে।' নীচের দলটি প্রশ্ন ছুঁড়ে, 'আমারে একটা বাঘ দিবেনি?' তখন গাছে থাকা দলটি বলে, 'ছইতে পারলে নেইগ্যা'। এরপর খেলা শুরু হয়। নীচের দলটির একজন উপরে থাকা দলটির যেকোনো সদস্যকে ছুঁয়ার চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে উপরে থাকা দলটির যেকোনো একজন সেই ছুঁয়া কাটিয়ে মাটিতে নামার চেষ্টা চালায়। যদি কোনো সদস্য ছুঁয়া ছাড়াই মাটিতে নামতে পারে তবে তাদের সে খেলায় বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অনুরূপভাবে যদি নীচে থাকা দলটি ওপরে অবস্থানকারী যে কাউকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে তবে নীচের দলটি বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

১১. কুতকুত খেলা

কুতকুত খেলা সুনামগঞ্জের কিশোরীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি লোকক্রীড়া। এটিকে 'কিতকিত' খেলা নামেও অভিহিত করা হয়। উঠোনের উপর লোহার কঞ্চি অথবা লাঠি দিয়ে দাগ কেটে কয়েকটি কোঠা তৈরি করে ঘর বানানো হয়। এরপর মাটির ভাঙা কলসের টুকরোকে ঘুঁটি বানিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে খেলা শুরু হয়। দলবদ্ধ খেলা হলেও এখানে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে। এক পায়ের উপর ভর করে ঘুঁটিকে সর্বপ্রথম শুরুর ঘরটিতে ফেলে সেটিকে মেঝেতে রাখা ডান পায়ের বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে অপর কোঠায় নিয়ে যেতে হয়। তবে ঘুঁটিটিকে অপর কোঠায় নেওয়ার সময় টানা 'কুতকুত' বলে শব্দ করতে হয়। 'কুতকুত' বলা থেমে গেলে কিংবা

www.pathagar.com

অপর বাম পাটি যদি মাটিতে লেগে যায় তাহলে ওই প্রতিযোগীকে 'আউট' ঘোষণা করা হয়। এরপর একই দলের অপর প্রতিযোগী এসে পুনরায় ঘুঁটিটিকে অপর কোঠায় অনুরূপভাবে নিয়ে যেতে থাকে। এভাবেই এক দলের পর অপর দলের খেলা চলে। এ খেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলার কারণে কিশোরীদের শারীরিক ব্যায়ামও হয়ে থাকে।

১২. কানামাছি খেলা

হাওরের কিশোর-কিশোরীদের অন্যতম প্রিয় খেলা হচ্ছে কানামাছি খেলা। বিশেষ করে কিশোরীদের কাছে এ খেলার জনপ্রিয়তা খুবই বেশি। বাড়ির উঠোন কিংবা গ্রামের পাশের খোলা মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দলে বিভক্ত হয়ে কানামাছি খেলা হয়। খেলার শুরুতে একজনের দুই চোখে কাপড় বেঁধে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। চোখ বেঁধে দেওয়া হয় বলে তাকে 'কানা' নামে অভিহিত করা হয়। কাপড় বাঁধা কানারূপী ওই কিশোর/কিশোরীর দায়িত্ব হচ্ছে অন্য আরেকজনকে ছুঁয়ে তার নাম সঠিকভাবে বলা। এটা করতে পারলেই পরবর্তীতে ছুঁয়ে ফেলা কিশোর/কিশোরীকে অনুরূপ কাপড় বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবেই খেলা চলতে থাকে। তবে খেলা চলাকালীন কিশোর-কিশোরীদের একটি ছড়া সার্বক্ষণিক আওড়াতে শোনা যায়। এটি হচ্ছে–'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ'। এ ছড়া আওড়াতে আওড়াতে খেলায় অংশগ্রহণকারীরা 'কানা'কে শরীরে ধাক্কা দেয় অথবা উত্যক্ত করে।

১৩. ফুটবল

গ্রামবাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী খেলা ফুটবল। বিদেশি খেলা হলেও এটি এমনভাবে গ্রামাঞ্চলে মিশে পড়েছে যে, এ খেলা এখন গ্রামীণ ঐতিহ্যেই রূপান্তর হয়ে গেছে। সুনামগঞ্জেও অনুরূপভাবে খেলাটি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। জেলার এমন কোনো উপজেলা কিংবা গ্রাম নেই যেখানে ফুটবল দল নেই। ছোট-বড় প্রায় সববয়সী পুরুষেরাই ফুটবল খেলায় অংশ নেন। শুকনো মৌসুমে অবসর সময়ে কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে হাওরে বর্ষার পানি আসার আগে ফুটবল খেলার ধুম পড়ে যায়। এ সময় এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রাম কিংবা এক উপজেলার সঙ্গে আরেক উপজেলার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়।

সুনামগঞ্জে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার বেশ রেওয়াজ রয়েছে। এসব প্রতিযোগিতায় অবস্থান ভেদে টেলিভিশন, খাসি, ভিডিও প্লেয়ার, মোবাইল ফোন সেট উপহার হিসেবে রাখা হয়। আগেকার দিনে ছোট-বড়-মাঝারি নানা সাইজের 'সিল' পুরস্কার হিসেবে রাখা হতো। অনেকক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক এ ফুটবল লড়াইকে গ্রামের মাতব্বর এবং সৌখিনদাররা ইজ্জতের লড়াই বলে বিবেচনা করে থাকেন। তাই নানা সময়ে অন্য জায়গা থেকে প্রয়োজনে টাকার বিনিময়ে ভালো খেলোয়াড় বর্গা এনে নিজ দলের পক্ষে খেলাতেন। এমন ঘটনা অহরহ ঘটেছে–এক হাজার টাকা মূল্যমান পুরস্কারের জন্য গ্রামের ফুটবল দলের পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করার উদাহরণও রয়েছে। ফুটবল খেলায় বিজয়ী হয়ে যে গ্রামে যতবেশি 'সিল' উপহার বাবদ গিয়েছে, সেটা ওই গ্রামের গর্ব ও ঐতিহ্যের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

লোক পেশাজীবী

সুনামগঞ্জে বহুকাল ধরে নানা ধর্ম-জাতির মানুষ বসবাস করে আসছেন। হাওরাঞ্চল হওয়ায় এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। তবে এর বাইরেও নানা পেশার মানুষ এ অঞ্চলে সহাবস্থানে বসবাস করে আসছেন। লোক পেশাজীবীদের মধ্যে জেলে সম্প্রদায়ের আধিক্যই এখানে বেশি। এর বাইরে নানা ধরনের কারিগর শ্রেণির লোকজনও রয়েছে। যেমন–কামার, কুমার, মুচি/চামার/ঋষি, হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছে। তবে বিস্ময়কর বিষয় হলো সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লা উপজেলার পাঁচটি গ্রামের অধিকাংশ মানুষ স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশসহ এলাকার মানুষের কাছে পেশাদার চোর হিসেবে স্বীকৃত। গত কয়েক দশক আগেও ভোটার তালিকায় তাঁদের পেশা চৌর্যবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ ছিল।

১. কামার

গবেষকদের ধারণা, কৃষিকাজ শুরু হওয়ার কিছুদিনের ব্যবধানে কামার পেশার উৎপত্তি হয়। অতীতে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কামার সম্প্রদায়ের লোকেরা থাকলেও কয়েক দশক আগে থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই এ পেশায় এসেছেন। যাইহোক, কৃষি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ফসল রোপনের জন্য নানা ধরনের জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়তে থাকে। এ বিষয়টি প্রতি খেয়াল রেখেই একশ্রেণির মানুষের নতুন পেশার উদ্ভব ঘটে। তারা দা, কুড়াল, লাঙলের ফাল, কাস্তে, ছেনি, নিড়ানি, খুন্তি, শাফল, গরুর গাড়ির চাকার বেড়, হাতুড়ি, বাটালসহ লৌহ নির্মিত নানা জিনিসপত্রাদি তৈরি করতে থাকে। লোহা দিয়ে এসব সামগ্রী প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়ের লোকেরা কামার এবং কর্মকার হিসেবে পরিচিতি পায়। এসব কর্মকারেরা যে কেবল কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করেন তা নয়, বরং গৃহস্থলি কাজে ব্যবহৃত নানা লৌহসরঞ্জাম এবং হাতিয়ারের কাজে ব্যবহৃত নানা সরঞ্জামও তৈরি করে থাকেন। কৃষি অর্থনীতি এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অত্যাবশক এসব সামগ্রীর প্রয়োজনীতা সাধারণ মানুষের কাছে প্রবল থাকায় এ শ্রেণির পেশাজীবীদের আলাদা কদর রয়েছে।

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার প্রায় গ্রামে কামারপাড়া বলে কিছু মহল্লা রয়েছে। সে মহল্লায় কামার শ্রেণিভুক্ত পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করে থাকেন। সময়ের ব্যবধানে এ পেশাজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন বংশপরম্মরায় চলে আসা নিজ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় মনোনিবেশ করলেও তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনো কামারপাড়ায় গরম লোহা পেটানোর টুংটাং শব্দ কানে বাজে। কামারেরা সরঞ্জাম প্রস্তুতে লোহা পোড়ানোর জন্য কয়লা ব্যবহারের করেন। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে কামারেরা কাঠ-কয়লা কিনে থাকেন। কামারদের প্রস্তুতকৃত লৌহ সরঞ্জাম শ্রেণিভেদে ৩০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

কামারেরা কৃষিকাজ ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত লোহাজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরির পাশাপাশি নানা কাজে ব্যবহৃত বটি, পেরেক, চাকু, ছুড়ি, চিমটি, হাতা, কোঁচ, জুইতা, ছেনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম অনুসারী কর্মকার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাদ্রমাসের শেষ দিনটিতে বিশ্বকর্মা পূজা করে থাকেন।

২. কুমার

আবহমানকাল ধরে হাওরাঞ্চলে কুমার সম্প্রদায়ের সৃষ্টিশৈলীর বিচরণ বাংলার ঐতিহ্যকে ধারণ করে রেখেছে। কুমারদের তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, সরা, লক্ষ্মীসরা, কলসি, ডাবর, মটকা, পাতিলসহ মাটির তৈরি নানা খেলনাসামগ্রী উল্লেখযোগ্য। মাটি দিয়ে নির্মিত এসব গ্রামীণ সামগ্রীর চাহিদা বিশেষ দিনগুলোতে বর্তমানে শহরেও তৈরি হয়েছে। সুনামগঞ্জের প্রায় সবকটি উপজেলায় বংশ পরম্পরায় কুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এ পেশায় নিজেদের জীবিকা চালিয়ে আসছেন।

কুমারেরা মাটি দিয়ে তাদের সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। তাই মাটি সংগ্রহ থেকে শুরু করে তৈরি করা জিনিস পুড়ানোর কাজে ব্যবহৃত পুইন-এর (এক ধরনের চুল্লি বিশেষ) প্রয়োজন পড়ে কুমারদের। গ্রামীণ পর্যায়ে অতীতে মাটির সামগ্রীর ওপর মানুষের ব্যাপক নির্ভরতা থাকায় এসব সামগ্রীর ভালোই প্রচলন ছিল। তবে অতীতের সেই উজ্জ্বলতা এখন রং হারিয়েছে। কেবল পহেলা বৈশাখের সময় এ ধরনের মাটির সামগ্রী পাইকেরা কিনতে গ্রাম পর্যায়ে ছুটে আসেন। এ সময় কিছুটা মাটির সামগ্রীর ব্যবসা হয়ে থাকে বলে অধিকাংশ কুমারেরা জানিয়েছেন। তবে কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সে-রকম আর্থিক লাভ না-থাকায় এ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধীরে ধীরে এ পেশা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

৩. মেস্তর

ঘর নির্মাণ কিংবা কাঠ দিয়ে মানুষের জীবনযাপনে ব্যবহৃত নানা সামগ্রী তৈরি করার কারিগরদের মেস্তর বলা হয়ে থাকে। এদের কাঠমিস্ত্রি কিংবা ছুতার নামেও অভিহিত করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায় অনুসারী এ পেশার লোকেরা নামের শেষে সূত্রধর পদবি ব্যবহার করে থাকেন। তবে বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ কাঠমিস্ত্রি পেশায় এসেছেন। ঘর তৈরি থেকে শুরু করে আসবাবপত্র নির্মাণে কাঠমিস্ত্রিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাট, পালং, সিন্দুক, পিঁড়ি, জলচৌকি প্রভৃতি তৈরিতে নানা রকমের কাঠে কারুকাজ করা নানা রকমের নকশার ব্যবহার করে থাকেন মিস্ত্রীরা।

ছুতাররা নৌকাও তৈরি করে থাকেন। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে সুনামগঞ্জে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে নৌকার ব্যবহার বেড়ে যায়। তাই বর্ষা শুরুর আগে সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে নৌকা তৈরির ধুম পড়ে।

৪. মুচি

মুচি পাড়া অথবা ঋষি পাড়া নামে বিভিন্ন গ্রামের পাশে কিছুসংখ্যক বাসিন্দাদের দেখা যায়। সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় এ ধরনের গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এরা সাধারণত স্থানীয় হাটবাজারে জুতা সেলাইয়ের কাজ করে থাকেন। এর বাইরে বিয়ে কিংবা উৎসব-পার্বণে টাকার বিনিময়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কারণে এদের 'নাগারসি' নামেও ডাকা হয়। আবার ঈদ-পূজাসহ বিভিন্ন উৎসবে গরু, খাসি, পাঠা বলি অথবা জবাই করা হলেও চামড়া খসানোর জন্য এদের ডাক পড়ে। ওরা এই চামড়া নিয়ে আসার বিনিময়ে পশুর চামড়া খসিয়ে দেন। কেউ কেউ এ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের 'চামার' নামে ডেকে থাকেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এ পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

৫. চোর

সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লা উপজেলার ছয়টি গ্রামের বেশসংখ্যক বাসিন্দারা বংশানুক্রমে চুরি পেশার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। যদিও গ্রামের সবাই চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত নয়, এরপরও অধিকাংশ মানুষ চুরির সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে জড়িত থাকার কারণে এ পেশাটি একটি লোকপেশা হিসেবে সুনামগঞ্জে পরিগণিত হয়ে আসছে। দিরাই উপজেলার জাহানপুর গ্রাম এ-রকমই একটি গ্রাম। এ গ্রামের প্রায় মানুষ চুরি পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে এ গ্রামের চৌর্যবৃত্তিতে জড়িত বাসিন্দাদের মূল জীবনধারায় ফিরেয়ে আনতে 'সামাজিক প্রতিবন্ধী' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

শাল্লা উপজেলার কামারগাঁও, নারকিলা (জাতগাঁও), বল্লভপুর, উজানগাঁও ও চিকাডুবি গ্রামের অধিকাংশ মানুষই চুরি পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রামের চোরেদের অঞ্চল বিশেষে চুরির সীমানা ভাগ করা ছিল। এর বাইরে গিয়ে তারা চুরি করতেন না। এমনকী চুরি করার পর একটা বিশেষ চিহ্নও রেখে যেতেন চোরেরা। সেই চিহ্ন দেখে চোরেদের সনাক্ত করা যেত। সেই সনাক্তকরণ চিহ্ন দেখেই খোয়া

www.pathagar.com

যাওয়া গরু ও জিনিসপত্র টাকার বিনিময়ে চোরেদের কাছ থেকে নিয়ে আসতে হতো। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের সামনেই এমন ব্যবস্থায় গত পাঁচ বছর আগ পর্যন্ত চুরি পেশা বিদ্যমান ছিল। তবে বর্তমানে কামারগাঁওয়ের হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার ছাড়া অন্য কেউই চুরি পেশার সঙ্গে জড়িত নন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো দেড় দশক আগেও ভোটার তালিকায় এদের অধিকাংশেরই পেশা চৌর্যবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ ছিল। গরু, স্বর্ণালঙ্কার, টিভি, কাপড়–এ ধরনের জিনিসই সাধারণত তারা চুরি করতেন। তবে শাল্লা উপজেলার প্রায় ২০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কামারগাঁও গ্রামের একটি বহুল প্রচলিত লোকশ্রুতি বিভিন্নজনের মুখে মুখে ফেরে। এটি এ-রকম : আনুমাণিক ১২৫ বছর আগে ওই গ্রামের প্রচুর সংখ্যক চোরেরা কোনো এক এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে একটি জমিদার বাড়ির ভেতরে স্থাপিত ঢেংকির ভেতরে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা পয়সা রয়েছে বলে জানতে পারেন। এটি জানতে পেরে চোরেরা সেসব পয়সা লুট করার পরিকল্পনা আঁটেন। দীর্ঘদিন ধরে পার্শ্ববর্তী একটি নদীর পাড় থেকে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে দীর্ঘ সুরঙ্গ তৈরি করে একসময় সেই ঢেংকির কাছে পৌছে সব পয়সা রাতের আঁধারে সরিয়ে নেয়। এই পয়সা ছিল নাকি প্রায় ৫০০ মণি ওজনের একটি নৌকা ভর্তি। সেই টাকা লুট করে নৌকাযোগে এলাকায় ফেরার পথে এক জেলের কাছ থেকে চোরেরা মাছ কেনেন। মাছবাবদ জেলেকে তারা অন্তত ৬০০টি সিকি প্রদান করলে জেলের সন্দেহ হয়। ওই জেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় মানুষদের জানায়। এভাবে গুঞ্জরিত হয়ে বিষয়টি থানাপুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। পরে পুলিশ এসে অনুসন্ধান করে পুরো বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত হয়ে চুরির ঘটনায় জেলেদের জেলহাজতে প্রেরণ করে। কথিত রয়েছে, ওই জেলেরা আন্দামান জেলে বন্দী ছিলেন।

৬. কলু

ঘানিগাছের মাধ্যমে সরিষা কিংবা তিলের তৈল নির্মাণকারীদের অনেকেই দরিদ্র হওয়ায় গরুর সাহায্যে ঘানিগাছ টানাতে পারেন না। এরফলে বাধ্য হয়ে নিজেরাই গরুর কাজটুকু করেন। নিজেরাই ঘানি টেনে টেনে তৈল উৎপন্ন করে থাকেন। তাই তাঁদেরকে কলু নামে চিহ্নিত করা হয়।

৭. জেলে

হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জেলেরা কৈবর্ত বা নিকারি নামে পরিচিত। উপহাসমূলক ভাবে অনেকেই আবার তাঁদের 'কইয়া' নামেও অভিহিত করে থাকেন।

অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা মাইমল নামে পরিচিত। মাছ শিকার করে বিক্রি করাই তাঁদের পেশা। মাছ বিক্রির টাকা দিয়েই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করে আসছে বংশ পরম্পরায়। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সুনামগঞ্জ অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা লেখাপড়া শেষ করে চাকুরি-বাকুরি করছেন। আবার নিম্নবিত্তের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা আগের মতো আয়-রোজগার করতে না-পেরে অন্য পেশায়ও প্রবেশ করছেন।

www.pathagar.com

জেলেরা এলাকার হাওর, খাল, বিল, নদী, নালা ইজারা নিয়ে মাছ শিকার করে থাকেন। নিজ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে এসব মাছ দেশ-বিদেশেও নিকারিদের সহযোগিতায় রপ্তানি করে থাকেন। ছোট্ট বাঁশের টুপরি, জালসহ নানা মাধ্যমে জেলেরা মাছ শিকার করে থাকেন। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ শিকার করা হয়। জেলেরা দলবদ্ধভাবে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নৌকা ও জাল নিয়ে হাওরে মাছ শিকার করতে বের হন। মাছ শিকার শেষে সেসব মাছ স্থানীয় হাটবাজারে বিক্রি করে পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। মুষ্টিমেয় জেলেরা মাছের ব্যবসা করে ধনাঢ্য হলেও অধিকাংশ জেলে 'দিন আনে দিন খায়' গোছের। এরফলে বর্ষা মৌসুমের আগে জাল অথবা নৌকা বানানোর জন্য নিজস্ব পুঁজি না-থাকায় চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ধার দিয়ে মাছ শিকারের উপকরণ ক্রয় করে থাকেন বা তৈরি করে থাকেন। তবে ধনাঢ্য জেলেরা স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় থেকে বিল, নদী ইজারা নিয়ে প্রচুরসংখ্যক মুনাফাও অর্জন করে নিচ্ছেন।

জেলেদের মাছ শিকার

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারতা প্রাচীনকালে তেমন একটা ছিল না। এমনকি সরকারি হাসপাতালগুলোও ছিল হাতের নাগালে। এর ফলে গ্রামের মানুষ অসুখ-বিসুখে পড়লে জরা-ব্যাধি ও রোগ-শোক থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় কবিরাজদের দারস্থ হতেন। নানা গাছগাছালির রস ও ছাল-বাকল ওষুধ হিসেবে কবিরাজেরা ব্যবহার করতেন। চিকিৎসার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক এসব দ্রব্য রোগ নিরাময়ে কাজেও লাগত। তাই এসব লোকচিকিৎসাই ছিল গ্রামের মানুষদের একমাত্র ভরসা। তবে এর পাশাপাশি বিভিন্ন কবিরাজ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা ব্যবসা-পাতিও করতেন। যাদু-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, টোটকার সাহায্যে তারা চিকিৎসা কার্যক্রম চালাতেন। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের এসব চিকিৎসার প্রতি ঝুঁক ছিল। বিশেষ করে ভূত তাড়ানো, জ্বিনে ধরা, মানসিক রোগী ভালো করা, বাত ব্যথাসহ নানা জটিল রোগের মুখোমুখি হয়ে গ্রামবাসী ভণ্ড কবিরাজ ও হাতুড়ে চিকিৎসকদের দারস্থ হন। তবে যুগের পর যুগ ধরে গ্রামীণ মানুষ লৌকিক এসব আচার-আচরণকে বিশ্বাস করে আসছেন। সুনামগঞ্জ জেলাও দেশের অন্যসব অঞ্চলের মতোই লোকচিকিৎসা ও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়া থেকে ব্যতিক্রম নয়। আগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে মানুষেরা এসব পদ্ধতিকে এড়িয়ে চললেও বেশকিছু রোগ নিরাময়ের জন্য গ্রামীণ মানুষ এখনো এসব পদ্ধতি গ্রহণ করে চলেছেন।

১. লোকচিকিৎসা

নারীর সন্তান হচ্ছে না, ধাতু দুর্বলতা, প্রদর রোগ, গলগণ্ড রোগ, ধ্বজভঙ্গ, বসন্ত, ঠাকরি, হামসহ নানা রোগের লোকজ চিকিৎসা সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এসব রোগের ওষুধ হিসেবে লোকচিকিৎসকেরা নানা ধরনের গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিজ-তাবিজও ব্যবহার করা হয়। কবিরাজি ও ফকিরালি নানা মাধ্যমেও লোকচিকিৎসা প্রদান করা হয়। সাধারণ দুর্বা রস, শিমুল গাছের মূল, কাঁচা দুধ, মিশ্রি, গুড়, ফরক গাছ, তুলসি পাতা, অর্জুন গাছের বাকলসহ নানা গাছের বাকল-মূল ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করে থাকেন।

কারো হাত-পা-মুখ অবশ হয়ে গেলে কিংবা বেঁকে গেলে ফকিরালি চিকিৎসা দেওয়া হয়। এসব চিকিৎসায় পান, সুপারি, চাউল, চিনি, গুড়, কাঁচা দুধ, ফুল, মোম, আগরবাতি, ঝাড়ু, খাঁটি সরিষার তেল, রসুন, তারপিন, গোলাপ জল এবং বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়ার শিকড়, পাতা ও বাকলসহ নানা দ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে।

www.pathagar.com

২. তন্ত্র-মন্ত্র

সুনামগঞ্জ জেলার গ্রামে-গঞ্জে কবিরাজ ও এক শ্রেণির সাধু-ফকির-পিরদের তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে রোগ নিরাময় প্রক্রিয়া চালাতে দেখা যায়। মন্ত্র পাঠ করে এবং কিছু লৌকিক আচরণ পালন করে এসব চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। কিছু মন্ত্র আছে যেগুলোকে বাণ বলা হয়। এসব বাণ কারো উদ্দেশ্যে যখন কোনো কবিরাজ ছাড়েন, তাহলে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় বলে গ্রামের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। সচরাচর কারো অন্যায়-অনিষ্ট চেয়ে বাণ মারা হয়ে থাকে। এছাড়া জাদুটোনার মন্ত্র আওড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ নিরসন করা যায় বলে কবিরাজেরা দাবি করে থাকেন। কোনো পুরুষ কিংবা নারী যদি তাঁর কাঙ্খিত প্রিয়তমকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকেন, তাহলেও জাদুটোনা মন্ত্র কাজ করে বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

মাছ শিকারের সময় এক ধরনের বিশেষ মন্ত্র আওড়ালে প্রচুর পরিমাণে মাছ জালে আটকা পড়ে বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। কলেরা, যক্ষা, বাতসহ নানা রোগের জন্য তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। কোনো মানুষ কোনো কারণে ভয় পেলে, তার ভয় দূর করার জন্যও মন্ত্র রয়েছে। তবে ভূত-প্রেত-জ্বিন তাড়াতেও কবিরাজেরা নানা ধরনের তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যবহার করে থাকেন। এর বাইরে বিপদে-আপদে না-পড়ার জন্যও মানুষ লোকবিশ্বাস থেকে নানা ধরনের মন্ত্র আওড়িয়ে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে।

সুনামগঞ্জ অঞ্চলে লোকচিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু মন্ত্র-তন্ত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা

কোনো মানুষকে সাপে কাটলে তার চিকিৎসা ওঝারা দিয়ে থাকেন। কেবল টাকার জন্যই নয়, অনেকে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্য থেকেও সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। তবে এ রোগের পেশাদার চিকিৎসককে ওঝা বলা হয়। এরা সাধারণত বেদে সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত। বিভিন্ন গাছের শিকড় রোগীকে খাওয়ানোর পাশাপাশি কবচ/তাবিজে এসব শিকড় ঢুকিয়ে রোগীর হাতে বেঁধে দিয়ে ওঝারা ঝাঁড়-ফুঁকের কাজ আরম্ভ করেন। রোগীর ক্ষতস্থানের উজানে শক্ত করে দড়ি কিংবা কাপড় দিয়ে বেঁধে তাকে বাড়ির উঠোনে পাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর ওঝা একটি গাছের ডাল হাতে নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রোগীর ঝাড়-ফুক থাকেন। এ সময় তারা বিভিন্ন ঝাড়ার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। কেউ কেউ সাপে কাটার মন্ত্র উচ্চারণ না-করে *পদ্মপুরাণ* পাঠও শুরু করে দেন। নীচে সাপে কাটা রোগীদের ঝাড়ার সময় ওঝাদের উচ্চারিত কয়েকটি মন্ত্র উল্লেখ করা হলো :

১

যা বিষ-বিষান্তি
মা পদ্মার কাছে যা।
ইন্না ইন্নি বিন্না বিন্নি
যারে যা বিষ-বিষান্তি।

www.pathagar.com

২
নামরে দুরন্ত বিষ জলদি নেমে যা
পায়ের উপর থেকে আসমানে উইড়্যা যা।
আল্লার দোহাই রে বিষ যারে তুই যা।
নাগমাতা পদ্মার দোহাই রে বিষ, জলদি জলদি যা।

৩
বন্দোং মনসা দেবী শিবের কুমারী
বন্দোং সাপমাতা আসো এই বাড়ি
তোমার সাপ মাগো দেখো খাইছে কারে
ভালা কইরা দৌ মাগো কইতাছি তোমারে।

৪
ধর্ম চালম কর্ম চালম
সাপের মই টক চালম
আসো আসি কমন চালম
ধর্ম চালম কর্ম চালম।

৫
পদ্মাকানী, চুতমারানী, কান্দি জারে জারে
কোন কোন নাগীনির বিষ, যায় ধীরে ধীরে রে।

৬
গোখরো, দাঁড়াইস দুধরাজ মনিরাজ
বিষহরীর আজ্ঞা, শোন তবে আজ
মনসা মার আমি ভক্ত
বিষহীন কর, এই রোগীর রক্ত।

খ. হিরালির মন্ত্র

বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন আকাশ সাজ করে মেঘ ওঠে, তখন শিলাবৃষ্টি না-হওয়ার জন্য গ্রামীণ মানুষেরা মনের বিশ্বাস থেকে এক ধরনের ছড়াজাতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তাঁদের ধারণা, এসব মন্ত্র উচ্চারণ করলে শিলাবৃষ্টি হবে না এবং শিলাবৃষ্টি থেকে তাঁদের ফসল রক্ষা পাবে। সুনামগঞ্জ জেলার প্রতিটি উপজেলায়ই এই মন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। এগুলোকে হিরালির মন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু মন্ত্র তুলে দেওয়া হলো :

১
অধরের ছানি বদরের ছানি
রাত্রি দিন আগুন আর পানি

www.pathagar.com

সিদ্দিগুরু কালি কাপুর
পিণ্ডে প্রাণে রক্ষা করে
দোহাই কামরূপ কামাক্ষার দেবীর দোহাই
দোহাই মা চণ্ডীর দোহাই।

২
গতর বান্ধি গতরবান্ধি
সিদ্ধি কালীকা চরের বর
পূণ্যে পাঞ্চ পুরানী আমার
হাওলা রক্ষা কর
ইনুমান মন্ত্রে কাচিলাম কাচ
আগুনে পানি রাইতে দিনে
কাচিলাম আগুনের পানি
ভূত-প্রেত পিশাচ
বসুমতি দুই ভাই
অরণ্যে কাচিলাম কাচ
চন্দ্র সূর্য কাচিলাম এক সুদের ভাই
সিদ্ধি কালীকা চরের বর
বসুমাতা কাচিলাম জগতের মাই
সাজিয়া আইল্যা নবদূর্গা
দেখতে লাগে ভয়
এই কাচ কাচিয়া
সাজকে দিলাম কাটিয়া
চল চল চল হাওলা রক্ষা করিয়া চল।

গ. হাড় ভাঙা ব্যথার মন্ত্র

কারো হাড় ভেঙে ব্যথা পেলে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য এক ধরনের মন্ত্র আওড়ানো হয়। সেটা কেবল যে কবিরাজরা আওড়ান, তা নয়। বরং কোনো শিশু সামান্য ব্যথা পেলেই এই নিম্নোক্ত মন্ত্রটি হাওরাঞ্চলের প্রায় সব অভিভাবকেরাই বাচ্চাদের মানসিক সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি আওড়িয়ে থাকেন। এটি নিম্নরূপ :

১
কসকা ঝাড়া মসকা ঝাড়া
বিলাই হাগে ছড়া ছড়া
কুত্তায় হাগে দই
হাড়ের যত বিষ
পদ্মার মাঙ্গে থই।

www.pathagar.com

ধাঁধা

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিতে ধাঁধা বিরাট একটি স্থান দখল করে রেখেছে। নানা আচার-অনুষ্ঠান কিংবা বর-কনে দেখার সময় ধাঁধার আসর বসা যেন একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। ধাঁধায় একদিকে যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রসবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ধাঁধাকে স্থানীয়ভাবে 'ছিলকা', 'ছিল্লক', 'শিলুক', 'হেঁয়ালি' প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ধাঁধা-চর্চা খানিকটা হ্রাস পেলেও তা মোটেই হারিয়ে যায়নি। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মুখে মুখে ধাঁধা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চর্চিত হয়ে আসছে।

সংগৃহীত ধাঁধা

১

ক কার আদি নাম তার, ক-কারে আকার
টলার মুন্ডু কাটি মধ্যে দিয়া তার
লবনের যে বস্তু হয় দেও পাঠাইয়া।
উত্তর : কাঁঠাল।

২

এক গ্লাসে দুইজাত পানি, তারে আমি মুর্শিদ মানি।
উত্তর : ডিম।

৩

জলে থাকে জলকুমারী, জলে তার বাসা
হাড্ডিও নাই, ঘুড্ডিও নাই, তার বড় গোসা।
উত্তর : জোঁক।

৪

খাইলে ফুটা, না খাইলে মোটা।
উত্তর : চুল।

৫

গলা আছে তলা নাই, পেট আছে ভর নাই।
উত্তর : ফলো।

৬

গরম দিনের বন্ধু তুমি, পরম তোমার নাম
বাতাস দিয়া শীতল করো, ভদ্রলোকের কাম।
উত্তর : পাখা।

www.pathagar.com

৭
আমার বাড়ির পিছন দিয়া হেমলতা গাছ
ফুল নাই, ফল নাই, ধরে বারো মাস।
উত্তর : পান।

৮
এত বড় টুলিটা, ভাত ধরে কুড়িটা
সর্বলোকে খাইয়া যায়, কিছু ভাত থইয়া যায়।
উত্তর : চুন।

৯
গাঙের পাড়অ ভুবি গাছ ওলঅলি করে
একটা ভুবি খাইয়া দেখো, শইলে কিতা করে।
উত্তর : তামাক পাতা।

১০
ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতরে পইড়্যা মর।
উত্তর : মশারি।

১১
সোজায় ধরে সোজারে, সোজায় ধরে বেঁকারে
বেঁকায় ধরে মরারে, মরায় ধরে জিতারে।
উত্তর : বড়শি।

১২
যত টানি বাত্তি অয়, কওছাইন তারে কিতা কয়।
উত্তর : সিগারেট।

১৩
মাটির তলে সুন্দরী, কাপড় পিন্দে নয় কুড়ি।
উত্তর : পিঁয়াজ/রসুন।

১৪
ইজলের জরি মরি, পিতলের ছানি
আজব দেশে দেইখ্যা আইলাম
গাছের আগায় পানি।
উত্তর : নারিকেল।

১৫
একছা খেড়, দুইন্ন্যাই বের।
উত্তর : দিয়াশলাইয়ের কাঠি।

www.pathagar.com

১৬
কাটলে বাঁচে, না-কাটলে মরে।
উত্তর : মানুষের নাড়ী।

১৭
এক টিপায় দুই বিচি, ভাগ্য থাকলে তিন বিচি।
উত্তর : বাদাম।

১৮
উপরে তক্তা, নীচে তক্তা
মাঝখানে নাচে কলকইল্লা দেবতা।
উত্তর : জিহ্বা।

১৯
গেছলাম অছম্বির দেশে
দেখি গাছের আগায় পানি আছে।
উত্তর : ডাব।

২০
আয়রে ভাই পাহাড়ে যাই
লেম্বুর কেন ডেটা নাই।
উত্তর : ডিম।

২১
এতকুনি গাছটা, গোটা ধরে পাঁচটা
যদি গোটা লাল অয়, হাজার টাকার মাল অয়।
উত্তর : কমলা।

২২
আমি থাকি খালে, তুমি থাকো ডালে
দেখা হবে দুজনের মরণের কালে।
উত্তর : মাছের পোনা ও কাঁচা মরিচ।

২৩
ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর : কবর।

২৪
এই ঘরের বুড়ি সেই ঘরে যায়
লোহা মুখে দিয়া খট্টার খট্টার ডাকায়।
উত্তর : ছুরতা।

www.pathagar.com

২৫
উঠানের মধ্যে বুলবুলি নাচে
ছয় কুড়ি ছিদ্র কার আছে।
উত্তর : ছাইন (চালুনি)।

২৬
আন্ধাইর ঘর বান্দর নাচে
না না করলে আরো নাচে।
উত্তর : জিহ্বা।

২৭
এণ্ডা ফুল গেণ্ডা ফুল
মালিক ছাড়া খোলা ভুল।
উত্তর : চিঠি।

২৮
আটটা ফালা ঘরটা কালা
একটা শিক ঘরটা ঠিক।
উত্তর : ছাতা।

২৯
এতবড় পোলাটা দুধ দিয়া ভাত খায়
খিড়কি দিয়া চাইয়া দেখে বাপনি আয়।
উত্তর : বাতাস।

৩০
উপর দিয়া মাথা নীচে দিয়া চুল
এই উত্তরটা দিতে না করিও ভুল।
উত্তর : পেঁয়াজ।

৩১
এই পাড়ে একটা হাতি ওই পাড়ে একটা হাতি
দুই হাতি করে লাথালাথি।
উত্তর : চোখের পাতা।

৩২
নাকটি চেপে ধরে, কানটি চেপে ধরে
জগতখানা ঘুরে বলো না সে কে রে?
উত্তর : চশমা।

৩৩
আয়রে ভাই পাড় যাই, পাড় গিয়া ঘর বানাই

www.pathagar.com

ঘর বানাইলাম কোঠা কোঠা, এগু বেতের বান নাই।
উত্তর : কুমারের ঘর।

৩৪
এত গাছে টান দিলে বেত গাছে লড়ে
কোক্কার এনডা বাইয়া বাইয়া পড়ে।
উত্তর : নলি ঘি।

৩৫
মাথায় মুকুট গোল পা, পেটের ভিতরে হাত-পা।
উত্তর : শামুক।

৩৬
থাল মাজনি থাল ঘষানি থাল নিলোগি চোরে
হৈ পাড় আগুন ধরলে কে নিভাইতে পারে।
উত্তর : সূর্য।

৩৭
দিনের বেলা লুকাইয়া থাকে রাইতে দেয় দেখা
কখনও দেখায় থালার মতো কখনো দেখায় বেঁকা।
উত্তর : চাঁদ।

৩৮
মাটির তলে বুড়ি, কাপড় পিন্দে ছয় কুড়ি।
উত্তর : পিঁয়াজ/রসুন।

৩৯
ছোট বেলায় সবুজ থাকে, বুড়া বেলায় লাল
মিঠা মুখে কয় না কথা, কথায় শুধু ঝাল।
উত্তর : মরিচ।

৪০
তোমরানি দেখছো উনি যাইতে
উবা মানুষ বইয়া নিতে।
উত্তর : জুতা।

৪১
এখান থেকে মারলাম তীর, তীরে করে বিড়বিড়।
উত্তর : পোনা।

৪২
হাত আছে পাও নাই, এর উত্তর দিতে না পারলে চণ্ডাল তর জামাই।
উত্তর : শার্ট/পাঞ্জাবি।

www.pathagar.com

৪৩
এতকুনি টুলিডায় কৈয়ে লাফালাফি করে
এমন মার পুত নাই ধইরা আনতো পারে।
উত্তর : ভাতের ফেনা।

৪৪
গেছলাম কাজে কইনা লাজে
দুই উরাতের মাঝে।
উত্তর : দা/ছুরতা।

৪৫
ঠেলা দিলে মেলে, ভিতরে গেলে আরাম পাই
এমন সহজ উত্তররে ভাই এই জগতে নাই।
উত্তর : ছাতা।

৪৬
আইলে দিয়া হাঁইট্টা যায়, পিছন দিয়া ঘাস খায়।
উত্তর : সুঁই।

৪৭
আকাশ থেকে পড়লো বুড়ি তেনাতুনি লইয়া
সেই বুড়ি কথা কয় মসজিদে গিয়া।
উত্তর : কোরান শরীফ।

৪৮
এই পাড় জাল, ওই পাড় জাল
জাল ছিড়্যা যায় গরুর পাল।
উত্তর : চোখের জল।

৪৯
আম পাতা চিরল চিরল নিম পাতা তিতা
ও ভাইজান, কওছাইন দেখি ভাবীর নাম কিতা?
উত্তর : বর্ষায় ফোটে কদম ফুল, শীতে ফুটে গাঁদা
কখনও তারে মিতা ডাকি, কখনও ডাকি রাধা।

৫০
একটি গাছের পাঁচটি ডাল তিনটি ডাল রোদে
দুইটি ডাল ছেবায়।
উত্তর : আযান/পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

৫১
সকল দেশ ঘুরি এক দেশ খাই

www.pathagar.com

এর উত্তরটা কী বলতো ভাই?
উত্তর : সন্দেশ।

৫২
ইরিতিরি বিন্না গাছ, বাড়ির বিন্না চব্বিশ হাত
উত্তর দিতে সময় দিলাম হাজার রাত।
উত্তর : সুপারি গাছ।

৫৩
এত বড় পোলাটা দুধ দিয়া খায়
বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করতে চায়।
উত্তর : কুড়াল।

৫৪
ই ঘরের বুড়ি ই ঘরে যায়, টুনুর টানুর কইরা গুয়া খায়।
উত্তর : ছরতা।

৫৫
ছোট থাকলে ঘুমটা বড় হইলে লেংটা।
উত্তর : বাঁশ।

৫৬
ঘরের ভিতরে ঘর হাত বাড়াইয়া ধর।
উত্তর : মশারি।

৫৭
লটকন থাকে, লটকন খায়, কাইটা দিলে হাইটা যায়।
উত্তর : আমের পোকা।

৫৮
থাকে তোমার ঘরে করে তোমার কাম, উঠে তোমার হাতে, মুখে তোমার মুখে।
উত্তর : গ্লাস।

৫৯
ইপার থেকে মারলাম তীর ই পারে গিয়া বিরবির।
উত্তর : পোনা মাছ।

৬০
বন থেকে বারহইল বোইতা আর পাতে দিল মুইতা।
উত্তর : লেবু।

www.pathagar.com

৬১
বনে থাকে বনকুমারী বনে তার বাসা হাড্ডি নাই গুড্ডি নাই মাংস লোথা লোথা।
উত্তর : জোঁক।

৬২
ইপারে থকতা ই পারা থকতা মাঝখানে কলকলি দেবতা।
উত্তর : জ্বিবা।

৬৩
গাছ থেকে পড়ল তাল, গেল দুই মাল দেখল জনে আনল না আনলজনে খাইলনা খাইল আরেক জনে।
উত্তর : মানুষ।

৬৪
এক মারইলে দুই চাল।
উত্তর : কলাপাতা।

৬৫
রাজার বাড়ির গুড়ি, এক বিয়ানে বুড়ি।
উত্তর : গলাগাছ।

৬৬
চলতে চলতে থেমে যায়, চাকু দিয়ে গলাকাটলে চলে বার বার।
উত্তর : কাঠপেন্সিল।

৬৭
মাটির তলে থাকে গুড়ি, কাপড় ফিনদে সাত কুড়ি।
উত্তর : রসুন-পেঁয়াজ।

৬৮
আল্লার কী কুদরত, লাঠির ভিতর শরবত।
উত্তর : কুইষর/আখ।

৬৯
বন থেকে বারাইলা ভট নীচের দিকে লাঠি মাথায় জট।
উত্তর : আনারস।

তথ্যনির্দেশ

১. ১ থেকে ২৩ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে সরদার শাহরিয়ার হাসানের কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ৪০ বছর। পিতা : ওয়ারিদুল হক সরদার, মাতা : গুলশান আরা হক, গ্রাম : সাকিতপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ; সংগ্রহের তারিখ : ০১.১২.২০১১, সময় : বিকেল ৪টা।

www.pathagar.com

২. ২৪ থেকে ৩০ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে আইভি আক্তার জাকিয়ার কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ১৯। গ্রাম : রাধানগর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ; সংগ্রহের তারিখ : ০২.১২.২০১১, সময় : বিকেল সাড়ে ৪টা।
৩. ৩১ থেকে ৩৬ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে মোছা. রোজিনা আক্তার রত্নার কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ২২। গ্রাম : নরত্তমপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ; সংগ্রহের তারিখ : ০২.১২.২০১১, সময় : রাত ৭টা।
৪. ৩৭ থেকে ৪১ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে ফৌজিয়া বেগমের কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ১৩। গ্রাম : শ্রী নারায়ণপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ; সংগ্রহের তারিখ : ০৩.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০টা।
৫. ৪২ থেকে ৫৩ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে মোছা. রেহেনা বেগমের কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ৩০। স্বামী : সরদার শাহরিয়ার হাসান, গ্রাম : সাকিতপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ; সংগ্রহের তারিখ : ০১.১২.২০১১, সময় : সন্ধ্যা ৭টা।
৬. ৫৪ থেকে ৫৬ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে শংকর রায়ের কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ৫৫। পিতার নাম : গিরিন্দ্র রায়, গ্রাম : জগন্নাথপুর, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ। সংগ্রহের তারিখ : ০৮.০১.২০১২, সময় : সকাল ১১টা।
৭. ৫৭ নম্বর থেকে ৬১ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে দেলোয়ার হোসাইনের কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ৫৫। গ্রাম : হবিবপুর, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ। সংগ্রহের তারিখ : ০৮.০১.২০১২, সময় : দুপুর ২টা।
৮. ৬২ নম্বর থেকে ৬৯ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে সাইফুর ইসলাম রিপনের কাছ থেকে। তাঁর বয়স : ৩৫। তাঁর পিতার নাম : নুরুল ইসলাম, গ্রাম : ইকড়ছই, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ। সংগ্রহের তারিখ : ০৮.০১.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় কথায়-কথায় প্রবাদ-প্রবচন আওড়ানো একটা স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সুনামগঞ্জেও অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি ধারণ করে রেখেছেন সাধারণ মানুষেরা। মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অর্থবোধক ভাবপ্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করা হয়। এ-ধরনের কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন নিম্নরূপ :

১
স্বভাব যায় না মইলে
ইজ্জত যায় না ধইলে।

২
মাঘ মাইয়া জারে
বইশের হিং লাড়ে।

৩
সুবুদ্ধি ভাই মরনে
দেশ পাইল অরানে
চুরায় গাইল নেয়
ঘন ঘন জিরানে।

৪
অভাবে স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরনে
জরায় খেত নষ্ট
স্ত্রী নষ্ট মারনে।

৫
মানুষ যত ধনী অয়
অভাব থাকে সবসময়
গাও নষ্ট বাদে
খেত নষ্ট খাদে।

৬
জাউয়ার বাজারি আউয়া
ডেফলরে কয় ডেউয়া।

www.pathagar.com

৭
নাও উঠলে মাঝি
গাও উঠলে সাজি
গদীত বইলে রায়
তালুকমীরাশ নীলাম ধইরা
দাশ চধ্‌রী ফলায়!

৮
বাপ দাদার নাম নাই
চান মড়লের বিয়াই?

৯
মাইনষের মাইঝে বাইট্যা,
কলার মাইঝে আইট্যা।

১০
হূড়ির কুড়ি বুদ্ধি নাপিতের ছয়,
আর জাতের অয় কি না অয়।

১১
ফল খাইয়া জল খায়
যমে বলে আয় আয়!

১২
আগা ভারি, পাছা টান
মারে থইয়া ঝিরে আন।

১৩
দক্ষিণ দোয়ারি ঘরের রাজা,
পূব দোয়ারি তার প্রজা;
পশ্চিম দোয়ারির মুখে ছাই,
উত্তর দোয়ারির খাজনা নাই।

১৪
বেল খাইয়া খাইল পানি,
বাতে কয় মইলাম আমি;
আম খাইয়া খাইল পানি,
বাতে বুলে জিইলাম আমি।

১৫
উঁচ কপালী হেরা দাঁতী,
পিঙ্গল মাথার কেশ;

www.pathagar.com

সেই কইন্যা বিয়া করলে,
ভরমে নানান দেশ!

১৬
নারী ভালা পোঁদলী,
ফল ভালা কদলী;
জল ভালা ভাসা,
মানু ভালা চাষা।

১৭
হাতের ফুলে কান্দায়
পায়ের ফুলে পিন্দায়।

১৮
অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে
চৈরের গুতা গালে পড়ে।

১৯
অইব পুলা ডাকব বাপ
তে যাইব মনের তাপ।

২০
অল্প বয়সে প্রেম করা
কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরা।

২১
এক দেশের বুলি
আরেক দেশের গালি।

২২
যেখানঅ বাঘের ভয়
ইখানঅ রাইত অয়।

২৩
হক্কল মাছে গু খায়
গাউরার উপর বদনাম যায়।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অতীতকাল হতে নানা ধরনের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার তাঁদের যীবনযাপনে পালিত হয়ে আসছে। গ্রামের সহজ-সরল মানুষেরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসব বিশ্বাস ও সংস্কার বংশানুক্রমে পেয়ে এসেছেন। আধুনিক সভ্যতা ও তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের পর এসব ধ্যান-ধারণা অনেকটাই লোপ পেয়েছে। এরপরও নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে গ্রামীণ মানুষজন একেবারেই যে এসব সংস্কার ও বিশ্বাস মেনে চলেন না তা কিন্তু নয়। এ ধরনের কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার নিম্নরূপ :

১. কথা বলার সময় টিকটিকি প্রাণি শব্দ করলে কথাগুলো সত্যবলে গৃহিত হয়।
২. স্বরস্বতি পূজার আগে কূল (বড়ই ফল) খেলে শিক্ষার্থীদের অমঙ্গল হয়।
৩. ডিম ও আলু খেয়ে পরীক্ষার হলে গেলে শূন্য নম্বর পাবে শিক্ষার্থীরা।
৪. আয়না ভাঙলে অমঙ্গল হয়।
৫. ছেঁড়া গামছা সেলাই করলে ওই ব্যক্তির অকল্যাণকর ঘটনা ঘটবে।
৬. শিশুদের দাঁত পড়ে গেলে কাককে লুকিয়ে টিনের চালে ফেলতে হয়।
৭. পুকে খাওয়া আম খেলে কিংবা পিঁপড়া খেলে সাঁতার শেখা সম্ভব।
৮. স্বামী বা ভাসুরের নাম স্ত্রী ব্যক্তির নিষেধ।
৯. ভরদুপুরে কিংবা রাতের বেলা তেতুল গাছের নীচে গেলে ভূত-প্রেতে আছর করে।
১০. ছেলেদের বুকে লোম থাকলে ওই ছেলে খুবই মায়াবী হয়।
১১. গর্ভবতী মেয়েদের ফড়িং মারা নিষেধ।
১২. সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকা ভালো না।
১৩. ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হবেই।
১৪. পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তাননিরোধ গুনাহ।
১৫. সূর্যগ্রহণের সময় খাওয়া ঠিক নয়।
১৬. জোড়া লাগানো কলা কিংবা যেকোনো ফল খেলে যমজ সন্তান হবে।
১৭. হ্যাঁচি দিলে মনে করতে হবে যে-কোনো পরিচিত ব্যক্তি স্মরণ করছেন।
১৮. অষ্ট ধাতুর আংটি শুভদায়ক বস্তু।
১৯. পেঁপে খেলে আয়ু বাড়ে।
২০. ভাঙা আয়নার মুখ দেখলে আয়ু কমে।
২১. দুধ খাওয়ার পর আনারস খাওয়া বারণ।
২২. ফলাহারের পর পানি খাওয়া অনুচিত।
২৩. ডান হাতের তালু চুলকালে হাতে টাকা আসে।

www.pathagar.com

২৪. নাকের ডগা ঘামলে মেয়েরা স্বামী সোহাগী হয়।
২৫. ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় ঝাড়ু দেখলে অমঙ্গল হয়।
২৬. বাড়ির গৃহস্থ বাইরে বেরোনোর সময় পানি শূন্য কলসি থাকলে অমঙ্গল হয়।
২৭. ঘরের ভেতর ছাতা মেললে অমঙ্গল হয়।
২৮. খাবারের সময় পাতে আলাদা লবন খাওয়া অনুচিত।
২৯. যে নারী সতী সে স্বামীর আগে তার মৃত্যু হয়।
৩০. ছিঁড়া গেঞ্জি গায়ে দেওয়া ভালো নয়।
৩১. মেয়েদের চুল যথাতথা ফেলতে নেই।
৩২. রাতে আয়না দেখা ভালো না।
৩৩. শিশুর যেন নজর না লাগে সেজন্য কপালে কাজলের ফোটা দিয়ে রাখতে হয়।
৩৪. পেঁচার ডাক অশুভ।
৩৫. বাম হাত চুলকালে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩৬. বালিশের উপর বসতে নেই।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে এসে বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের উন্নত তথ্য ও প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনেও এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে সহায়ক হিসেবে কাজে লাগছে। বিজ্ঞানের সাফল্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নবউদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষের সাফল্যও ত্বরান্বিত হচ্ছে। কিন্তু গ্রামীণ মানুষ কৃষি সভ্যতার সূচনা থেকেই তাঁদের জীবনযাপন এবং কাজকে সহজসাধ্য করার জন্য নানা ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। গ্রামের এসব নিরক্ষর মানুষ কেবল নিজেদের সৃজনদক্ষতায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে অনন্য সব লোকপ্রযুক্তি তৈরি করেছেন। যুগের পর যুগ ধরে সেসব প্রযুক্তি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে টিকে রয়েছে। কালের বিবর্তনে কিছু কিছু লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার কমে এলেও সেগুলো একেবারেই হারিয়ে যায়নি। বরং আধুনিককালের উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে লোকপ্রযুক্তি গ্রামীণ সমাজে ক্রিয়াশীল ভূমিকা রেখে চলেছে। কৃষিক্ষেত্রে লাঙল, লাঙলের ফাল, মই, জোয়াল, গরুর গাড়ির চাকা, উড়া, উকুল/উকুইন, ফুফা/খাফাইর, পাজুন, হাকড়া, হেঁসে; মাছ ধরার জন্য নানা ধরনের জাল, বাঁশের তৈরি বিভিন্ন লোকপ্রযুক্তি, চাঁই, কাঠা, ছিপ; মৃৎশিল্পে বিভিন্ন ধরনের হাড়ি-পাতিল-সরা, ধান ভানার জন্য ঢেঁকি, লোহা দিয়ে তৈরি জাঁতি, কোদাল, নিড়ানি, কাস্তে, দা; গৃহস্থলী কাজে ব্যবহৃত পাটা, পুথাইল, বটি, কুরানি, যাঁতা এখনো গ্রাম্য সাধারণ মানুষের কাছে বহু ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়ে রয়েছে।

জীবন-জীবিকার তাগিদে সাধারণ মানুষের উদ্ভাবিত লোকপ্রযুক্তিগুলোর ঐতিহাসিক আবেদনও নিছক কম নয়। প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহৃত এসব উপকরণ গ্রামীণ মানুষের চিরচেনা জীবনযাত্রার অংশ বিশেষ। আধুনিক সভ্যতা বিকাশের প্রবল তোড়ের মুখে লোকপরম্পরায় এসব কারিগরি প্রযুক্তি স্বমহিমায় এখনো উদ্ভাসিত। ভূমি কর্ষণ, ফসল বোনা, ঘর তৈরি, মাছ শিকার থেকে শুরু করে গ্রামীণ জীবনের প্রায় স্তরেই লোকপ্রযুক্তি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এসব সামগ্রীতে সুনামগঞ্জ জেলার কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে সব মানুষেরই অতি-নির্ভরতা রয়েছে। জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটিয়ে নির্মিত এসব লোকপ্রযুক্তির সহজলভ্যতা এখনো হাওরাঞ্চলে বিদ্যমান। সেসব কিছু লোকপ্রযুক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. কোণ

কৃষিকাজে ফসলি জমিতে নদী-খাল-বিল থেকে পানি সেঁচার জন্য এক ধরনের লোকযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন কৃষকেরা। তিণকোণা লম্বাবিশেষ কাঠ, চিকন বাঁশ ও লোহার পাত দিয়ে নির্মিত ওই লোকযন্ত্রটি 'কোণ' বা 'কুইন' নামে পরিচিত। কোণের চিকন অংশটি জমিতে থাকে এবং মোটা অংশটি পানির দিকে থাকে। পা দিয়ে মোটা

www.pathagar.com

অংশটি পানির গভীরে নামিয়ে পানি তুলে তা জমিতে চিকন অংশের দিক দিয়ে ফেলা হয়। এভাবেই জমিতে পানি সেচনের কাজ কোণের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

২. খইয়ের চালুন

খইয়ের চালুন এক ধরনের গৃহস্থলী সামগ্রী। গ্রামীণ নারীরা খই তৈরিতে এটি ব্যবহার করে থাকেন। বাঁশের তৈরি একটি খইয়ের চালুন তৈরিতে কারো কারো ১ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত সময় লাগে।

৩. হেয়্যুইত

হেয়্যুইতের মাধ্যমে পানি সেচ দেওয়া হয়। এটি জল সেচের আদি যন্ত্র। একটি সরু বাঁশের ডগায় টিন দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকৃতির একটি বস্তু বাঁধা থাকে। এটিই ইয়্যুইত নামে পরিচিত।

৪. চাঁই

বর্ষাকালে মাছ ধরার জন্য চিকন ও মিহি বাঁশের তৈরি চাঁইয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাতের বেলা হাওর-নদীনালার পানিতে চাঁই পেতে রেখে সকালবেলা তুলে এনে শিকার হওয়া মাছগুলো ধরেন।

৫. ঠুলি

ধান মাড়াই করার সময় গরু যাতে মাড়াই দিতে দিতে ধান খেতে না-পারে সেজন্য তাদের মুখে বাঁশ কিংবা বেত দিয়ে তৈরি ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সুনামগঞ্জে বোরো ধানের খেতে যখন ধান কাটার ধুম পড়ে, তখন হাওরে মাড়াইয়েরও ধুম পড়ে। সে সময়ই গরুর মুখে ঠুলি পরানো শুরু হয়।

৬. মই

কৃষিক্ষেত্রে অন্যতম দরকারী হিসেবে মইয়ের ব্যবহার সুদীর্ঘকাল ধরে হয়ে আসছে। বাঁশ দিয়ে এই মই নির্মিত হয়। ফসল রোপনের আগে মাটি মিহি করার কাজে মই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার ঘরে চালা দেওয়া কিংবা উঁচু স্থানে ওঠার ক্ষেত্রেও সুনামগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এখনো মই সুবিশেষ ঐতিহ্য নিয়ে টিকে রয়েছে।

৭. ঢেঁকি

ধান ভানার যন্ত্র হিসেবে ঢেঁকির ব্যবহার ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজে কমে আসছে। কাঠ ও লোহার কালী দিয়ে ঢেঁকি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পিঠা তৈরির জন্য চালের গুঁড়ি তৈরিতেও ঢেঁকির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

৮. হুঁক্কা

হুঁক্কার ব্যবহার সুনামগঞ্জের প্রায় বাড়িতেই দেখা যায়। গ্রামীণ জীবনে ধূমপানের ক্ষেত্রে হুঁক্কার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সিগেরেটের ব্যাপক প্রচলনের কারণে হুঁক্কার ব্যবহার কমে এলেও অনেকে এখনো হুঁক্কার মাধ্যম ছাড়া পরিপূর্ণ ধূমপানের তৃপ্তি পান না বলেই

www.pathagar.com

সে পদ্ধতি এখনো ধরে রেখেছেন। কলকে, নারকেল-খোল ও কাঠের নলের সাহায্যে হুঁক্কা তৈরি করা হয়।

৯. লাঙল

কৃষিকাজে লাঙল ছাড়া চাষাবাস কল্পনাই করতে পারেন না কৃষকেরা। গাছের কাঠ, লোহার ফাল দিয়ে লাঙল তৈরি করা হয়। কাঠমিস্ত্রি সম্প্রদায়ের লোকেরা লাঙলের নির্মাণ-শ্রমিক।

১০. জাঁতি বা ছরতা

সুপারি কাটার যন্ত্র হিসেবে জাঁতি বা ছরতার প্রচলন প্রায় এলাকায়ই রয়েছে। সুনামগঞ্জেও পানিবিলাসীদের কাছে জাঁতি বা ছরতার আবেদন অনন্য। পেশাজীবী কামার সম্প্রদায়ের লোকেরা লোহা হাপরের তৈরি কয়লার আগুনে পুড়িয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করে পাতের মতো বানিয়ে তবেই জাঁতি প্রস্তুত করে থাকেন। বাজারে নানা ধরনের জাঁতি কিনতে পাওয়া যায়। তবে সুনামগঞ্জের হাওর অধ্যুষিত বিভিন্ন মহাজনের বাড়িতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন ধরনের জাঁতির প্রচলন দেখা যায়। এটি বনেদী গৃহস্থের অন্যতম পরিচায়ক চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

১১. ঘানিগাছ

লোকজ পদ্ধতিতে সরিষা, তিল পিষে পিষে তেল বানানোর প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রটিকে ঘানি বা ঘানি গাছ বলে। লম্বাকৃতির মোটা কাঠের গাছের মূলি দিয়ে ঘানি যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বাসস্টাণ্ড সংলগ্ন এলাকায় ঘানিগাছের সাহায্যে তেল বানানোর প্রচলন রয়েছে।

১২. উছ্

সুনামগঞ্জে সৌখিন মানুষদের কাছে মাছ ধরার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে উছের মাধ্যমে মাছ শিকার। এটি দেখতে ত্রিভুজাকৃতির। বাঁশের ফলি দিয়ে ফাঁকবিশেষ পাটির মতো তৈরি করা ত্রিভুজাকৃতির উছটির পাটির কিনারায় চিকন কচি বাঁশ দিয়ে বেষ্টনী দেওয়া হয়। পাটির একদিক বেশ খানিকটা গর্তাকৃতি করে তৈরি করা হয়। এটিকে ধরে রাখার জন্য একদিকে লম্বা বাঁশের হাতলও রাখা হয়। জাল দিয়েও উছ্ তৈরি করা যায়।

১৩. বাইর

মাছ ধরার জন্য একটি লোকযন্ত্র হচ্ছে বাইর। বাঁশ ও শক্ত সুতা দিয়ে বাইর তৈরি করা হয়। পুরো বর্ষা মৌসুম জুড়ে মাছ ধরার জন্য জেলেরা সুনামগঞ্জে বাইর অধিকহারে ব্যবহার করে থাকেন। সুনামগঞ্জের শাল্লা, দিরাই, জামালগঞ্জ, ধরমপাশা, তাহিরপুর উপজেলার মৎস্যজীবীদের মধ্যে বাইরের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেছে। স্থানীয় বাজারগুলোতে হাটের দিনে বাইর বিক্রি করতেও দেখা যায়।

১৪. উইন্যা

মাছ ধরার জন্য উইন্যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরাই এসব উইন্যা প্রস্তুত করে থাকেন। তবে কোনো কোনো সৌখিন মাছ শিকারীরাও এসব

www.pathagar.com

উইন্যা নিজেরাই বানিয়ে থাকেন। বাঁশের চিকন ফলি, চিকন খাপ, তার ও বেতের পাতলা ফলি উইন্যা তৈরিতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থানীয় হাট-বাজারেও উইন্যা কিনতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত উইন্যার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। কারণ এ সময়টাতে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর-নদী-নালাগুলো বর্ষার পানিতে থইথই করে। মাছ ধরার জন্য এ মৌসুমটা উত্তম সময় হওয়ার কারণে উইন্যার ব্যবহারও সে সময় অনেকটা বেড়ে যায়।

১৫. দড়া টানা

'দড়া টানা' হচ্ছে মাছ শিকারের এক ধরনের কলাকৌশল। সুনামগঞ্জের হাওর অধ্যুষিত শাল্লা, জামালগঞ্জ, ধরমপাশা, দিরাই, তাহিরপুর, জগন্নাথপুর এসব উপজেলায় জেলে থেকে শুরু করে সৌখিন মাছ শিকারীরা 'দড়া টানা' পদ্ধতির সাহায্যে মাছ শিকার করে করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে শিকার করা মাছ দিয়ে রান্নাকৃত তরকারি অনেক সুস্বাদু হয়। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে মাছ শিকারের বিষয়টি হাওর এলাকার ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামের মানুষেরা দলবেঁধে নদীতে 'দড়া টানা' পদ্ধতিতে মাছ শিকার করতে বেরোন। নদীর কোমর বা বুক সমান পানিতে লোহার জিঞ্জিল (শিকল) দুদিক থেকে দুইজনে টেনে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। অপরদিকে একটা নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন ব্যক্তি সুবিশাল জাল ধরে রাখেন। লোহার শিকলের আঘাত পেয়ে মাছেরা দ্রুতগতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে জালের মধ্যে আটকা পড়ে। এভাবেই 'দড়া টানা' পদ্ধতিতে মাছ শিকার করা হয়। এখন এটি রীতিমতো হাওরের আচারের সঙ্গে মিলে গেছে।

১৬. গস্তি নৌকা

হাওর-খাল-নদীবেষ্টিত সুনামগঞ্জে গস্তি নৌকার ঐতিহ্য প্রাচীনতম। ইঞ্জিনচালিত নৌকার জাঁতাকলে হাওরে বিলাসী গস্তি নৌকা তেমন চোখে না-পড়লেও একেবারেই তা বিলুপ্ত হয়ে পড়েনি। শাল্লা, জামালগঞ্জ, দিরাই, জগন্নাথপুর উপজেলায় কালেভদ্রে গস্তি নৌকা চোখে পড়ে। তবে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার অন্তত ১৫টি গ্রামের মানুষ এ ঐতিহ্য এখনো ধরে রেখেছেন। এ গ্রামগুলোর মাঝিদের চালিত গস্তি নৌকা প্রতিদিন ছাতক উপজেলার সিংচাপইড় ইউনিয়ন সংলগ্ন ছয়হাড়ার ঘাট থেকে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করে। ভাড়ায় চালিত অন্তত দুইশ গস্তি নৌকা এই কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তবে দাঁড়-পালের বিপরীতে এসব নৌকায় ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে। গ্রামীণ নারী কিংবা বউদের নিয়ে পুরুষেরা পারিবারিক যাতায়াতের ক্ষেত্রে এসব গস্তি নৌকা ভাড়াবাবদ ব্যবহার করে থাকেন।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় তথ্যদাতাদের তালিকা

১. রামকানাই দাশ (৮০), প্রবীণ সংগীতশিল্পী, পিতা : রসিকলাল দাশ, মাতা : দিব্যময়ী দাশ, গ্রাম : পেরুয়া, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

২. ভরত চন্দ্র সরকার (৭৫), গ্রাম্য কবি ও গীতিকার, পিতা : মৃত শরত চন্দ্র সরকার, মাতা : মৃত মনমোহিনী সরকার, গ্রাম : বিষ্ণুপুর দত্তপাড়া, ডাকঘর : কাদিরগঞ্জ, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।

www.pathagar.com

৩. আলম শাহ (৪৮), পিতা : দুর্বিন শাহ, মাতা : স্বরূপা বেগম, গ্রাম : দুর্বিন টিলা, ডাকঘর : ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি, উপজেলা : ছাতক, জেলা : সুনামগঞ্জ।

৪. বশিরউদ্দিন সরকার (৫১), বাউল-গীতিকার, পিতা : পির মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন, মাতা : আকবরুন্নেসা জরিনা বিবি, গ্রাম : মজলিসপুর, ডাকঘর : দিরাই তান্দপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

৫. নিবারণ চন্দ্র দাস (৪৫), হোমিও চিকিৎসক, পিতা : নিতাই চন্দ্র দাস, মাতা : যশোদা বালা দাস, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, ডাকঘর : আজমিরীগঞ্জ, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।

৬. ফুল মিয়া (৫৫), কৃষক, পিতা : হাজী পেশকার আলী, মাতা : খোদেজা আক্তার, গ্রাম : ইয়ারাবাদ, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।

৭. কৃষ্ণকান্ত তালুকদার (৪৪), শিক্ষক, পিতা : মৃত হরকুমার তালুকদার , মাতা : স্নেহলতা তালুকদার, গ্রাম : নাইন্দা, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।

৮. শংকর রায় (৫৫), সাংবাদিক, পিতার নাম : গিরিন্দ্র রায়, গ্রাম : জগন্নাথপুর, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ।

৯. মু. আনোয়ার হোসেন রনি (৪৫), ব্যাংক কর্মকর্তা ও সংগঠক, পিতা : গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মাতা : ছুরুতুন্নেছা, গ্রাম : শিবনগর, ডাকঘর : গোবিন্দগঞ্জ বাজার, উপজেলা : ছাতক, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১০. হুমায়ূন কবীর জুয়েল (৪০), নাট্যকার ও সংগঠক, পিতা : মোহাম্মদ আছির আলী, মাতা : মনোয়ারা বেগম, গ্রাম : আনোয়ারপুর, ডাকঘর : দিরাই চান্দপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১১. মো. নজরুল ইসলাম রানা (৩৯), কবি ও সাহিত্যকর্মী, পিতা : আছলিম সরদার, মাতা : রাহেলা খানম, গ্রাম : সাকিতপুর, ডাকঘর : রজনীগঞ্জ বাজার, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১২. অতীন্দ্র দেবনাথ টুটুল (৪৩), সংগীত শিল্পী, পিতা : মৃত রমেশ দেবনাথ, মাতা : মৃত মাতঙ্গিনী দেবনাথ, গ্রাম : ফকিরটিলা, ডাকঘর : ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি, উপজেলা : ছাতক, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১৩. সরদার শাহরিয়ার হাসান (৪০), ব্যবসায়ী, পিতা : ওয়ারিদুল হক সরদার, মাতা : গুলশান আরা হক, গ্রাম : সাকিতপুর, ডাকঘর : রজনীগঞ্জ বাজার, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১৪. আইভি আক্তার জাকিয়া (১৯), টেইলার্স ব্যবসায়ী, গ্রাম : রাধানগর, ডাকঘর : দিরাই চানপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১৫. মোছা. রোজিনা আক্তার রত্না (২২), টেইলার্স ব্যবসায়ী, গ্রাম : নরত্তমপুর, ডাকঘর : দিরাই চানপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

১৬. ফৌজিয়া বেগম (১৩), ছাত্রী, গ্রাম : শ্রী নারায়ণপুর, ডাকঘর : রজনীগঞ্জ বাজার, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।

www.pathagar.com

১৭. মোছা. রেহেনা বেগম (৩০), গৃহিণী, স্বামী : সরদার শাহরিয়ার হাসান, গ্রাম : সাকিতপুর, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।
১৮. দেলোয়ার হোসাইন (৫৫), সমাজকর্মী, গ্রাম : হবিবপুর, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ।
১৯. শুক্লা রানী দাশ (৩৯), শিক্ষিকা, স্বামী : তাপস রায়, উকিলপাড়া, সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।
২০. সালেহ আহমদ (৪০), সাংবাদিক, পিতা : উসমান গনি আহমেদ, মাতা : সাফিয়া বেগম, গ্রাম : মাইঝবাড়ি, ডাকঘর : উত্তরবীর, উপজেলা : ধরমপাশা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২১. সাইফুর ইসলাম রিপন (৩৫), শিক্ষক, পিতা : নুরুল ইসলাম, গ্রাম : ইকড়ছই, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২২. অমিত দেব (৩১), সাংবাদিক, পিতা : অমল কান্তি দেব, মাতা : শুক্লা রানী দেব। গ্রাম : জগন্নাথপুর, ডাকঘর : জগন্নাথপুর, উপজেলা : জগন্নাথপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৩. মো. সাইফুর রহমান (২৯), রাজনৈতিক কর্মী, পিতা : ফুল মিয়া, মাতা : মিনা বেগম, গ্রাম : ইয়ারাবাদ, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৪. মোছাম্মৎ আছমা জাহান সীমা (৩৩), গৃহিনী, স্বামী : মো. নজরুল ইসলাম রানা, গ্রাম : সাকিতপুর, ডাকঘর : রজনীগঞ্জ বাজার, উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৫. সন্তোষ কুমার সরকার (৩১), সরকারি কর্মকর্তা, পিতা : মৃত চন্দ্র কুমার সরকার, মাতা : সুমনা রানী সরকার, গ্রাম : উপজেলা সদর, ডাকঘর : দোয়ারাবাজার, উপজেলা : দোয়ারাবাজার, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৬. মো. আলমগীর হোসেন (৩০), লেখক ও শিক্ষক, পিতা : আইয়ুবুর রহমান, মাতা : ছানোয়ারা বেগম, গ্রাম : আফছরনগর, ডাকঘর : দোহালিয়া বাজার, উপজেলা : দোয়ারাবাজার, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৭. মো. সোহেল রানা (২২), কলেজ ছাত্র, পিতা : রজব আলী, মাতা : আছিয়া বেগম, গ্রাম : নোয়াবন্দ, ডাকঘর : ধরমপাশা, উপজেলা : ধরমপাশা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৮. অতীশ ভূষণ তালুকদার রিংকু (২৭), ওষুধ ব্যবসায়ী, পিতা : মৃত রাজেন্দ্র কুমার তালুকদার, মাতা : রানী বালা তালুকদার গ্রাম : কাশীপুর, ডাকঘর : লক্ষ্মীপুর বাজার, উপজেলা : জামালগঞ্জ, জেলা : সুনামগঞ্জ।
২৯. সুচিত্রারানি রায় (৫০), গৃহিনী, স্বামী : মৃত প্রতাপরঞ্জন তালুকদার, গ্রাম : টাইলা, উপজেলা : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জেলা : সুনামগঞ্জ।
৩০. জবা চৌধুরী (২৭), শিক্ষিকা, স্বামী : পিকলু চন্দ্র দাশ, গ্রাম : রহমতপুর নোয়াগাঁও, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
৩১. পিকলু চন্দ্র দাশ (৩৪), ব্যবসায়ী, পিতা : মৃত গিরিন্দ্র চন্দ্র দাশ, মাতা : পুতুলবালা দাস, গ্রাম : রহমতপুর নোয়াগাঁও, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
৩২. সুর্নিমল দাশ (৩০), বেসরকারি চাকুরিজীবী, পিতা : মৃত উপেন্দ্র কুমার দাশ, মাতা : প্রেমদা বালা দাশ, গ্রাম : বাহাড়া, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।

www.pathagar.com

৩৩. প্রশান্ত তালুকদার (৩০), ব্যবসায়ী, পিতা : বারীন্দ্র তালুকদার, মাতা : সুনীতিরানি তালুকদার, গ্রাম : ডুমরা, ডাকঘর : ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, উপজেলা : শাল্লা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
৩৪. রাশিদ মিয়া (৬২), ব্যবসায়ী, পিতা : হরমুজ আলী, মাতা : গুলবাহার, গ্রাম : নতুনপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা : বিশম্ভরপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ।
৩৫. রেশমা আক্তার (২৪), ছাত্রী, পিতা : রাশিদ মিয়া, মাতা : খালেদা বেগম, গ্রাম : নতুনপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা : বিশম্ভরপুর, জেলা : সুনামগঞ্জ।

তথ্যসূত্র

১. মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য, বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য, ২০০৫, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।
২. করুণাময় গোস্বামী, *বাঙালির গান*, ২০১৩, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
৩. শুভেন্দু ইমাম [সম্পা.], শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র, ২০১৩ (দ্বি.সং), বইপত্র, সিলেট।
৪. দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা [সম্পা.], *ছিলটে প্রচলিত পই-প্রবাদ ডাক-ডিঠান*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৫. বারীন্দ্রকুমার দাশ, *উজান-ভাটি : এক শিক্ষকের আত্মস্মৃতি*, ২০১৩, কালিকলম প্রকাশনা, ঢাকা।
৬. নন্দলাল শর্মা, *সিলেটের জনপদ ও লোকমানস*, ২০০৬, সিলেট।
৭. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলার লোকবাদ্য*, ২০০৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।
৮. শ্রীকালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ, *মেয়েদের ব্রতকথা*, ২০০৭ (পুনর্মুদ্রণ), অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা।
৯. সুমনকুমার দাশ [সম্পা.], *বাংলাদেশের ধামাইল গান*, ২০১০, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১০. মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন, *সুনামগঞ্জের লোকসংস্কৃতি কৃষি ও কৃষক সমাজ*, ২০০৭, বারসিক।
১১. জফির সেতু [সম্পা.], *সিলেটি বিয়ের গীত*, ২০১৩, শুদ্ধস্বর, ঢাকা।
১২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ [সম্পা.], *ধামালি গান-১*, ২০০৩, তৃতীয় বাংলা পাবলিকেশন্স, ইউ. কে।
১৩. আব্দুল ওয়াহিদ, *আত্মকথা*, ২০১৩, জাউয়া সাহিত্যিক পাঠাগার, সুনামগঞ্জ।
১৪. সুমনকুমার দাশ, *শাহ আবদুল করিম*, ফেব্রুয়ারি ২০১০, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।
১৫. সুমনকুমার দাশ, *বেদে-সংগীত*, ২০০৮, উৎস প্রকাশন, ঢাকা।
১৬. মোহাম্মদ খালেদ মিয়া, *সিলেটের আঞ্চলিক গান*, ২০০৫, সিলেট।
১৭. সয়াল শাহ, *গাঁওদেশের কথা*, ২০১১, সিলেট।
১৮. সজল কান্তি সরকার, *হাওরের কথকতা*, ২০১৪, চারবাক, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি